আমার দেখা পৃথিবী-৬

রাতের সূর্য

[কানাডা, আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ইয়েমেন, মালয়েশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের বিস্ময়কর সফরনামা]

মূল

শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, দাঈ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়ীতা

ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমী, জেদ্দা, সৌদী আরব

শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

ইমাম ও খতীব : আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা

মুহাদ্দিস, টঙ্গি দারুল উলূম মাদরাসা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

অর্থ ঃ তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর, অতঃপর দেখ যে, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। (নাহল ঃ ৩৬)

বর্তমান যুগের পর্যটকদের মতো কেবলমাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যে আল্লাহওয়ালা কোন বুযুর্গ পৃথিবী ভ্রমণ করেননি। বরং তারা ইলমে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান, দ্বীনের প্রচার–প্রসার ও জিহাদের জন্য পৃথিবীতে সফর করে উপরোক্ত আয়াতের উপর আমল করার প্রয়াস পেয়েছেন।

ঐ একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ আলেম শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ইসলামী সেমিনার, সভা ও মাহফিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক দেশের অসংখ্য শহরে উপস্থিত হয়ে পথহারা মানুষকে দিয়েছেন পথের দিশা। এই নব্য জাহেলী যুগ—সৃষ্ট অনেক জটিল সমস্যার ইসলামী সমাধান পেশ করে মানবতাকে সিরাতে মুস্তাকীমের রাহনুমায়ী করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন—

“বিগত প্রায় বিশ বছর যাবত আমি ঠিকানাবিহীন পত্রের ন্যায় সফর করে চলছি। এ সকল সফরে অসংখ্য দেশ ও শহরের মাটি পায়ে লাগিয়েছি। তন্মধ্যে যে সকল সফরে উল্লেখযোগ্য জ্ঞানার্জন হয়েছে অথবা এ সুবাদে ইসলামী ইতিহাসের হারানো কোন অধ্যায় উল্টিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে, তার বিবরণ ‘সফরনামা’ রূপে লিপিবদ্ধ করেছি। যার প্রথম খণ্ড বিশটি দেশের সফরনামা "جهان ديده" নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং আমার

ধারণাতীত পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। এরপরও আমার সফরের ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং এখনো সফরেই আছি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পরও আমার অনেক দেশ সফর করা হয়েছে সেগুলোর বিবরণও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বন্ধুদের দাবী হলো جہان دیدہ –এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হোক।

বর্তমানে আপনাদের হাতে যে কিতাব دنیا میرے آگے তা মূলতঃ বন্ধুদের সে দাবীরই বাস্তবায়ন। দু'আ করি আল্লাহ পাক এই কিতাবকে পাঠকদের জন্য উপকারী বানান। আমীন।"

হযরতের বর্তমান সফরনামাটিও বিশটি দেশের সফরের কাহিনী সমন্বয়ে রচিত। বর্তমান সফরনামাটি পূর্বোক্ত সফরনামার চেয়েও আকর্ষণীয়। কারণ এ গ্রন্থে উত্তরমেরু সহ বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দেশের সফরকাহিনী এবং সেখানের বিরল, বিচিত্র ও বিস্ময়কর অবস্থা ও ঘটনার বিবরণ এসেছে যা পাঠ করে পাঠকমাত্রই পুলকিত ও বিস্মিত হয়ে আল্লাহ পাকের অপূর্ব কুদরতের স্বীকৃতি স্বরূপ বলে উঠবেন 'সুবহানাল্লাহ'। আমরা আমাদের পাঠকদের সুবিধার কথা চিন্তা করে এই কিতাবটিকেও দুই খণ্ডে প্রকাশ করছি। 'রাতের সূর্য' নামক বর্তমান খণ্ডে কানাডা, আমেরিকা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যাণ্ড, ইয়ামেন, মালয়েশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের সফরনামা বিবৃত হয়েছে।

আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত ও সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল–ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। এ ধরনের ত্রুটি যদি কারো দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে তা আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দিবো ইনশাআল্লাহ।

বইটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে জাযায়ে

খায়র দান করুন। আমীন।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে দু'জনের শুকরিয়া আদায় করছি যাদের অবদান কোনভাবেই প্রতিদানযোগ্য নয়। তাদের একজন হলেন আমার শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী জনাব ইঞ্জিনিয়ার আসাদুজ্জামান ছাহেব আর অপরজন হলেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব আমানত ছাহেব। আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনের জন্য তাদেরকে কবুল করুন, আমীন।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

বিনীত—

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

১১, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

১৭ই জিলকদ ১৪২৬হিজরী

২০শে ডিসেম্বর ২০০৫ ঈসায়ী

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রাববুল আলামীনের মেহেরবানীতে ইতিপূর্বে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব (দা.বা.)এর ভ্রমণ কাহিনী সম্বলিত প্রথম গ্রন্থ 'জাহানে দিদাহ' তরজমা করার তাওফীক লাভ করি। আলহামদুলিল্লাহ, সে তরজমা খুব অল্প সময়ে পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে এবং সব মহলে ধারণাতীত সমাদৃত হয়। অনেকেই এজন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং দু'আ দেন। উৎসাহ যোগান। তাদের দু'আ ও উৎসাহকে সম্বল করে পরবর্তীতে আরো কয়েকটি বই তরজমা করার তাওফীক লাভ হয়। সেই ধারাবাহিকতায় আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এবার হযরত শাইখুল ইসলাম (দা.বা.)এর ভ্রমণ কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ড 'দুনিয়া মেরে আগে'–এর তরজমার শেষাংশ 'রাতের সূর্য' নামে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ!

বিদগ্ধ লেখক এ সমস্ত ভ্রমণকালে তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দ্বারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উন্নতি ও প্রাচুর্যের জোয়ার যেমন অবলোকন করেন, তেমনি আখেরাত বিস্মৃতি ও বল্গাহীন বিষয়–আসক্তির ফলে তাদের বিরামহীন অস্থির জীবন, অবাধ যৌনাচারের কষাঘাতে বিধ্বস্ত মানবতার কংকালসার চেহারা, অশান্ত হৃদয়ের আর্তচিৎকার এবং এ সব থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য তার ব্যাকুলতা ও দিবালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন এবং এর প্রতিকার স্বরূপ তিনি উম্মতের একজন একনিষ্ঠ 'মুসলিহ' হিসাবে ইসলাম প্রদত্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক সঞ্জীবনী সুধা ঐ সমস্ত পিপাসার্ত মানবতার সামনে বিভিন্ন সভা–সমাবেশ, মতবিনিময় আসর, ঘরোয়া আলোচনা ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে উদারভাবে পরিবেশন করেন, তুলে ধরেন তাদের সামনে সুস্থ ও সুখময় জীবনের সঠিক দিক নির্দেশনা।

লেখক ভ্রমণ কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে সে সব বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে সে সমস্ত দেশের শিক্ষা–সংস্কৃতি ও নৈসর্গিক বিবরণ এবং ভ্রমণকালীন তাঁর বিচিত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী

অভিজ্ঞতা—যেমন, সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ, সাগরের তলদেশ ও উত্তর মেরু ভ্রমণ, উত্তরে পৃথিবীর সর্বশেষ স্থলভাগে আযান দিয়ে দুপুর রাতে সূর্য সামনে নিয়ে নামায আদায় করা ইত্যাদি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং শিকড় সন্ধানী ঐতিহাসিকের ন্যায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের মণিমুক্তা দ্বারা তাঁর এ ভ্রমণ কাহিনীকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

ভ্রমণে আনন্দ আছে, শিক্ষা আছে। হযরতের ভ্রমণ কাহিনীতে আনন্দ ও শিক্ষা যুগপৎভাবে চিত্রিত হয়েছে। ফলে পাঠক লিখনীর বাহনে সওয়ার হয়ে ভ্রমণে তাঁর সহযাত্রী হয়ে একই সঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দের সরোবরে অবগাহন করে। পুলক অনুভব করে। শিক্ষা লাভ করে। এ বই পাঠে একজন মর্দে মুমিনের 'বাসিরাত' ও 'ফেরাসাত'-এর নজরে পৃথিবীর বসন্তের মাঝে হেমন্তের সম্যক উপস্থিতি পাঠক নিজেও উপলব্ধি করে। নশ্বর পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখের অন্তরালে স্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান সুস্পষ্ট শুনতে পায়।

একটি বই প্রকাশ হয়ে পাঠকের হাত পর্যন্ত পৌছতে জানা-অজানা বহু লোকের দু'আ ও সহযোগিতা কার্যকর থাকে। এ বইয়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। আমি তাদের সকলের শুকরিয়া আদায় করছি। বইয়ে ব্যবহৃত স্থান ও ব্যক্তিসমূহের নাম উর্দূ থেকে সঠিক উচ্চারণসহ নেওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান সাহেব সেগুলো যথাসম্ভব ঠিক করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সর্বোপরি মনোরম প্রচ্ছদ ও আকর্ষণীয় অঙ্গসজ্জায় বইটি প্রকাশ করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আদর্শ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ-এর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব (দা.বা.)এর। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আফিয়াতের সাথে নেক আমলের দীর্ঘ জীবন, উম্মতে মুসলিমার অধিকতর খেদমত করার তাওফীক এবং ইহ-পরকালীন সুখ-শান্তি, সফলতা ও তাঁর রেযামন্দি নসীব করুন। আমীন।

সঠিক ও সুন্দরভাবে অনুবাদ করার আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আমার দুর্বলতার কারণে ভুল থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুহৃদ পাঠক ভুলগুলো অবহিত করলে দু'আ দিব এবং পরবর্তীতে সংশোধন করে নিব, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা মূল বইয়ের মত অনুবাদটিকেও কবুল করুন। তাঁর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম এবং নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
বেজগাঁতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ
৬ই জিলকদ, ১৪২৬ হিজরী

লেখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى اله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين-امابعد-

বিগত প্রায় বিশ বছর যাবত আমি একটি বৃন্তচ্যুত পত্রের ন্যায় বিরামহীনভাবে সফর করে চলছি। সেই সুবাদে আমি কত দেশ আর কত নগরী যে চষে বেড়িয়েছি তার হিসেব নেই। তার মধ্যকার বিভিন্ন সফরের উল্লেখযোগ্য তথ্য–বৃত্তান্ত এবং তদসংশ্লিষ্ট ইসলামের হারানো ইতিহাস–ঐতিহ্যের নানা অধ্যায় আমি 'সফরনামা' রূপে লিখে আসছি। যার প্রথমাংশ 'জাহানে দীদাহ' [১] নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আশাতীত সমাদৃত হয়েছে। 'জাহানে দীদাহ' ছেপে বের হওয়ার পরও অব্যাহত গতিতে আমার সফর চলতে থাকে এবং এখনও তা' অব্যাহত রয়েছে। এখন এই ভূমিকা লেখার সময়েও আমি দীর্ঘ এক সফরের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে আছি। সুতরাং ইতোমধ্যে আরো কিছু 'সফরনামা' লেখা সম্পন্ন হয়েছে। হিতাকাংখী বন্ধুমহলের পক্ষ থেকে 'জাহানে দীদাহ'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করার জন্যও তাড়া আসতে থাকে। বক্ষমান গ্রন্থ তাদের সেই বাসনারই প্রতিফলন। তবে বিভিন্ন কারণে আমি একে 'জাহানে দীদাহ'র দ্বিতীয় খণ্ড না বানিয়ে এর নাম দেই 'দুনিয়া মেরে আগে'।

পাঠককে উভয় পুস্তক একত্রে ক্রয় করতে বা পাঠ করতে বাধ্য না করা এই নাম পরিবর্তন করার অন্যতম কারণ। আর এটিও একটি কারণ যে, আমার প্রথম পুস্তকের নামের সঠিক উচ্চারণ হলো 'জাহানে দীদাহ' [جهان دیده যের বিশিষ্ট নূন দিয়ে] কিন্তু অনেক পাঠকই এত

---

১. 'জাহানে দীদাহ' আমরা বাংলায় ৪ খণ্ডে প্রকাশ করেছি—১ম খণ্ড ফুরাত নদীর তীরে। ২য় খণ্ড উহুদ থেকে কাসিয়ূন। ৩য় খণ্ড হারানো ঐতিহ্যের দেশে। ৪র্থ খণ্ড অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক। বাংলা অনুবাদ আশাতীত সমাদৃত হয়েছে। —প্রকাশক

অধিকহারে এর উচ্চারণ 'জাহাঁ দীদাহ' [جہاں دیدہ নুনে গুন্না সহযোগে] করেছে যে, আমি এই দ্বিতীয় পুস্তকের সঙ্গে এমন অবিচার করার আর দুঃসাহস করি না। আমার সম্মুখে মানুষ যতবার এই পুস্তকের নাম 'জাহাঁ দীদাহ' [جہاں دیدہ নূনে গুন্না সহযোগে] উচ্চারণ করে, ততবারই আমার অন্তরে গ্লানি অনুভব করি। বিধায় দ্বিতীয় পুস্তকের নাম পরিবর্তন করার মধ্যেই নিরাপত্তা দেখতে পাই।

যাই হোক, পুস্তকটি এখন আপনাদের সামনে। আল্লাহ তাআলা পুস্তকটিকে পাঠককুলের মনোরঞ্জনের উপকরণ এবং কল্যাণকর করেন, এটিই আমার আন্তরিক দু'আ।

মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী–১৪
৫ই রবিউস সানী, ১৪২৩ হিজরী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

॥ ॥ ॥

অষ্ট্রেলিয়ায় কয়েক দিন

পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা এই চারটি মহাদেশের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য দেশসমূহে আমার প্রায়ই যাওয়ার সুযোগ হয়ে থাকে। তবে পঞ্চম মহাদেশ অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়ায় ইতিপূর্বে আমার কখনো যাওয়া হয়নি। কয়েক বারই সেখানকার বন্ধুগণ সেখানে যাওয়ার জন্য দাওয়াত করেন। কিন্তু আমার ব্যস্ততার কারণে চূড়ান্ত কোন প্রোগ্রাম হয়ে ওঠেনি। গত বছর অক্টোবরে গোল্ডকোষ্টের মাওলানা আসাদুল্লাহ তারেক সাহেব করাচী তাশরীফ আনেন। তিনি খুব গুরুত্ব সহকারে অষ্ট্রেলিয়া আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আমি আমার সময়সূচীকে সামনে রেখে জানাই যে, ১৪১১ হিজরীর জুমাদাস সানিয়া মাসে (এপ্রিল, ২০০০) আমার জন্য সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে। কারণ, তখন মাদরাসায় ত্রৈমাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সে সময় আমি ইনশাআল্লাহ একসপ্তাহ বা দশদিন অষ্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণের জন্য বের করতে পারব।

মাওলানার প্রচেষ্টায় কুইন্সল্যাণ্ডের একটি ইসলামী সোসাইটি আমাকে নিমন্ত্রণ করে। ফলে ২৫শে এপ্রিল ২০০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫ই মে ২০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করি। এ সফরের অনেক কিছু পাঠক সমাজের উপকার ও মনোরঞ্জনের কারণ হবে বলে আমি আশা করি বিধায় এর সামান্য কিছু বিবরণ এখানে তুলে ধরছি।

সফরের বৃত্তান্তে যাওয়ার পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং সেখানে মুসলমানদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের উপর একবার নজর বুলানো সমীচীন হবে।

অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ মহাদেশ। মহাদেশটি ভারত সাগর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিকদের বক্তব্য,

এখানকার শীলাসমূহের বয়স অনুপাতে এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাদেশ, যা সবার শেষে আবিস্কৃত হয়। সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ এই যে, বৃটিশ নেভীর ক্যাপ্টেন জেমস কুক সর্বপ্রথম ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া আবিস্কার করেন। তবে কথাটি এতটুকু পর্যন্ত সঠিক যে, একটি সভ্য দেশ হিসেবে অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাস জেমস কুকের নৌভ্রমণের ফলে সূচিত হয়। তবে ইতিপূর্বেও এ মহাদেশে অনেক লোকের পৌঁছার সাক্ষী বিদ্যমান রয়েছে। আর এ কথা তো খুবই স্পষ্ট যে, যখন বৃটিশ অধিবাস গ্রহণকারীরা অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে, তখন সেখানে একটি জাতি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল, যারা শত শত বছর ধরে সেখানে বসবাস করে আসছিল। তাদেরকে এবোরজিনিস (Aborginies) বলা হয়। এরা যদিও অসভ্য গোত্রীয় লোকরূপে এখানে বসবাস করছিল, তবুও তাদের সংখ্যা সেসময় কমপক্ষে তিন লক্ষ ছিল। তাদের দেহের গঠন ও অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এরা ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভ্রমণ করে এখানে এসে পৌঁছে। যখন বৃটেনের লোকেরা অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস আরম্ভ করে, তখন প্রথম দিকে Aborginies-রা তাদেরকে সুস্বাগত জানায়। কিন্তু যখন বৃটিশ অধিবাসীরা নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাদের বস্তিসমূহ উজাড় করতে আরম্ভ করে, তখন তারা এতে বাধা প্রদান করে। তখন বৃটিশ আগন্তুকরা নির্দয়ভাবে তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করে। হাজার হাজার স্থানীয় অধিবাসী এই গণহত্যার শিকার হয়। কিছুদিন তারা বৃটিশ অধিবাস গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালু রাখে। কিন্তু পরবর্তীতে বৃটিশ শক্তির সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করে তাদের পরিকল্পনায় একাকার হওয়া ছাড়া এদের আর কোন উপায় থাকে না।[১]

হাজার হাজার লোক নিহত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বহুসংখ্যক লোকের এখনও সেখানে আবাদ রয়েছে। কিন্তু সাধারণতঃ এরা বড় বড় শহর থেকে দূরে মফস্বল এলাকায় বাস করে। তাদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম। এখানকার লোকেরা বলে যে, তাদের বসবাসের এলাকাসমূহে

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য ইনসাইক্লোপেডিয়া, ব্রিটানিকা, পৃঃ ৪২৮, ভলিউম ১৪, প্রকাশকাল ১৯৮৮ খৃঃ, পঞ্চদশ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

মাদকদ্রব্য খুব সস্তা করে দেওয়া হয়েছে। তারা মদের নেশায় বুদ হয়ে থাকে। তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্ত। মজার ব্যাপার হল, যদিও এ সকল লোক অষ্ট্রেলিয়ার মূল অধিবাসী কিন্তু এদেরকেই Aborginies (অর্থাৎ তারা এখানকার মূল অধিবাসী নয়) বলা হয়। অষ্ট্রেলিয়ার জাঁকজমকপূর্ণ শহরসমূহের সঙ্গে তাদের বস্তির তুলনা করা হলে তাদেরকে অস্পৃশ্যের ন্যায় মনে হয়।

অষ্ট্রেলিয়া খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী একটি দেশ। সেখানে সোনা ও পেট্রোল থেকে নিয়ে ইউরেনিয়ামসহ সব কিছুর খনি রয়েছে। এ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকার ফলে আজ সিডনী, মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, পার্থ ও ক্যানবেরার ন্যায় বড় বড় শহর স্বীয় রূপ–সৌন্দর্য ও বৈষয়িক উন্নতিতে আমেরিকা ও ইউরোপকে ম্লান করছে। কিন্তু একথা খুব কম মানুষেরই জানা রয়েছে যে, এখানকার খনিজ সম্পদ উত্তোলনে পাকিস্তানী মুসলমানগণের বিরাট অবদান রয়েছে। বর্তমানের অষ্ট্রেলিয়া যেই অর্থনৈতিক উন্নতিতে সমুজ্জ্বল, তাতে করাচী থেকে খায়বার পর্যন্তের হাজার হাজার মুসলমানের রক্ত ও পানি মিশে আছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় মুসলমান

এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যখন বৃটিশ বণিকরা অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করে, তখন প্রথম প্রথম এ দ্বীপকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, যে উদ্দেশ্যে একসময় কালাপানিকে ব্যবহার করা হত। অর্থাৎ বৃটিশ আইনের অধীনে যে সমস্ত অপরাধী দেশান্তরের দণ্ডপ্রাপ্ত হত, তাদেরকে এখানে পাঠিয়ে দেয়া হত। ক্রমে ক্রমে দেশান্তরিত সেই লোকদের বংশধর এখানে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। পরবর্তীতে বহু বৃটিশ অধিবাসী এ উপমহাদেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যও এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করতে থাকে। যখন বৃটিশ অভিবাসীদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেল এবং তারা এ অঞ্চলের সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যতকে জড়িয়ে ফেলল, তখন তাদের সামনে সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলকে পরস্পরে সংযুক্ত করা এবং মহাদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে খনি আবিষ্কার করার জন্য সড়ক নির্মাণের প্রয়োজন দেখা

দেয়। কিন্তু সমস্যা এই দেখা দেয় যে, মহাদেশটির মধ্যবর্তী এলাকাসমূহের অনেকটাই ছিল বৃক্ষলতাশূন্য মরুভূমি। বৃটিশ অভিবাসীদের মরু এলাকায় কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল না। তারা ঘোড়ায় চড়ে এ সমস্ত এলাকায় কাজ করার চেষ্টা চালায়, কিন্তু ঘোড়া এ মরু এলাকায় কাজ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। তারা বুঝতে পারে যে, এ মরুভূমিতে যাতায়াত ও মাল আনা নেওয়ার জন্য উট ছাড়া অন্য কোন জিনিস কার্যকর হতে পারে না। অষ্ট্রেলিয়ায় উট ছিল দুষ্প্রাপ্য। তাই নাবিকরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উট ক্রয় করে জাহাজে করে অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের যেহেতু উট ব্যবহার করার এবং সেগুলোকে সামলানোর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না তাই কয়েকবারই এমন হয় যে, বেশীর ভাগ উট অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে পৌঁছার পূর্বেই পথের মাঝে মারা যায়। এক দু'টি উট জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় এসে পৌঁছালেও অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে কাজে ব্যবহৃত হওয়ার পূর্বেই সেগুলো রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়ে।

এ পর্যায়ে বৃটিশ অধিবাসীরা বুঝতে পারে যে, উট দ্বারা সঠিকভাবে কাজ নিতে হলে উটের সাথে তার রাখালদেরকেও আনা জরুরী। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে কিছু অষ্ট্রেলিয়ান বণিক করাচীর বন্দরনগরীতে অবতরণ করে। তারা সিন্ধু, মাকরান, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের উটের মালিকদের সাথে চুক্তি করে যে, তারা নিজেদের উট নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া যাবে এবং সেখানকার মরুভূমি অতিক্রম করার কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করবে। এই চুক্তির অধীনে উপরোক্ত প্রদেশসমূহের উটের মালিকদের বড় বড় খেপ করাচীর বন্দর থেকে বিভিন্ন সময়ে শত শত উট নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছায়।

তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হয়। এ সমস্ত উটের মালিক মরুভূমিতে কাজ করার পদ্ধতি জানত। তারা ছিল খুবই শক্তিশালী ও কষ্টসহিষ্ণু। তারা স্বল্পমাত্র বিনিময়ে অষ্ট্রেলিয়ায় সেই কাজ করতে আরম্ভ করে, যা বহু বছর ব্যয় করেও অসম্ভব মেনে হচ্ছিল। তাদেরই পরিশ্রম ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার ফলে অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমির মধ্য দিয়ে সড়ক নির্মিত হয়, খনি আবিষ্কৃত হয় এবং সুচারুরূপে খনি থেকে মাল আনা নেয়ার

কাজ সম্পাদিত হয়। অষ্ট্রেলিয়া এ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা লাভবান হতে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে এ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের জোরে সমগ্র মহাদেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এ সমস্ত উটের মালিক—যারা অষ্ট্রেলিয়ায় এ জটিল কর্ম সম্পাদন করে—যদিও তাদের বেশীর ভাগ সিন্ধু, মাকরান, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের লোক ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যকার বিরাট সংখ্যক লোক ছিল আফগান বংশোদ্ভূত। তাই অষ্ট্রেলিয়াতে তাদেরকে 'আফগান' বলা হত। পরবর্তীতে এই নামকে সংক্ষিপ্ত করে তাদেরকে ঘান (Ghan) বলা হত। এরা ছিল মুসলমান। এরা সেখানে নিজেদের জনবসতি গড়ে তোলে। যেগুলোকে এখানে Ghan town অর্থাৎ 'আফগান জনপদ' বলা হয়।

সেই 'আফগান' উটের মালিকদের প্রথম সফল কাফেলা করাচী বন্দর থেকে জাহাজে আরোহণ করে ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছে। সে কাফেলায় ১২৪টি উট এবং আরো কিছু পশু ছিল। সেগুলোর তত্ত্বাবধানের জন্য ৩১জন আফগানকে অষ্ট্রেলিয়ায় আনা হয়েছিল। এঁরা ছিলেন পাকা মুসলমান। এঁরা নিজেদের বৃটিশ অফিসারদের পক্ষ থেকে চরম নিরাশাব্যাঞ্জক আচরণ করা এবং কঠিন অবস্থা বিরাজ করা সত্ত্বেও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথমবার ছাপড়া মসজিদ তৈরী করেন। ধীরে ধীরে কিছু মসজিদে টিনের ছাউনী দেয়া হয়। এজন্য সেগুলোকে Tin Mosque–ও বলা হয়। তারা নিজেদের জনপদের নামও নিজ নিজ কবিলার নাম হিসাবে রাখে। যেমন 'মিরী' কবিলার লোকেরা নিজেদের বসতি এলাকার নাম রাখে 'মিরী' এবং তাদের নির্মিত মসজিদও 'মিরী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। মরুভূমিতে কাজের অগ্রগতির সাথে সাথে আরো আফগানকে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তান থেকে আনা হয়। এমনকি অষ্ট্রেলিয়ায় তারা বহু সংখ্যায় বসতি স্থাপন করে। শহর এলাকার সর্বপ্রথম মসজিদ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি এডেলেইড (Adelaide) শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মসজিদ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পার্থে নির্মাণ করা হয়।[১]

অষ্ট্রেলিয়ার বিনির্মাণ ও উন্নতিতে এ সমস্ত উট মালিকদের মুখ্য

1. The Oxford Campanion to Australian History, page 353, Oxford, 1998

ভূমিকা থাকলেও তাদের সঙ্গে বৃটিশ অভিবাসীদের আচরণ প্রথম থেকেই ভাল ছিল না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ যখন সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে যায় এবং খনিসমূহ আবিস্কৃত হয়ে যায়, তখন উটের প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়, এমতাবস্থায় সেই আফগানদের জন্য অন্য রোজগারের সুযোগ বিলুপ্ত করে তাদেরকে অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করতে দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। তাদের অনেকে দেশে ফিরে আসে। আর যারা রয়ে যায়, তারা বড় অসহায় অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে। এখন অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাস থেকে তাদের অবদানকে প্রায় বিস্মৃত করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার একজন গবেষক ক্রিষ্টিন ষ্টিভেন্স (Christine Stevens) ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত পরিশ্রম করে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থটির নাম Tin Mosque And Ghantowns অর্থাৎ 'টিন মসজিদ ও আফগান জনবসতি।' ৩৭২ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই বড় বইটিতে তিনি সেই উটের মালিকদের ইতিহাস অনেক অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সংকলন করেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি লেখেন ঃ

> 'আফগান ও তাদের পশুরা এমন এক সময়ে অষ্ট্রেলিয়ার হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব করে দিয়েছে, যখন এ কাজ করতে অন্য লোকেরা বেশীর ভাগই ব্যর্থ হয়। এতদসত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে ভীতি ও ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়। তাদের একক সমাজকে পৃথক করে দেওয়া হয়। তাদের মন ও প্রকৃতি এবং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে খুব কমই বোঝার চেষ্টা করা হয়। বরং আজ পর্যন্ত সাধারণত তাদের বিরুদ্ধে অনেক ভুল বুঝাবুঝি পাওয়া যায়।' (পৃঃ ১)

এই আফগানদের পর জার্মান, তুরস্ক, লেবানন, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত ও পাকিস্তান থেকে বহু সংখ্যক মুসলমান এখানে এসে অধিবাস গ্রহণ করে। ১৯৯১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী মতে এখানে ৬৭টি দেশ থেকে আগত মুসলমানগণ অধিবাস গ্রহণ করেছে। সেই সরকারী আদমশুমারী অনুপাতে মুসলমানদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫ শত ৭ ছিল।

(The Oxford Companion to Australion History, p. 3563)

বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যা ২ কোটি। বেসরকারী অনুমান অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ৫ লাখের কাছাকাছি বলা হয়। অষ্ট্রেলিয়া

এদিক থেকে একটি ব্যতিক্রমধর্মী মহাদেশ যে, সমগ্র মহাদেশটি একটি মাত্র দেশসমন্বিত। যার সরকারী নাম 'কমনওয়েলথ অব অষ্ট্রেলিয়া'। এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত এবং যা ছয়টি রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত। ছয়টি রাজ্য হল, নিউ সাউথ ওয়েলস, রাজধানী সিডনী। ভিক্টোরিয়া, যার প্রধান কেন্দ্র মেলবোর্ন। কুইন্সল্যাণ্ড, যার কেন্দ্র ব্রিসবেন। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, যার রাজধানী এ্যাডেলেইড। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া, যার প্রধান কেন্দ্র পার্থ এবং তাসমানিয়া, যা একদম দক্ষিণের একটি উত্তপ্ত দ্বীপ। এর প্রধান কেন্দ্র হোবার্ট। সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা। এটি সিডনী থেকে দক্ষিণে অবস্থিত। ইসলামাবাদের সঙ্গে এটি অনেক সাদৃশ্যপূর্ণ।

মুসলমানদের সর্বাধিক অধিবাস নিউ সাউথ ওয়েলসে, দ্বিতীয় নাম্বারে ভিক্টোরিয়া। তৃতীয় নাম্বারে কুইন্সল্যাণ্ডে, আর সম্ভবতঃ চতুর্থ নাম্বারে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায়।

আমার সাম্প্রতিককালের সফরে কুইন্সল্যাণ্ডের শহর ব্রিসবেন ও গোল্ডকোষ্ট, ভিক্টোরিয়ার শহর মেলবোর্ন, নিউসাউথ ওয়েলসের শহর সিডনী ও সেন্ট্রাল কোষ্ট ভ্রমণ করার সুযোগ হয়। এ রাজ্যগুলো সে দেশের মুসলমানদের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র।

ভ্রমণ শুরু

২০০০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিলের মঙ্গলবার দিনটি অতিবাহিত হওয়ার পর রাতের তিনটার দিকে অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে আমার দীর্ঘ ভ্রমণ আরম্ভ হয়। থাই এয়্যারওয়েজের বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ৫ ঘন্টা ওড়ার পর যখন থাইল্যাণ্ডের স্থানীয় সময় সকাল ৯টার কাছাকাছি ব্যাংককের বিমানবন্দরে অবতরণ করি, তখন সারারাতের অনিদ্রা এবং তার পূর্বের দিনের চরম ক্লান্তির কারণে আমার শরীর চূর্ণ–বিচূর্ণ মনে হচ্ছিল। আমাকে আট ঘন্টা সময় ব্যাংককে অতিবাহিত করে বিকাল ৫টায় পুনরায় অষ্ট্রেলিয়ার বিমানে আরোহণ করতে হবে। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার আমি ব্যাংককে এসেছি। কি এক অজানা কারণে এখানে দিন কাটানো আমার কাছে সবসময় বোঝা মনে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ

তাআলার শোকর যে, বিরতির এ আটঘন্টা অতিবাহিত করার জন্য এয়ারওয়েজের পক্ষ থেকে বিমানবন্দরের সীমানার মধ্যে অবস্থিত হোটেল আমারিতে একটি কক্ষ বুক করে দেওয়া হয়েছিল। তাই আমাকে শহরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে হয় নাই। বিমান থেকে নেমে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হোটেল কক্ষে পৌঁছে যাই। ব্যাংককের পাকিস্তানী দূতাবাসের প্রোটোকল অফিসার মি. শেখ ছাড়া অন্য কেউ আমার ব্যাংককে আসা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি আমাকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে যান। এতে করে এমন নিরিবিলিতে আমি আরাম করার সুযোগ পাই, যা এখন জীবনে কদাচিতই হাতে আসে। দুই আড়াই ঘন্টার মজার ঘুম হল, আর লেখাপড়ার যে কাজ আমার সাথে থাকে, তা এমন নির্বিঘ্নে সমাধান করার সুযোগ হল যে, এ সময়ের মধ্যে কোন সাক্ষাতপ্রার্থীও বিঘ্ন ঘটায়নি এবং কোন টেলিফোনও আসেনি। এমন মানসিক একাগ্রতা কয়েক ঘন্টার জন্যও হাতে পেলে তা আমার নিকট বড় নেয়ামত মনে হয়। সুতরাং এ কয়টি ঘন্টা অতি আরামে অতিবাহিত হয় এবং বিকাল নাগাদ আল্লাহর মেহেরবানীতে দীর্ঘ সফর করার জন্য আমি পরিপূর্ণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠি।

বিকাল পাঁচটায় বৃটিশ এয়ারওয়েজের বিমান সিডনীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এটি ছিল ৯ ঘন্টার আকাশ পথের ভ্রমণ। মাআরিফুল কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ আমার সাথে ছিল। আমি তা পুনরায় সংশোধন করছিলাম। ইংরেজী মাআরিফুল কুরআনের সংশোধনীর বেশীর ভাগ কাজ আমি বিমানে ভ্রমণরত অবস্থায়ই করি। এখন আল্লাহর মেহেরবানীতে চার ভলিউম শেষ হওয়ার পর পঞ্চম ভলিউমের সংশোধনীর কাজ চলছে। আলহামদুলিল্লাহ এই ভ্রমণ চলাকালে সূরা ইউসুফ ও সূরা র'আদ শেষ হয়ে যায়। বিমান সারারাত ভারত সাগর ও তার বিভিন্ন দ্বীপের উপর দিয়ে উড়তে থাকে। চরম ক্লান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করার পূর্ব পর্যন্ত আমি কাজ করতে থাকি। তারপর শেষ দু' তিন ঘন্টায় বিমান যখন অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙলে দেখি, উদয়াচল থেকে সুবহে সাদিক উদয় হচ্ছে। আমি নামায শেষ করার অবিলম্ব পর বিমান অবতরণ করতে আরম্ভ করে। নীচে সুবহে সাদিকের

ঊর্ধ্বমুখী আলোয় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে সুদূর বিস্তৃত সিডনী শহরের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে বিমান সিডনীর সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত বিমান বন্দরে অবতরণ করে। আমার গন্তব্য আরো সম্মুখে। আমাকে এখান থেকে অপর একটি বিমানে আরোহণ করে ব্রিসবেন (Brisbane) শহরে যেতে হবে। সেখানকার বিমান ছিল মাত্র এক ঘন্টা পর। এই সময়ের মধ্যে আমাকে ইমিগ্রেশন, মালপত্র বুঝে নেওয়া ও কাষ্টমের কাজ শেষ করে অন্য টার্মিনাল থেকে স্থানীয় বিমান ধরতে হবে। বিমানবন্দরে সিডনীতে নিয়োজিত পাকিস্তানের কাউন্সিল জেনারেল মিঃ বাকের রেজা স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি সময়ের স্বল্পতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তাই তিনি পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যেন ইমিগ্রেশন ও কাষ্টমে দেরী না হয়। কিন্তু মালপত্র আসতে সময় লেগে যায়। আমরা আভ্যন্তরীণ বিমানের কাউন্টারে পৌঁছে জানতে পারি যে, এখন আর সেই বিমান পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে তার মাত্র আধা ঘন্টা পরই দ্বিতীয় বিমান পেয়ে যাই। বিমানবন্দরের বাইরে ড. মাওলানা শাব্বির সাহেব (তিনি মাশাআল্লাহ অষ্ট্রেলিয়ায় ধর্মীয় কর্মসম্পাদনে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব) কিছু বন্ধুসহ প্রতীক্ষমান ছিলেন। তিনি ব্রিসবেনে আমার মেজবানদেরকে বিমান পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করেন। বিমানবন্দরেই কিছু সময় তাদের সঙ্গে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। ইতিমধ্যে বিমানের সময় হয়ে যায়।

ব্রিসবেনে

এখান থেকে ব্রিসবেন এক ঘন্টার পথ। ব্রিসবেন অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যের প্রধান শহর। এ শহরেরই ইসলামিক সোসাইটি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। এখানে আমাকে চারদিন অতিবাহিত করতে হবে। ব্রিসবেন একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তো বটেই তাছাড়া পর্যটকদের মনোরঞ্জনের যথেষ্ট উপাদান থাকার কারণে এখানে এশিয়া ও আমেরিকা থেকে সরাসরি বিমানও এসে থাকে। আমি বিমান থেকে বের হয়ে দেখি বন্ধুদের বড় একটি দল স্বাগত জানানোর জন্য প্রতীক্ষারত

রয়েছেন। তাদের মধ্যে গোল্ডকোষ্টের ইসলামী সেন্টারের প্রধান মাওলানা আসাদুল্লাহ তারেক, ব্রিসবেনের মাওলানা মুহাম্মাদ উযায়ের এবং ব্রিসবেনের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরিবার আলহাজ হাবীব দ্বীনের নাম এখন স্মরণ রয়েছে। ব্রিসবেন অষ্ট্রেলিয়ার সুন্দরতম নগরীসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা তাকে অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করেছেন। শহরটি অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর–পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। ছোট ছোট সবুজ–শ্যামল পাহাড় ও হৃদয়গ্রাহী উপত্যকাসমূহ শহরটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। অষ্ট্রেলিয়ায় এ সময় শীত আসি আসি করছিল। তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আবহাওয়ার মৃদু শৈত্য এখানকার দৃশ্যাবলীকেও অধিক উন্মাদনাকর বানিয়েছিল। শহর–সংলগ্ন সুদৃশ্য একটি আবাসিক এলাকার নাম 'হল্যাণ্ড পার্ক।' এখানকার একটি সবুজ টিলার চূড়ায় বড় সুদৃশ্য একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদটি এ অঞ্চলের মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। এ মসজিদের সম্মুখের ছোট সুদৃশ্য একটি বাড়ীতে আমি অবস্থান করি। বাড়ীটি মূলতঃ মাওলানা উযায়ের সাহেবের, কিন্তু আমার অবস্থানকালে তা বিশেষভাবে আমার ও আমার সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

মাওলানা উযায়ের সাহেব একজন আলোকদীপ্ত আলেম। তিনি বৃটেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানে ধর্মীয় শিক্ষালাভ করেন। হল্যাণ্ড পার্কের মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্রে তিনি প্রশংসনীয় খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। ইংরেজী ভাষা ও ভাবভঙ্গিতে তিনি পরিপূর্ণ পারঙ্গম। তিনি মুসলমান তরুণদেরকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে মাশাআল্লাহ পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন। তাঁর সৌরভপূর্ণ স্বভাব তরুণদেরকে নিজের সঙ্গে অকৃত্রিম বানিয়ে তাদেরকে খুবই ঘনিষ্ঠ করে রেখেছে। আমার অষ্ট্রেলিয়া অবস্থানকালে বিরামহীনভাবে তিনি আমার সঙ্গে থাকেন। তিনি পরিপূর্ণরূপে আতিথ্যের হক পুরো করেন ও মেজবানীর দায়িত্ব পালন করেন।

সেই বাড়ীতে পৌছতে পৌছতে দশটা বেজে গিয়েছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। হালকা হালকা বৃষ্টি শয়নকক্ষের জানালার ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান সবুজ–শ্যামল পর্বতসারির দৃশ্যকে অধিকতর রূপময় করে

তুলেছিল। দীর্ঘ সফরের পর দু'তিন ঘন্টার শান্তিপূর্ণ নিদ্রা মন-মেযাজে নব উদ্যম সৃষ্টি করে। যোহর থেকে আসর পর্যন্তও কোন ব্যস্ততা ছিল না। তবে আসরের পর থেকে সাক্ষাতপ্রার্থীদের আগমন আরম্ভ হয়। মাগরিব নামাযের পর নিমন্ত্রণকারীগণ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে নৈশভোজের আয়োজন করেন। বন্ধু-বান্ধবগণ দূরদূরান্ত থেকে বড় মহব্বত নিয়ে সাক্ষাত করতে আসেন।

নৈশভোজের পর এখান থেকে কিছুটা দূরে অপর একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ করবীতে এশার নামায আদায় করার প্রোগ্রাম ছিল। নামাযের পর আমার ভাষণের ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা এশার সময় সেখানে পৌঁছে দেখি মসজিদের চোহদ্দীর পুরোটা এবং তার আশেপাশের জায়গাসমূহ গাড়ী দ্বারা পরিপূর্ণ। মানুষ শত শত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য এসেছে। এমনকি নামাযের জন্য মসজিদে জায়গার সংকুলান হয় না। অনেকেই বাইরে নামায আদায় করেন। মসজিদের ইমাম সাহেব বললেন ঃ এ মসজিদে ইতিপূর্বে কখনো এত বড় সমাবেশ দেখা যায়নি। অষ্ট্রেলিয়ায় যেহেতু বিভিন্ন জাতির মুসলমানের বসবাস রয়েছে, যাদের মধ্যে উপমহাদেশ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের আরব মুসলমান, সোমালিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিজি, আইল্যাণ্ড, তুরস্ক ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাই এমন সম্মিলিত ভাষা, যা সবাই বুঝতে পারে ইংরেজী ছাড়া অন্য কোনটি ছিল না। সুতরাং আমার মেজবান আমাকে পূর্বেই বলেছিলেন যে, এখানকার সমস্ত বক্তব্য ইংরেজীতে হওয়া জরুরী।

অপরদিকে বিভিন্ন দেশের এ সমস্ত মুসলমানের মাযহাবও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে এদের মনে এ প্রশ্নটি বড় খটকা সৃষ্টি করে থাকে যে, ফেকাহ সংক্রান্ত মাযহাবসমূহের মধ্যে মতবিরোধের কারণ কী? এ ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থা কোন্‌টি? ইতিপূর্বে কিছু লোক এ ধরনের কথা বলে এ বিষয়ে অধিক মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করেছে যে, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এ সমস্ত মাযহাব বেদআত ও শেরেকী। তাই এগুলোর কোন একটিকে মেনে চলা গোমরাহী। যার ফলে এই ভিনদেশে মুসলমানগণ যে সমস্ত

মৌলিক সমস্যার মুখোমুখী, সেগুলোর সমাধানের পরিবর্তে শাখা বিষয়ক মতবিরোধ মুসলমানদের মধ্যে একতার পরিবর্তে দূরত্ব সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে।

অবস্থার এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমার মেজবানগণ আমার আজকের ভাষণের শিরোনাম দিয়েছিলেন 'ইসলামী ফেকাহ ও ফেকাহ বিষয়ক মাযহাবসমূহের স্বরূপ।' যেন ফেকাহ বিষয়ক মাযহাবের স্বরূপ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে লোকদেরকে একতা ও ঐকমত্যের আহবান জানানো যায়। বিষয়টি ছিল জ্ঞানগত ও সবিস্তারে আলোচনা করার মত। এক বৈঠকে তা বর্ণনা করা কঠিন দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীকে এ বিষয়বস্তুর উপর প্রায় দেড় ঘন্টা সময় সবিস্তারে বক্তব্য দান করি। আমি সংক্ষেপে কুরআন কর্তৃক বর্ণিত ফেকাহ সংক্রান্ত মূলনীতিসমূহের উপর আলোকপাত করে নিবেদন করি যে, দ্বীনের অধিকাংশ মৌলিক বিষয়, যেমন তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাস, ইসলামের রুকনসমূহ ; মিথ্যা, গীবত, জুলুম, ব্যভিচার, প্রতারণা, সুদ, জুয়া, মদপান ইত্যাদি হারাম হওয়া এমন সব বিষয়, যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত বিধান সুস্পষ্ট। এসব ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে কখনও কোন মতবিরোধ হয়নি। সুতরাং এসব ব্যাপারে পৃথক কোন মাযহাবের কোন প্রয়োজনও নেই এবং এসব ব্যাপারে কোন মাযহাব হয়ওনি। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহের বহু শাখা মাসআলা এমন রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তাঁর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে কিছুটা সংক্ষেপ করেছেন। যে কারণে সেগুলোর একাধিক ব্যাখ্যার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সে সমস্ত ব্যাখ্যার মধ্য থেকে কোন একটি ব্যাখ্যাকে নির্ধারণ করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপক ও গভীর ইলমের প্রয়োজন রয়েছে। পবিত্র কুরআন নিজেই

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

আয়াত দ্বারা এ মূলনীতি ব্যক্ত করেছে যে, এমন বিস্তর ও গভীর ইলম অর্জন করা সবার জন্য সম্ভবও নয় এবং জরুরীও নয়। এর পরিবর্তে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ এই যে, কিছু লোক এমন উচ্চতর ইলম অর্জনের জন্য নিজেকে ওয়াকফ করবে। তারপর সেই ইলমের

ফলাফল অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। সুতরাং এ মূলনীতির উপর আমল করতে গিয়ে এ উম্মতের ফকীহগণ নিজেদের জীবনকে এ কাজের জন্য ওয়াকফ করে দেন এবং এ সমস্ত বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালান। এ প্রচেষ্টারই নাম 'ইজতিহাদ'।

অপরদিকে যেহেতু এ সমস্ত বিধানের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক ব্যাখ্যা (Interpretations) সম্ভব রয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষের বিচারশক্তি একরকম সৃষ্টি করেননি, এজন্য সহজাত ভাবেই এঁদের ইজতিহাদ ও গবেষণার ফলাফলে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন ফেকাহ–বিষয়ক মাযহাব অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু যেহেতু তাঁদের প্রত্যেকে পূর্ণ সাধুতা, একনিষ্ঠতা ও অধ্যবসায় সহকারে কুরআন ও সুন্নাহের সঠিক উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন, তাই তাঁদের কাউকেই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বা বাতিল বলা যাবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো, খন্দকের যুদ্ধের পর যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বনী কুরাইযার ইহুদীদের উপর আক্রমণ করার হুকুম করা হয় তখন তিনি কতিপয় সাহাবীকে বনী কুরাইযার এলাকা অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁদেরকে তাকীদ করে বলেন যে, আসরের নামায সেখানেই গিয়ে পড়বে। সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা করেন। কিন্তু পথের মধ্যেই আসর নামাযের সময় হয়ে যায়। তখন কতিপয় সাহাবীর মত হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আসরের নামায গন্তব্যস্থলে পৌঁছে পড়ার জন্য তাকীদ করেছেন, তাই সেখানে গিয়েই নামায পড়তে হবে। সুতরাং তাঁরা পথে নামায পড়লেন না। কিন্তু অন্যান্যদের মত ছিল এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আসল উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যেন সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছি। তাঁর কথার উদ্দেশ্য এ ছিল না যে, কোন কারণে পথিমধ্যে আসর নামাযের সময় হয়ে গেলেও পথে আসর নামায পড়া জায়েয হবে না। সুতরাং তাঁরা পথেই আসর নামায পড়লেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় দলের সাহাবাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হলেন। কিন্তু তিনি কোন দলকেই তিরস্কার করলেন না। এ থেকে পরিস্কার প্রতিভাত হয় যে, যে সমস্ত মাসআলার ব্যাপারে ইজতিহাদ করার অবকাশ রয়েছে, সেগুলোর কোন

এক অবস্থানকে একশ'র মধ্যে একশ' ভাগ সঠিক এবং অপরটিকে একশ'র মধ্যে একশ' ভাগ অঠিক বলা যাবে না। তবে শর্ত হল, যিনি ইজতিহাদ করবেন, তাকে বিস্তর ও গভীর ইলমের সে সমস্ত শর্ত পুরো করতে হবে, যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে 'আহকামের ইস্তিম্বাত' অর্থাৎ বিধান উদ্ভাবন ও নির্ণয়ের জন্য জরুরী। এবং শুধুমাত্র এ কারণে তার এ মত গ্রহণ না করতে হবে যে, তা তার প্রবৃত্তির অধিক অনুকূল বা তা অধিক সহজ। বরং কুরআন ও সুন্নাহেরই প্রমাণসমূহের ভিত্তিতে যে মত তার নিকট অধিক শক্তিশালী দৃষ্টিগোচর হবে, নিষ্ঠার সাথে তা গ্রহণ করতে হবে।

হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব এভাবেই অস্তিত্ব লাভ করে। এগুলোর কোনটিকেই গলদ বা বাতিল বলা যাবে না। এগুলোর মধ্যের বিরোধ হক ও বাতিলের বিরোধ নয়, বরং উত্তম ও অনুত্তমের বিরোধ। এখন যে ব্যক্তি না আরবী জানে, না কুরআন ও হাদীসের ইলম সম্পর্কে যথার্থ অবগত, তার জন্য সে যে মুজতাহিদ ইমামকে বড় আলেম মনে করবে, তাঁর মতের উপর আস্থা পোষণ করে সে অনুপাতে আমল করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এটি মূলতঃ সেই মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ নয়, বরং কুরআন ও সুন্নাহরই অনুসরণ। তবে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে তার সাহায্য নেওয়া হয়েছে মাত্র। তাই মূল উদ্দেশ্য যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করা, নিজের প্রবৃত্তির উপর নয়, তাই এটি মোটেও জায়েয নেই যে, যে মাসআলার ব্যাপারে যে ইমামের মাযহাব নিজের প্রবৃত্তির অনুকূলে মনে হবে, সে অনুপাতে আমল করবে। কারণ, কোন ইমামই তাঁর মাযহাবকে এ ভিত্তিতে খাড়া করেননি যে, তা তাঁর প্রবৃত্তির অনুকূল বা অধিক সহজ। বরং দলীল প্রমাণের ভিত্তিতেই তাঁরা এটি নির্ধারণ করেছেন। তাই নিরাপদ পন্থা এটিই যে, মানুষ যে ইমামকে অধিক বড় আলেম মনে করবে বা যাঁর থেকে সমাধান লাভ করা সহজ হবে, তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর আস্থা পোষণ করে সে অনুপাতে কুরআন ও সুন্নাহের শাখা মাসআলাসমূহের উপর আমল করবে। হাঁ, কোন ব্যক্তি যদি এত ব্যাপক ও গভীর ইলমের অধিকারী হয় যে, সে তার নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে

বিভিন্ন মাসআলার মধ্যে ফায়সালা করতে পারে, তাহলে সে যে মাযহাবকে দলিলের ভিত্তিতে অধিক মজবুত মনে করবে, তা গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু তা সবার কাজ নয়। আমি একথাও নিবেদন করি যে, এদেশে মুসলমানগণ বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রিক সমস্যার সম্মুখীন। যেগুলোর সমাধানের জন্য সবাইকে একপ্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে। এ সমস্ত শাখা বিষয়ের বিরোধকে উত্তপ্ত না করে এ মূলনীতির উপর কাজ করতে হবে যে, 'নিজের মাযহাবকে ছেড়ো না এবং অন্যের মাযহাবকে ছিঁড়ো না'। এছাড়া মুসলমানদের বিভিন্ন দলের লোকদের মধ্যে একতা বজায় রাখার অন্য কোন পথ নেই। এ ভীনদেশেও যদি ঐ সমস্ত মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতাকে আমদানী করা হয়, যা আমাদের পাপের ফলে মুসলমান দেশসমূহে পাওয়া যায়, তাহলে এখানে মুসলমানদের ভবিষ্যত রক্ষার কোন পথ থাকবে না।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর আলহামদুলিল্লাহ সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। বক্তব্য শেষে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রশ্নোত্তরের ধারাও চলতে থাকে। আল্লাহর মেহেরবানীতে সমাবেশে অংশগ্রহণকারীগণ খোলামনে স্বীকার করেন যে, এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা তাদের অন্তর থেকে সন্দেহ-সংশয়মূলক বহু খটকাই বিদূরিত হয়েছে।

দু' আড়াই ঘন্টার দীর্ঘ এ মানসিক পরিশ্রমের পর যখন অবস্থান কেন্দ্রে ফিরে যাওয়ার সময় আসে, তখন আমাদের মেজবান জনাব আলহাজ হাবীব দ্বীন সাহেব কিছু সময় বিনোদন করার এবং ব্রিসবেন শহর ঘুরে দেখার প্রস্তাব করেন। জনাব হাবীব দ্বীন সাহেবের পরিবার অষ্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ পরিবার। তাঁরা 'দ্বীন ব্রাদার্স' নামে পরিচিত। তাঁদের পূর্ব পুরুষ মূলতঃ মাদ্রাজে থাকতেন। তাঁরা অষ্ট্রেলিয়ায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। এখানে তাঁরা বিভিন্ন ব্যবসায় সুনাম অর্জন করেন। হাবীব দ্বীন সাহেবের মূল কাজ ঠিকাদারী। একাজে তাঁর নাম গ্রীনিজ বুক অব রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যে, তিনি মাত্র ৫০ সেকেণ্ড সময়ে বড় একটি ভবনকে বিধ্বস্ত করে ভূমির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুনিয়ার সাথে সাথে দ্বীনের উদ্দীপনাও দান করেছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসা

ও স্কুল প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিরাট অংশ রয়েছে। তিনি গাড়ী চালিয়ে ব্রিসবেনের প্রধান এলাকাসমূহ ঘুরে দেখান। ব্রিসবেন এমনিতেও খুব সুন্দর শহর। যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে নগরায়নিক সৌন্দর্যও যুক্ত হয়েছে। তবে রাতের বেলা তার দৃশ্য ছিল সত্যিই দেখার মত। প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট ছোট শাখা নদীরূপে শহরের ভিতরে ঢুকে পড়েছে, যার উভয় তীরে আকাশচুম্বী উজ্জ্বল ভবনসমূহ দাঁড়িয়ে আছে। উভয় তীরকে যুক্ত করার জন্য কিছুদূর পর পর সেতু নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেক সেতুর ডিজাইন ভিন্ন রকম, যা পরিবেশকে দ্বিগুণ সুন্দর করেছে।

শহরটি এক চক্কর ঘুরে দেখার পর হাবীব দ্বীন সাহেব আমাদেরকে একটি পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যান। চূড়াটিকে মাউন্ট গ্রাফেট (Mount Graffet) বলে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, যখন মুসলমানগণ অষ্ট্রেলিয়ায় আসেন, তখন তারা অনেক স্থানের নাম আরবী ঐতিহ্য মতে রেখেছিলেন। এই পাহাড়ের নামও তারা 'আরাফা' রেখেছিলেন। এ নামকে বিকৃত করে ইংরেজীতে গ্রাফেট বানানো হয়। এর সত্যাসত্য আল্লাহ ভাল জানেন। এই পাহাড়ের চূড়া থেকে সম্পূর্ণ শহয়টি দেখা যাচ্ছিল। জমিনের বিস্তৃত আলোসমূহ জমিনকে নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের রূপ দান করেছিল।

পরদিন (২৮শে এপ্রিল) জুমাবার ছিল। অষ্ট্রেলিয়ায় উপমহাদেশের অধিবাসীগণ বিভিন্ন স্থানে তাদের কমিউনিটির জন্য প্রাইভেট রেডিও ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা করেছে। সেগুলোর সম্প্রচারিত প্রোগ্রামসমূহ খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা হয়। তার একটি রেডিও ষ্টেশন এক ঘন্টা সময় ইসলামী শিক্ষা সং ক্রান্ত প্রোগ্রামও সম্প্রচার করে। সেই প্রোগ্রামের অর্থসংস্থানও দ্বীন পরিব.র করে থাকে। ইসলামী শিক্ষার এই উর্দূ প্রোগ্রাম ভোর ছয়টায় সম্প্রচারিত হয়। পূর্ব থেকে জুমুআর দিন সকালে এই রেডিও ষ্টেশন থেকে আমার ভাষণ ও সাক্ষাতকার ঘোষণা করা হয়ে আসছিল যে, সম্প্রচারিত হবে। সুতরাং ফজরের পর অবিলম্বে সেই রেডিও ষ্টেশনে যাই। সেখানে প্রায় আধাঘন্টা সময় উর্দূতে আমার ভাষণ সম্প্রচারিত হয়। যা ছিল এই সফরকালের আমার একমাত্র উর্দূ ভাষণ। পরে ১৫ মিনিটের একটি সাক্ষাতকারও সম্প্রচার করা হয়। আমার সন্দেহ

ছিল যে, এত ভোরে মানুষ কি রেডিও শুনবে? কিন্তু পরবর্তীতে সাক্ষাতকারীগণ রেডিওর এই ভাষণের উদ্ধৃতি দেয়, তাতে অনুমিত হয় যে, এ প্রোগ্রাম ব্যাপক সমাদৃত।

আমাকে আজকের জুমুআর নামায হল্যাণ্ড পার্কের মসজিদে পড়াতে হবে। এসব দেশে যেহেতু জুমুআর দিন ছুটি নেই তাই এখানে নামাযের পূর্বের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, যেন মানুষ দ্রুত নিজের কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারে। সুতরাং নামাযের পূর্বে ২০ মিনিটের মত আমার আলোচনা হয়। মসজিদের উভয় তলা জনাকীর্ণ ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমানদের দুধে চিনিতে একাকার হয়ে নামায আদায় করা এবং তারপর আন্তরিক ভালবাসা নিয়ে পরস্পরে মিলিত হওয়া বড় ঈমানোদ্দীপক দৃশ্যের অবতারণা করে। যা কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়।

জুমুআর আলোচনা তো ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সেদিন রাতেই এশার পর হল্যাণ্ড পার্কের মসজিদেই আমার বিস্তারিত বক্তব্যের ঘোষণা করা হয়েছিল। সুতরাং এশার পর মুসলমানদের ব্যাপক ও সামগ্রিক সমস্যাদি সম্পর্কে প্রায় ১ ঘন্টা সময় আমার ভাষণ হয়। তারপর প্রায় ঐ পরিমাণ সময়ই প্রশ্নোত্তরের ধারা চলতে থাকে। আজকের সমাবেশ সম্পর্কেও স্থানীয় লোকদের প্রতিক্রিয়া ছিল যে, ইতিপূর্বে কখনো রাতের বেলা এত বড় সমাবেশ এ মসজিদে হয়নি। এমন লোকের সংখ্যাও অনেক ছিল, যারা একশ' কিলোমিটারেরও অধিক পথ অতিক্রম করে এসেছিল। তাদের মধ্যে সর্বস্তরের লোকই ছিল। তাদের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি থেকে তাদের এ তৃষ্ণা প্রকটভাবে ভাস্বর হয়ে উঠছিল যে, তারা দ্বীন সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য জানতে চায়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মুসলমানদেরকে নিজেদের দ্বীন অনুপাতে জীবন অতিবাহিত করতে বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তাদের ধর্মীয় চেতনা এত মজবুত যে, তারা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে নিজেদের ইসলামী স্বকীয়তাকে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের বয়োবৃদ্ধ লোকদের থেকেই শুধু নয়, বরং তরুণ যুবকদের থেকেও এমন এমন প্রশ্ন শোনা যায়, যা আমরা আমাদের দেশের তরুণদের থেকে শুনতে পাই না। এ থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, তারা

হালাল–হারাম ও জায়েয–নাজায়েয সম্পর্কে কত বেশী সচেতন। সমাবেশ চলাকালে সাধারণ প্রশ্নোত্তর পর্বের পরও অনেক লোক ব্যক্তিগতভাবে পৃথক সময় নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ চায়। তাদের মধ্যে অনেক লোক ছিলেন এমন, যারা আমার বইপুস্তক ও লেখনীর মাধ্যমে আমার সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। উপমহাদেশের মুসলমানদের নিকট আমার কিতাবসমূহ পৌঁছেছিল। আরব মুসলমানগণ আমার আরবী ও ইংরেজী গ্রন্থসমূহের মধ্যস্থতায় আমার সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এরা ছাড়া অনেকে এমনও ছিলেন, যারা এই প্রথমবার আমার সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু যে নিষ্ঠা, ভালবাসা ও হৃদ্যতার প্রদর্শন তারা করেন,তার চিত্র বিস্মৃত হওয়ার নয়।

শনিবার সকাল ৯টায় কুইন্সল্যাণ্ড ইউনিভার্সিটিতে আমার ভাষণ দানের প্রোগ্রাম ছিল। 'কুইন্সল্যাণ্ড' অষ্ট্রেলিয়ার একটি রাজ্য, আর এটি তার সর্ববৃহৎ ইউনিভার্সিটি। এখানে ১৫ হাজার ছাত্র–ছাত্রী শিক্ষাধীন রয়েছে। এখানকার মুসলমান ছাত্ররা ইউনিভার্সিটির হল কক্ষে আমার ভাষণ দানের আয়োজন করেছিলেন। ছাত্র ও ছাত্রীদের বসার জায়গা পর্দার সাথে পৃথক পৃথক রাখা হয়েছিল। এখানে আমি সবিস্তারে ভাষণ দান করি। তাতে আমি ইলমের স্বরূপ স্পষ্ট করে বর্ণনা করার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা জ্ঞান লাভ করার জন্য মানুষকে যে সমস্ত উপাদান ও উপকরণ দান করেছেন, সেগুলোর বিভিন্ন কর্মপরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করি। জ্ঞান সম্পর্কে ইসলামী ও অনৈসলামী চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরে মুসলমান ছাত্রদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করি। এ প্রোগ্রাম সম্পর্কে পূর্ব থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল বিধায় ছাত্ররা ছাড়া কিছু প্রফেসর ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণও শ্রোতা হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

গোল্ডকোষ্টে

ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রামের পর সেদিনই আমার গোল্ডকোষ্ট যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। এটি কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যের উপকূলীয় একটি শহর। যা ব্রিসবেন থেকে প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি পর্যটনের

বড় একটি কেন্দ্র। ব্রিসবেন হতে বের হয়ে আমাদের এখানে পৌঁছতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগে। মধ্যবর্তী পথটি সবুজ-শ্যামল প্রান্তর, উপকূলীয় এলাকা ও ছোট ছোট শহরের সমন্বয়ে সুসজ্জিত ছিল। যোহরের নামায আমরা গোল্ডকোষ্ট পৌঁছে আদায় করি। আল্লাহর মেহেরবানীতে এখানকার সুদর্শন একটি মসজিদ এ এলাকার মুসলমানদের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। মসজিদের হলকক্ষ অনেক বিস্তৃত। মসজিদের হলকক্ষের নীচে মুসলমানদের সাধারণ সমাবেশের জন্য অতি প্রশস্ত একটি হলকক্ষ রয়েছে। মসজিদের সাথে একটি লাইব্রেরী এবং মুসলমানদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একটি স্কুলও রয়েছে। এই ইসলামী সেন্টারের ধর্মীয় বিষয়সমূহের প্রধান দায়িত্বশীল মাওলানা আসাদ উল্লাহ তারেক সাহেব। মাশাআল্লাহ, তিনি সুবিস্তর ইলমের অধিকারী একজন আলেম। তিনি হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী সাহেব (রহঃ)এর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিননূরী টাউন থেকে 'তাখাসসুস ফিদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ' এর কোর্স সমাপন করে প্রথমে ফিজি আইল্যাণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডে কর্মরত থাকেন। এখন তিনি অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যে মুসলমানদের ধর্মীয় দিক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করছেন। ইংরেজীর উপর তাঁর পূর্ণ দক্ষতা রয়েছে। তাঁর বক্তৃতা এখানে খুব সমাদৃত। তিনি খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক লেখাপড়া করে অনেক খৃষ্টান নারী-পুরুষকে ইসলামে দীক্ষিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ ছাড়াও মুসলমানদের সামগ্রিক সমস্যাদিতে তাঁকে এলাকার মুসলিম অধিবাসীদের প্রতিনিধি মনে করা হয়। তিনি আল্লাহর মেহেরবানীতে বুদ্ধিমত্তার সাথে এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

একবার কিছু যুবককে কোন এক অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে একজন মুসলমান তরুণও ছিল। অবশিষ্টরা ছিল অমুসলিম। অমুসলিমদের উকিল সাম্প্রদায়িক মনোভাব গ্রহণ করে বলে যে, মূল অপরাধি মুসলমান যুবকটি। সে-ই অন্যান্য যুবকদেরকে এই অপরাধ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। সে তার দাবীর পক্ষে এই প্রমাণ খাড়া করে যে, মুসলমানরা জীবনের বিভিন্ন শাখায় কট্টরপন্থী হয়ে থাকে। জজ তার

কথামত অমুসলিম তরুণদেরকে নির্দোষ ঘোষণা দিয়ে শুধুমাত্র মুসলমান ছেলেটিকে দণ্ডাদেশ দেয়। সে তার রায়ে লেখে যে, মুসলমানরা কট্টরপন্থী। এ সময় মাওলানা তারেক জজের এ অবিচারমূলক রিমার্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। পত্রপত্রিকায় তাঁর সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়। ব্যাপারটি অনেক দূর গড়ায়। অবশেষে জজকে সেই রিমার্কের কারণে স্পষ্ট ভাষায় ভুল স্বীকার করতে হয় এবং তাও পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পায়।

এখানে খৃষ্টান মিশনারী স্কুলের ছাত্রদেরকে মসজিদসমূহ পরিদর্শন করানোর প্রচলনও রয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মিশনারীর শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতামূলক অন্ধত্ব নির্ভর পুরাতন প্রশ্নসমূহ শিখিয়ে পাঠায়, যেগুলো খৃষ্টানরা বহুবছর ধরে ইসলাম সম্পর্কে প্রসিদ্ধ করে রেখেছে। যেমন, ইসলাম তরবারীর শক্তিতে বিস্তার লাভ করেছে। ইসলামে নারীদের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার এমনই এক পরিদর্শনকালে মাওলানা তারেক ছাত্রদের প্রশ্নের এমন প্রভাবশালী আঙ্গিকে উত্তর দেন যে, তাদের শিক্ষক দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেন যে, আমাদের বহু বছরের প্রতিক্রিয়ার বিপক্ষে আজ প্রথমবার এই স্বরূপ উন্মোচিত হয় যে, ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এসব আপত্তিসমূহ অবিচারমূলক ও নিছক প্রপাগাণ্ডার ফসল।

গোল্ডকোষ্ট পৌঁছার পর সেদিন সম্মিলিত কোন প্রোগ্রাম ছিল না। তবে দুপুর ও রাতের আহারের সময় এলাকার সম্মানিত লোকদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। এ অবস্থা দেখে খুবই আনন্দিত হই যে, এখানকার মুসলমানগণ—যারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত—দুধ ও চিনির ন্যায় একাত্ম হয়ে এই ইসলামী কেন্দ্রের মাধ্যমে মুসলমানদের খেদমতে লিপ্ত রয়েছেন।

আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়টি খালি ছিল। এ সময় আমরা ভ্রমণের জন্য উপকূলীয় এলাকার দিকে বের হই। গোল্ডকোষ্ট বিশ্বের সুন্দরতম উপকূলসমূহের অন্যতম। প্রশান্ত মহাসাগরের এই উপকূল ধরে সত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ সুদৃশ্য এক উপকূলীয় সড়ক চলে গেছে। সড়কটিতে সমুদ্রের তীরে বিভিন্ন বিনোদনকেন্দ্র বানানো হয়েছে।

সড়কের ধারে পর্যটকদের অবস্থানের জন্য কয়েক মাইল এলাকা পর্যন্ত হোটেল ও এপার্টমেন্টসমূহের দীর্ঘ এক সারি রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর পর্যটকগণ এখানকার উপকূলীয় সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য এসে থাকে। এখন শীতকাল বিধায় এ উপকূল সেই নোংরামী ও কুরুচিপূর্ণ কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত রয়েছে, যা সাধারণতঃ পাশ্চাত্য-প্রভাবান্বিত উপকূলসমূহকে একজন সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য অসহনীয় করে দেয়। সবুজ-শ্যামল পাহাড়, শ্যামলিয়াময় ময়দান ও তাতে উৎপন্ন নানারঙের বৃক্ষসমূহের সম্মুখস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের নীলাভ তরঙ্গমালা আল্লাহর নিপুণ শিল্পের অবিস্মরণীয় দৃশ্য তুলে ধরছিল। বিরামহীন মানসিক পরিশ্রমের মধ্যবর্তী বিশ্রামের এ সময়টি বড়ই উদ্দীপনাকর হয় এবং তা পুনরুদ্যমে আমাকে প্রাণবন্ত করে।

পরদিন ছিল রবিবার। ১১টায় গোল্ডকোষ্টের জামে' মসজিদে আমার ভাষণের এলান হয়েছিল। আজ ছিল ছুটির দিন, মানুষ এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য বহু দূর দূরান্ত হতে সমবেত হয়েছিল। কিছু মানুষ একশ' মাইলেরও অধিক পথ অতিক্রম করে এসেছিল। প্রায় সোয়া ঘন্টার ভাষণের পর যোহর নামায পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরের ধারা চলতে থাকে। যোহর নামাযের পর চলে ব্যক্তিগত সাক্ষাত। তাতে মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করে। এসবের সামগ্রিক ফল দ্বারা অনুমিত হয় যে, প্রত্যেক স্তরের মুসলমানগণ নিজেদের ইসলামী স্বকীয়তাকে সংরক্ষণ এবং দ্বীনী শিক্ষার আলোকে নিজেদের সমস্যার সমাধানের জন্য কত বেশী চিন্তাশীল।

আসরের পর আমরা ব্রিসবেন প্রত্যাবর্তনের জন্য রওয়ানা করি। সেখানে পৌঁছে মাগরিবের নামায আদায় করি। যদিও ব্রিসবেন শহরে বিশোর্ধ মসজিদ রয়েছে, কিন্তু এখন শহরের প্রাণকেন্দ্রের 'দারা' মহল্লায় একটি নতুন মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। এটি হবে শহরের সর্ববৃহৎ মসজিদ। এশার পর নিকটবর্তী একটি হলকক্ষে এই মসজিদ নির্মাণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে প্রভাবশালী লোকেরা আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করেন। এখানেও আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ হয়। এই মজলিসেই উপস্থিত লোকেরা ছাদ ঢালাইয়ের

জন্য চল্লিশ হাজার ডলার মসজিদের ফাণ্ডে চাঁদা দেয়।

অষ্ট্রেলিয়ার মুসলমানগণ এদিক থেকে অত্যন্ত সুসংহত যে, প্রত্যেক মসজিদের সাথে ইসলামী সোসাইটি নামে একটি করে সংগঠন রয়েছে। তারপর প্রত্যেক রাজ্যের সমস্ত ইসলামী সোসাইটির সমন্বয়ে প্রাদেশিক পর্যায়ে একটি ইসলামী কাউন্সিল কাজ করছে। এ সমস্ত প্রাদেশিক ইসলামী কাউন্সিলসমূহ সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি ফেডারেশন বানিয়েছে। তার নাম 'অষ্ট্রেলিয়ান ফেডারেশন অব ইসলামিক কাউন্সিলস' (AFIC)। এভাবে তৃণমূল পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান পরস্পরে সংযুক্ত ও সুসংহত। 'দারা' মসজিদের এ সমাবেশে AFIC-এর চেয়ারম্যান, কুইন্সল্যাণ্ড ইসলামী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং 'দারা' ইসলামিক সোস্যাইটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলে মসজিদ নির্মাণের এ কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মেলবোর্নে

এটি ছিল আমার ব্রিসবেনে অবস্থানের শেষ রাত। আগামী দিন সকাল সাড়ে আটটায় আমাকে মেলবোর্নের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। এ সফরে গোল্ডকোষ্টের মাওলানা তারেক সাহেব ও হল্যাণ্ড পার্কের মাওলানা উযায়ের সাহেবও আমার সাথে ছিলেন। মেলবোর্ন ব্রিসবেন থেকে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এটি দক্ষিণ-পূর্বে এ মহাদেশের প্রায় শেষ প্রান্ত। মেলবোর্ন ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী। সিডনীর পর এটি অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। সিডনীর পর এ শহরেই সর্বাধিক মুসলমান অধিবাসী রয়েছে। এখানেও প্রায় চল্লিশটি মসজিদ রয়েছে। মুসলমানগণ নিজেদের সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য নিজেরা বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করেছেন। সম্প্রতি দু' বছর ধরে করাচীর মাদরাসা আয়েশার ব্যবস্থাপকগণ এখানে বড় একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিক্ষাকেন্দ্রটি দারুল উলূম কলেজ ফ্যাকনার নামে প্রসিদ্ধ। এর পৃষ্ঠপোষক এক হৃদয়বান আরব মুসলমান। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার তাবলীগ জামাতেরও প্রধান। দারুল উলূম করাচী থেকে

'তাখাচ্ছুছ' সমাপনকারী মাওলানা নাজীব সাহেব এ প্রতিষ্ঠানের সহকারী পরিচালক ও মুফতী পদে কাজ করছেন। দ্বিতীয় সহকারী পরিচালক মাওলানা মুস্তাফা সাহেব, তিনি তুরস্কের অধিবাসী। তিনিও আমাদের দারুল উলূমে শিক্ষা লাভ করেন। তৃতীয় সহকারী পরিচালক মাওলানা অসীম সাহেব, তিনিও তরুণ যুবক ও ভদ্র আলেম। এঁরা সবাই বিমান বন্দরে আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন।

বিমানবন্দর থেকে আমরা দারুল উলূম কলেজে যাই। এটি মেলবোর্নের ফ্যাকনার মহল্লায় অবস্থিত। তারই একটি বাড়ীতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দারুল উলূম কলেজটি মাত্র দেড় দু' বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে এখন প্রতিষ্ঠানটি বড় একটি ভবন লাভ করেছে। যা পূর্বেও একটি স্কুল ভবন ছিল। তাই ভবনটি ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পূরণে অধিক উপযুক্ত। এই ভবনেরই একটি হলকক্ষ অস্থায়ীভাবে নামাযের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তার বাইরে সুপ্রশস্ত একটি জায়গা খালি রয়েছে। সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে দারুল উলূম কলেজে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। নবম শ্রেণী পর্যন্ত সরকারী পাঠ্যক্রম পরিপূর্ণরূপে পড়ানোর সাথে সাথে ছাত্রদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায়ও শিক্ষিত করা হয়। ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে তাদেরকে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। তাদের ইউনিফর্ম থেকে নিয়ে রুটিন পর্যন্ত সববিষয়ে ধর্মীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। বর্তমানে কলেজে তিনশ' ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষারত রয়েছে। এ বছর থেকে ইসলামী শিক্ষাদানের জন্য 'দরসে নিযামীর' পাঠদানও আরম্ভ করা হয়েছে। শহরের মুসলমানগণ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নিজেদের সন্তানদেরকে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে থাকেন। সকাল বেলায় সন্তানদেরকে পৌঁছানো এবং বিকাল বেলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ীর লম্বা সারি লেগে থাকে। কোন কোন মাতা-পিতা দু' ঘন্টার পথ অতিক্রম করে সন্তানদেরকে এখানে নিয়ে আসেন। এতদসত্ত্বেও অনেক ছাত্রের ভর্তির আবেদন এজন্য গ্রহণ করা যায়নি যে, বর্তমানে তিনশ'র অধিক ছাত্রের স্থান সংকুলান হয় না।

যোহর নামাযের পর কলেজ পরিদর্শন করানো হয়।

আলহামদুলিল্লাহ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম–শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থাপনা, শিক্ষা–দীক্ষার মান ও পরিবেশে মোটের উপর ধর্মীয় প্রভাব প্রত্যক্ষ করে মন বড় আনন্দিত হয়। মাশাআল্লাহ, কলেজের লাইব্রেরীও এখানকার হিসাবে বেশ সমৃদ্ধ ও মূল্যবান। এতে যথেষ্ট পরিমাণ আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষার মানসম্পন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের সংগ্রহ রয়েছে এবং এর সংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিদর্শনের পর এখানকার শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সম্মুখে আমার ভাষণদানের ব্যবস্থা ছিল। কলেজের শিক্ষা–মাধ্যম ইংরেজী। শিক্ষক–শিক্ষিকাগণও বিভিন্ন জাতির লোক। তাই এখানে যে ভাষাটি সবাই বুঝতে পারবে তা ছিল কেবলমাত্র ইংরেজীই। সুতরাং 'শিক্ষকের দায়িত্ব' সম্পর্কে ইংরেজীতে বক্তব্য প্রদান করা হয়।

আমি যে দেশেই যাই, আমার প্রোগ্রামের একটি বিশেষ অংশ হিসাবে আমি সেখানকার বড় কোন গ্রন্থাগার দেখি। নতুন কোন উপকারী গ্রন্থ পেলে তা ক্রয় করি। এখন পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ার কোন গ্রন্থাগারে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। আজ আসর নামাযের পর আমার মেজবানগণ আমার এ আশা পূরণ করেন। এজন্য আমাকে মেলবোর্ন শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় নিয়ে যান। একটি বড় গ্রন্থাগারে কিছু সময় অতিবাহিত করি। বর্তমানে পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা ও প্রচলিত অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের সমালোচনা এত অধিক হারে আসছে যে, প্রায় প্রত্যেক মাসে কোথাও না কোথাও কোন না কোন গ্রন্থ এ বিষয়ের উপর বাজারে আসছে। এ বিষয়েরই কয়েকটি গ্রন্থ এখানেও পেয়ে যাই। সেগুলো আমি সাথে নিয়ে আসি। মাগরিবের নামাযও মধ্য শহরের একটি মসজিদে আদায় করি।

এশার পর দারুল উলূম কলেজে 'অমুসলিম দেশে মুসলমানদের দায়িত্ব' আলোচ্য বিষয়ে আমার ভাষণ দানের ঘোষণা হয়েছিল। আজ ছুটির দিন থাকায় এবং দারুল উলূম কলেজ শহর থেকে বেশ দূরে হওয়ায় আয়োজকগণ বড় ধরনের কোন সমাবেশের প্রত্যাশা করছিলেন না। কিন্তু এশার আযানের সময় আমরা যখন কলেজের চৌহদ্দীর নিকট পৌঁছি, তখন পুরো চৌহদ্দী ও তার বাইরের জায়গা কার দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। এশার নামাযের জন্য মসজিদে স্থান সংকুলান হয় না। মহিলাদের

জন্য পৃথক হল কক্ষে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জানতে পারলাম যে, মহিলাদের সংখ্যা ছিল পুরুষদের চেয়েও অধিক। মূল ভাষণ হয় ইংরেজীতে। তবে প্রায় ছয়–সাতটি ভাষায় পৃথক পৃথক তরজমার ব্যবস্থা ছিল। এখানে সে ব্যবস্থা এভাবে হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন ভাষার শ্রোতারা পৃথক পৃথক দলে সমবেত হয়। প্রত্যেক দলে এক ব্যক্তি তাদের ভাষায় মূল ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে তার অনুবাদ করতে থাকে। নিয়মমাফিক ভাষণ দানের পর অনেক রাত পর্যন্ত দীর্ঘ সময় প্রশ্নোত্তরের বৈঠকও চলতে থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া রেডিওর (S.B.S) কিছু প্রতিনিধি সাক্ষাতকার নেওয়ার জন্য এসে অপেক্ষা করছিলেন। ভাষণদানের পর তাঁরা প্রায় আধাঘন্টার সাক্ষাতকার রেকর্ড করেন।

তারপরও ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও স্থানীয় সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকে। শুতে শুতে রাত ১২টা বেজে যায়।

মেলবোর্নে মিঃ নাসের আবদুল হাকিম নামের একজন মিসরী মুসলমান 'মুসলিম কমিউনিটি কোঅপারেটিভ' নামে (যার সংক্ষিপ্ত রূপ M.C.C.A. হওয়ার কারণে মানুষ একে 'মক্কা' উচ্চারণ করে) একটি অর্থ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার উদ্দেশ্য ইসলামের বিধান অনুপাতে পুঁজি বিনিয়োগের কাজ করা। তাঁর ও স্থানীয় আলেমগণের ইচ্ছা ছিল, আমি যেন প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করি এবং এটি শরীয়তের চাহিদা কী পরিমাণ পুরো করছে তা প্রত্যক্ষ করি। তাই ২রা মে মঙ্গলবার ৯টায় তাঁর অফিসে যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। অফিসটি মেলবোর্ন শহরে অবস্থিত। মিঃ নাসের আবদুল হাকিম আমার নিকট প্রতিষ্ঠানটির মূল অবকাঠামো বর্ণনা করলেন। যার সারকথা এই যে, মানুষ এই প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অতিরিক্ত অর্থ জমা করে তার শেয়ার লাভ করে এবং প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসানে শরীক হয়। তারপর প্রতিষ্ঠান ইসলামের বিনিয়োগের বিভিন্ন পন্থা মোতাবেক লোকদেরকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পুঁজির সংস্থান করে থাকে। এ পর্যন্ত এর তৎপরতার বড় অংশ আবাসিক গৃহের ব্যবস্থার জন্য ইসলামের ভিত্তিতে পুঁজি জোগান দেওয়া চলে আসছে। যাকে তারা Diminishing Partnership এর মূলনীতিতে খাড়া করেছে। অর্থাৎ

প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে যৌথভাবে বাড়ী ক্রয় করা হয়। বিশ শতাংশ মূল্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরিশোধ করে আর আশি শতাংশ করে প্রতিষ্ঠান। তারপর প্রতিষ্ঠান নিজের অংশ ঐ ব্যক্তিকে ভাড়া দেয় তারপর ক্রম ক্রমে ঐ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয় করতে থাকে অবশেষে সে সম্পূর্ণ বাড়ীর মালিক হয়ে যায়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে বাড়ীর মালিকানা লাভের জন্য সাধারণতঃ সুদের উপর ঋণ নিতে হয়, তাই শরীয়ত সম্মত কোন পন্থায় বাড়ী লাভ করা মুসলমানদের জন্য বড় একটি সমস্যা। আলহামদুলিল্লাহ, এখন সেসব দেশে এমন সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, যেগুলোর মাধ্যমে ইসলামী বিধান মত বাড়ীর মালিকানা লাভ করা সম্ভব হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিও এ ধরনেরই একটি প্রতিষ্ঠান। মিঃ নাসের আবদুল হাকিম বললেন, গত বছর প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের মধ্যে ৭ শতাংশ লভ্যাংশ বন্টন করা হয়েছে, যা এখানকার লভ্যাংশের হারের দিক থেকে একটি বড় ধরনের সফলতা।

বেশীর ভাগ দেশের ইসলামী অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীয়তের বিষয়বস্তুসমূহের তত্ত্বাবধান করে থাকে একটি শরীয়া বোর্ড। এ প্রতিষ্ঠানটির এখনও এ ধরনের কোন শরীয়া বোর্ড নেই। আমি প্রস্তাব পেশ করি যে, আলহামদুলিল্লাহ অষ্ট্রেলিয়াতেই এমন অনেক আলেম ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা এ কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন। তাই এমন একটি শরীয়া বোর্ড গঠন করা জরুরী। যেন বাস্তবেই শরীয়ত মত কাজ হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের আস্থা লাভেও সক্ষম হয়। মিঃ নাসের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যে, ইনশাআল্লাহ তিনি সত্বরই এ প্রস্তাব অনুপাতে আমল করার চেষ্টা করবেন। মাশাআল্লাহ, মাওলানা মুফতী নজীব সাহেব আমাদের দারুল উলূম করাচীতে 'ইফতা'র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রে উচ্চতর যোগ্যতার অধিকারী আলেম। ইল্ম ও ফেকাহ্র উৎকৃষ্ট রুচির ধারক। আধুনিক সমস্যাদির ব্যাপারেও তাঁর ভাল দক্ষতা রয়েছে। ইংরেজী ভাষার উপরও তাঁর দখল রয়েছে। তিনি প্রায় দেড় বছর পূর্বেই আমাদের পরামর্শে অষ্ট্রেলিয়া এসেছেন। এ স্বল্প সময়ে আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি শুধুমাত্র দারুল উলূম কলেজে

শিক্ষাদান ও তার ব্যবস্থাপনার জটিল কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দিচ্ছেন তাই নয়, বরং তিনি একজন মুফতী হিসেবে এলাকার মুসলমানদের ধর্মীয় দিক নির্দেশনার কর্তব্যও দায়িত্বশীলতা ও একাগ্রতার সঙ্গে আদায় করছেন। আমি এম.সি.সি.আই এর কর্তৃপক্ষকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেই। ইনশাআল্লাহ তিনি এ কাজের জন্য তাদের উত্তম সহযোগী প্রমাণিত হবেন।

১২টার দিকে আমরা এ প্রতিষ্ঠানের কাজ থেকে অবসর হয়ে অল্প সময় মেলবোর্ন শহরের বিশেষ বিশেষ স্থান ঘুরে দেখি। ক্যানবেরা রাজধানী হওয়ার পূর্বে মেলবোর্ন কোন একসময় অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী ছিল। এটি দক্ষিণ–পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ার শেষ প্রান্ত। তারপর ছোট কয়েকটি দ্বীপ বাদ দিয়ে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সমুদ্রই সমুদ্র। এটি ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী। এর আশেপাশে স্বর্ণের অনেক খনি রয়েছে। যারফলে এটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। শহরের বেশীর ভাগ ভবন প্রাচীন বৃটিশ ঐতিহ্যের দর্পণ। তবে সমুদ্র–তীরের অদূরে আমেরিকান শৈলীর সুউচ্চ ভবনসমূহও দৃষ্টিগোচর হয়। এ অঞ্চলে শীত তুলনামূলক বেশী। তাছাড়া শহরটি ঘন ঘন ঋতু বদলের ব্যাপারেও সমগ্র অষ্ট্রেলিয়াতে প্রসিদ্ধ। সেদিন আবহাওয়া মনোমুগ্ধকর শীতল ছিল। সমুদ্রতীরের প্রশান্ত পরিবেশে কাটানো কয়েকটি মুহূর্ত আমাদের জন্য বড় আনন্দোদ্দীপক হয়।

সেদিনই মাগরিবের পর আশপাশের বহু আলেম ও প্রভাবশালী ব্যক্তি সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়। এশার পর পুনরায় আমার বক্তব্য ছিল। সেদিন আমি বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করে বেশী সময় গতদিনের অসম্পূর্ণ প্রশ্নসমূহের উত্তরদানে ব্যয় করি। অনেক রাত পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবেও প্রশ্নের ধারা অব্যাহত থাকে। বিরামহীন সফর আর প্রোগ্রামের কারণে দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি প্রবল হলেও আলহামদুলিল্লাহ, সাথে এই আত্মিক প্রশান্তিও লাভ হয় যে, এতে করে অনেকের সংশয় দূর হয় আর আমারও মুসলমান ভাই–বোনদের খেদমত করার সুযোগ লাভ হয়।

বুধবার সকাল ৯টায় আমাদেরকে সিডনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতে

হয়। আমরা সোয়া আটটার দিকে বিমানবন্দর পৌঁছে যাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারি যে, আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কারণে বিমান লেট হবে। মেলবোর্নের বন্ধুরা নিকটবর্তী একটি রেস্তোরাঁয় আমাকে নিয়ে বসেন। বারোটার সময় বিমান রওয়ানা করে। যে সমস্ত বিষয়ে পূর্বে পরামর্শ করার সময় হয়ে ওঠেনি, এ সময়টিতে তাঁরা সেই কমতি পূরণ করে নেন।

সিডনীতে

মেলবোর্ন থেকে সিডনী ১ ঘন্টার পথ। সিডনীর বন্ধুরা ১০টা থেকে বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা ১টার সময় সিডনী বিমানবন্দরে অবতরণ করি। মাওলানা ডঃ সাব্বির সাহেব স্বাগত জানানোর জন্য সবান্ধবে উপস্থিত ছিলেন। হযরত মাওলানা নাজমুল হাসান থানভী সাহেব (রহঃ)এর সাহেবজাদা নাযিরুল হাসান সাহেবও বিমানবন্দরে এসেছিলেন। বিমান বিলম্বের কারণে হাতে সময় ছিল কম। সিডনীর একটি শহরতলী এলাকা 'রুটিহল' নামে প্রসিদ্ধ। সেখানকারই জামে মসজিদ ও মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন ডঃ সাব্বির সাহেব। আজকের দিনটি আমাদেরকে সেখানেই অতিবাহিত করতে হবে। তাই বিমানবন্দর থেকে সোজা 'রুটিহল' চলে যাই। নামায ও আহার শেষে সামান্য সময় বিশ্রাম করি। আসরের পর ডঃ সাব্বির সাহেব আলেমদের সমাবেশ রেখেছিলেন। আমি ব্রিসবেন যাওয়ার পথে যখন সিডনীতে অবতরণ করেছিলাম, মাওলানা সাব্বির সাহেব তখনই বলেছিলেন যে, এমন কিছু স্থানীয় সমস্যা রয়েছে, যেগুলোর সিদ্ধান্ত এখানকার স্থানীয় আলেমগণ আপনার জন্য স্থগিত রেখেছেন। আজকের এ সমাবেশ সে উদ্দেশ্যেই আহবান করা হয়েছিল। সে সমস্ত সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল, চাঁদ দেখা সংক্রান্ত। এতে মতবিরোধের কারণে মুসলমানগণ বড় সমস্যার শিকার ছিলেন। এ বিষয়ে উদয়াচলের ভিন্নতার কারণে তাদের মতামতেও বিভিন্নতা ছিল। সুতরাং আসর ও মাগরিবের পর বিভিন্ন মতামত শ্রবণ এবং সেগুলোর উপর আলোচনার পর আল্লাহর মেহেরবানীতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ একটি ফর্মুলার উপর

একমত হন। তারপর তা লিখে সবাই তাতে স্বাক্ষর করেন। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, অস্ট্রেলিয়ার আরো কিছু দলের লোক, যারা এ বৈঠকে হাজির হতে পারেনি, স্থানীয় উলামায়ে কেরাম তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরও ঐকমত লাভের চেষ্টা করবেন। মজলিস শেষ হতে হতে এশার আযান হয়ে যায়। নামাযের জন্য মসজিদে গিয়ে দেখি মসজিদ নামাযীদের দ্বারা জনাকীর্ণ। যদিও 'রুটিহলের' এই মসজিদ শহর থেকে বেশ দূরে অবস্থিত এবং আসর পর থেকে অবিরাম বৃষ্টিও হচ্ছিল এবং এটি ছুটির দিনও ছিল না, এতদসত্ত্বেও এত অধিক সংখ্যক মুসলমানের এখানে উপস্থিতি দ্বীনের সঙ্গে তাদের অসাধারণ হৃদ্যতার স্পষ্ট আলামত।

সারাদিনের সফর ও বিরামহীন ব্যস্ততার ফলে দেহ ও মনকে প্রবল ক্লান্তি আচ্ছন্ন করেছিল। কিন্তু উপস্থিত লোকদের আবেগ ও উদ্দীপনা দেখে অনুভূত হলো, যেন আপনাআপনিই মন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রথমে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দানের খেয়াল ছিল। কিন্তু উপস্থিত সুধীজনদের বরকতে এ বক্তব্যও প্রায় সোয়া ঘন্টা দীর্ঘ হয়। তারপর প্রশ্নোত্তরের বৈঠকও হয়। যাদের সঙ্গে আমার পূর্বে কোনদিন সাক্ষাত হয়নি, যাদেরকে কোনদিন আমি দেখিনি এবং তারাও আমাকে কখনো দেখেননি, যারা শুধুমাত্র ধর্মীয় বন্ধনের ভালবাসা হৃদয়ে পোষণ করে এত দূর থেকে এখানে এসেছেন, তাদের নিষ্ঠা ও ভালবাসা এমন এক মহামূল্যবান দৌলত, যার মূল্য পরিশোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাষণের পর তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের দৃশ্যটিও দর্শনীয় ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে এমন ছিলেন, যারা আমার লেখনীর মাধ্যমে আমাকে চিনতেন। অনেকে এমন ছিলেন, যারা শুধুমাত্র আমার নাম শুনেছিলেন। আর অনেকে এমন ছিলেন, যারা আমার সম্পর্কে পূর্ব থেকে কিছুই জানেন না। তারা কেবলমাত্র একথা জানতে পেরে এখানে এসেছিলেন যে, পাকিস্তান থেকে দ্বীনের একজন তালিবে ইলম এসেছে। সে দ্বীন সম্পর্কে কিছু কথা রাখবে।

ভাষণের পর অবস্থান স্থলে পৌঁছে জানতে পারি যে, দেশব্যাপী ভয়েস অব ইসলাম নামে মুসলমানদের একটি রেডিও রয়েছে। যার প্রোগ্রাম সমগ্র অস্ট্রেলিয়ায় শোনা হয়। সেই রেডিওর প্রতিনিধি

সাক্ষাতকার নেওয়ার জন্য বসে আছেন। প্রায় আধাঘন্টা তাদেরকে সাক্ষাতকার দানে ব্যয় হয়। তবে তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন। আশা করি যে, এতে করে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

পূর্ব প্রোগ্রাম মোতাবেক আমাকে আগামীদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিনের তৃতীয় প্রহরে করাচীর উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করতে হবে। কিন্তু একে তো সিডনীর বন্ধুগণ এখানে আরো কিছুদিন থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন, দ্বিতীয়তঃ মাওলানা ডঃ সাব্বির সাহেবের সঙ্গে ক্যানবেরার লোকেরা যোগাযোগ করে প্রস্তাব করেছিলেন যে, জুমুআর দিনটি আমি যেন ক্যানবেরায় কাটাই এবং সেখানেই জুমুআর বক্তব্যও রাখি। কিন্তু বিমান ব্যবস্থা এমন ছিল যে, জুমুআর দিন ক্যানবেরায় কাটানো হলে সোমবার পর্যন্ত বিমানের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা হবে না। তৃতীয়তঃ হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক সাহেব (কুঃ ছিঃ)এর সাহেবজাদা জনাব নেজামুল হক থানভী সাহেব এবং হযরত মাওলানা নাজমুল হাসান থানভী সাহেব (রহঃ)এর সাহেবজাদা নাযিরুল হাসান থানভী সাহেব সিডনী থেকে প্রায় একশ' কিলোমিটার দূরে সেন্ট্রাল কোষ্টে বসবাস করেন। আমার পুরো সফরে জায়গায় জায়গায় এ মর্মে তাঁদের ফোন আসতে থাকে যে, অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থানের সময় কিছুটা বৃদ্ধি করে কমপক্ষে একদিন তাঁদের সঙ্গে সেন্ট্রাল কোষ্টে কাটানো হোক। এঁরা সবাই রাতের আহারের সময় মাওলানা সাব্বির সাহেবের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এ প্রস্তাব নিয়ে আসেন যে, শুক্রবার ও শনিবারের মধ্যবর্তী রাতে একটি বিমান সিঙ্গাপুর যায়। সেই বিমানযোগে শনিবার বিকাল নাগাদ করাচী পৌঁছা সম্ভব। আমি এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম, এমন সময় নিযামুল হক থানভী সাহেব বলেন যে, 'আপনি অনুমতি দিলে ওস্তাদ যওকের একটি কবিতা শুনাতাম, যা আমাদের অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়।'

তারপর তিনি তদীয় সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হকের (কুঃছিঃ) বিশেষ বাচনভঙ্গি ও সুরে এই কবিতা আবৃত্তি করে শোনান—

وہ صبح کو آئیں تو کروں باتوں میں دوپہر
اور چاہوں کہ دن تھوڑا سا ڈھل جائے تو اچھا
ڈھل جائے جو دن بھی تو اسی طرح کروں شام
اور چاہوں کہ گر آج سے کل جائے تو اچھا
جب کل ہو تو پھر یونہی کہوں کل کی طرح سے
گر آج کا دن بھی یونہی ٹل جائے تو اچھا
القصہ نہیں چاہتا جائیں وہ یہاں سے
دل ان کا یہیں کاش بہل جائے تو اچھا

"সে ভোরে এলে কথায় কথায় দুপুর করব,
আর চাব যে, দিন আরেকটু গড়িয়ে গেলে ভাল হত।
দিন গড়িয়ে গেলে এভাবেই সন্ধ্যা করব,
আর চাব যে, আজ না গিয়ে কাল গেলে ভাল হত।
আগামীকাল হলে, গতকালের মতই বলব যে,
আজকের দিনটিও এভাবে পার হলে ভাল হত,
মোটকথা, সে এখান থেকে চলে যাক তা চাইব না।
হায়! তার মনটা এখানেই বসে গেলে ভাল হত।"

এঁরা এমন মুহাব্বতের সঙ্গে এই ফরমায়েশ করেন যে, তাঁদের কথা রদ করতে পারলাম না। সিডনীর প্রভাবশালী মুসলমান জনাব সারোয়ার সাহেব সীট ও টিকিট পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে অষ্ট্রেলিয়ায় আমার অবস্থান প্রায় দেড়দিন বেড়ে যায়। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত বন্ধুদের উপভোগ্য আসর চলতে থাকে। নেযামুল হক সাহেব এবং নাযিরুল হাসান সাহেব ভাল কাব্যরসের অধিকারী। তাই কিছুসময় কবিতা আবৃত্তিতেও অতিবাহিত হয়। মাশাআল্লাহ, ডঃ সাব্বির সাহেবকে এখানে ধর্মীয় পথ-নির্দেশনার কেন্দ্রীয় ও প্রধান ব্যক্তিত্ব মনে করা হয়। তিনি স্থানীয় অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। অবশেষে অনেক

রাতে বিছানায় যাওয়ার সুযোগ হয়।

৪ঠা মে বৃহস্পতিবার ফজরের পর মসজিদে আমার সংক্ষিপ্ত হাদীসের দরস (পাঠদান) হয়। নাস্তার পর ডাঃ সাব্বির সাহেব ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, এখানে কাছেই মেশিনে মুরগী জবাই করার অনেক বড় একটি ফ্যাক্টরী রয়েছে। সেটি পরিদর্শন করে দেখা যাক যে, এ পদ্ধতিতে ইসলামী বিধানমত জবাই করার দাবী পুরো হয় কিনা। যদিও আমি আমেরিকা, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতিতে জবাইয়ের বিভিন্ন কারখানা দেখেছি এবং এ বিষয়ে আমার আরবী পুস্তিকা 'আহকামুয্ যাবায়েহ'-তে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, কিন্তু মাওলানা সাব্বির সাহেব বললেন যে, এই ফ্যাক্টরীর জবাই করার পদ্ধতি কিছুটা ভিন্নরকম। এতে শরীয়তের দাবী পূরণের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এটি দেখা সমীচীন হবে। সুতরাং আমরা সবাই এই যান্ত্রিক জবাই কেন্দ্রে যাই। এর নাম Rootihill Homeboush Abott। এর মধ্যে প্রতিদিন গড়ে ষাট হাজার মুরগী জবাই হয়। আমি আমার 'আহকামুয্ যাবায়েহ' পুস্তিকায় লিখেছি যে, মেশিনের মাধ্যমে জবাই পদ্ধতিতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, প্রত্যেক মুরগীর উপর আল্লাহর নাম নেওয়া সম্ভব হয় না। অনেকে মেশিনের বোতাম চাপার সময় বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়। তারপর মেশিন দ্বারা সারাদিন হাজার হাজার মুরগী জবাই হতে থাকে। এ পদ্ধতিতে শরীয়ত প্রদত্ত শর্তসমূহ পুরো হওয়ার ব্যাপারে জটিল প্রশ্ন রয়েছে। তাই এ পর্যন্ত আমরা এটি জায়েয হওয়ার ফতোয়া দেইনি। কিন্তু এই কারখানার পদ্ধতি এই যে, মুরগী যখন মেশিনে ছুরির নিকট পৌঁছে, তখন এক ব্যক্তি মুরগীটিকে ছুরির দিকে ধাক্কা দেয়. এ ক্ষেত্রে তার জন্য প্রত্যেকটি মুরগী ধাক্কা দেওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া সম্ভব। যদিও এখনও কারখানায় এর উপর আমল হচ্ছে না, কিন্তু কারখানার লোকেরা এতে সম্মত রয়েছে যে, তারা এখানে মুসলমান কর্মচারী নিযুক্ত করবে, আর তারা মুরগীকে ছুরি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়বে। এ পদ্ধতিটি দেখার পর আমার মতও এদিকেই প্রবল হয় যে, এ পদ্ধতির উপর আমল করা হলে পশু হালাল হওয়ার সুযোগ হতে পারে।

জবাইখানা পরিদর্শনের পর আমরা ডাঃ সাব্বির সাহেব থেকে বিদায়

নিয়ে নেযামুল হক সাহেব এবং নাযিরুল হাসান সাহেবের সঙ্গে রওনা করি। মাওলানা আযীয সাহেবকে—যিনি ব্রিসবেন থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন—আজ দুপুরেই ব্রিসবেন ফিরে যেতে হবে। তাই সিডনী শহরটি এক চক্কর ঘুরে দেখার পর প্রথমে তাঁকে বিমানবন্দরে বিদায় জানাই। মাওলানা আসাদুল্লাহ তারেক সাহেবকেও সিডনীর কয়েকজন বন্ধুর নিকট থেকে যেতে হবে, তাই তিনিও এখান থেকে পৃথক হয়ে যান। এবার আমি সেন্ট্রাল কোষ্ট যাওয়ার উদ্দেশ্যে নেযামুল হক সাহেব ও নাযিরুল হাসান সাহেবের সঙ্গে রওয়ানা হই। পথে সিডনীর 'আবর্ন' (Auburn) মহল্লাটি পড়ে। এখানে তুরস্কের মুসলমানগণ একটি সুবিশাল ও সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন, যা ইস্তাম্বুলের সুলতান আহমদ মসজিদ (Blue Mosque) এর হুবহু অনুরূপ। একটি অমুসলিম দেশে এমন জমকালো মসজিদ দেখতে পেয়ে মন আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে। এ মসজিদের নিকটেই একটি বাড়ীতে নাযিরুল হাসান সাহেব পবিত্র কুরআন শিক্ষাদানের জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে মুসলমান ছেলেমেয়েরা পবিত্র কুরআনের হিফজ ও নাযেরা শিক্ষা করে থাকে। নাযিরুল হাসান সাহেব নিজে এবং তাঁর সম্মানিতা মা এখানে শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করছেন।

সেন্ট্রাল কোষ্টে

এখানে যোহর নামায আদায় করার পর আমরা সেন্ট্রাল কোষ্ট যাওয়ার উদ্দেশ্যে সিডনী থেকে বের হই। সেন্ট্রাল কোষ্ট সিডনীর উত্তরে একটি দীর্ঘ উপকূলীয় এলাকা, যা অনেকগুলো ছোট ছোট শহরের সমন্বয়ে গঠিত। তার মধ্যেকার একটি শহরের নাম ওয়েলং (Wyalong)। সেখানে এঁরা উভয়ে বাস করেন। সিডনী থেকে এ শহরের দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। কিন্তু হাইওয়ে এত পরিচ্ছন্ন যে, ঘন্টা/সোয়া ঘন্টায় এ দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। সম্পূর্ণ রাস্তাটি সবুজ শ্যামল উপত্যকাসমূহ, সবুজাবৃত পাহাড়সারি এবং সমুদ্র উপকূল দ্বারা পরিপূর্ণ। পথের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কারণে দূরত্বের অনুভূতিই হয়নি। মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে আমরা 'ওয়েলং' পৌঁছি। আমাদের অবস্থানস্থল থেকে প্রয় পাঁচ–সাত

কিলোমিটার দূরে একটি মসজিদ রয়েছে। এশার নামায আমরা সেই মসজিদে আদায় করি। এ মসজিদে আমার আগমন যদিও কোন বক্তৃতার উদ্দেশ্যে ছিল না, কিন্তু কিছু লোক আমার আগমনের ব্যাপারে অবগত হয়ে নিকটবর্তী বৃহত্তম শহর 'নিউক্যাসল' থেকে সফর করে এশার সময় এখানে এসে পৌঁছান। তাই এখানেও সংক্ষিপ্ত ভাষণ হয়।

এ মসজিদটি যিনি নির্মাণ করেছেন, তিনি ইন্দোনেশিয়ার একজন মুসলমান। এখানকার জনসমাজে তিনি রিযওয়ান সাহেব নামে পরিচিত। বর্তমানে তিনি অনেক ফ্যাক্টরীর মালিক এবং বড় অর্থশালী লোক। এশার নামাযের পর তিনি সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমার কক্ষে চলে আসেন। কথায় কথায় জনৈক ভদ্রলোক বললেন যে, রিযওয়ান সাহেব একজন নওমুসলিম। তাঁর আসল নাম 'রবার্ট ওয়াযু'। তখন রিযওয়ান সাহেব বললেন যে, প্রায় দশ বছর পূর্বে তিনি মুসলমান হয়েছেন। তারপর তিনি নিজের মুসলমান হওয়ার কাহিনী শোনালেন, যা বড় ঈমানোদ্দীপক। কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করা না হলে আমার ভ্রমণকাহিনী অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

তিনি বললেন যে, 'আমার দাদা যদিও মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তিনি একজন খৃষ্টান নারীকে বিবাহ করেন। সেই খৃষ্টান মহিলা (যিনি রিযওয়ান সাহেবের দাদী ছিলেন) তাঁর সমস্ত সন্তানকে খৃষ্টান বানান। তাদের মধ্যে আমার পিতাও ছিলেন। তাদের প্রভাবাধীনে আমিও খৃষ্টান ছিলাম। বাল্যকালে আমি মারাত্মক পর্যায়ের দুরন্ত ও ভবঘুরে ছিলাম। মাদক ও নেশাকর দ্রব্য থেকে আরম্ভ করে খুন ও ছিনতাই পর্যন্ত সব ধরনের অপকর্মে লিপ্ত ছিলাম। যদিও আমার সমমনা দুরন্ত বালকদের সঙ্গে থেকে থেকে এ সমস্ত অন্যায় অপকর্ম আমার দৈনন্দিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু কখনও কখনও আমার অন্তরের ঘুমন্ত মানুষটি জেগে উঠত, আর আমি উপলব্ধি করতাম যে, আমি মারাত্মক পাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছি। এমতসময়ে আমি কখনো কখনো চার্চে যেতাম এবং পাদ্রী সাহেবের নিকট আমার পাপের কথা বলতাম। পাদ্রী সাহেব আমার ক্ষমার জন্য দু'আ করে আমাকে নিশ্চিন্ত করতেন। অপরদিকে আমি যে প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করছিলাম, সেখানে আমার একজন মহিলা

শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলমান। তাঁর কথাগুলো আমার ভাল লাগত। তাই কখনো কখনো আমি তাঁর নিকট চলে যেতাম এবং তাঁর কাছেও আমার অবস্থা বর্ণনা করতাম। তখন তিনি আমাকে এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন যে, এ সমস্ত কাজের পরিণতি ইহ–পরকালেই খারাপ। আমার পিতা সেনাবাহিনীর উচ্চস্তরের একটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আমাকে একটি বি.এম.ডব্লিউ গাড়ী ক্রয় করে দিয়েছিলেন। গাড়ী চালানোর জন্য ড্রাইভার রাখা ছিল। সেও ছিল মুসলমান। এই মুসলমান ড্রাইভারটিও কখনো কখনো কথায় কথায় আমার সম্মুখে ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করত।

ইতোমধ্যে আমার মুসলমান দাদা অসুস্থ হন এবং আমি জানতে পারি যে, তিনি আমার জন্য একটি অছিয়তনামা সিলমোহরাঙ্কিত করে রেখেছেন এবং অছিয়ত করেছেন যে, তার মৃত্যুর পর যেন সে লেখাটি আমাকে দেওয়া হয়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, আমার দাদা ঐ লেখায় তার জায়গা–সম্পত্তি আমাকে দেওয়ার অছিয়ত করে গেছেন। কিছুদিন পর আমার দাদার মৃত্যু হলে অছিয়ত অনুযায়ী মোহরাঙ্কিত সেই খামটি আমাকে দেওয়া হয়। আমি খুব আনন্দিত ছিলাম যে, এই অছিয়তনামার ফলে আমি আরো সম্পদশালী হব। কিন্তু খামটি খুলে দেখে আমার বিস্ময় ও আক্ষেপের অন্ত রইল না। কারণ এটি ছিল একটি সাদা কাগজ, যার মধ্যে কোনরূপ অছিয়তের পরিবর্তে শুধুমাত্র এই কালিমাটি লেখা ছিল—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

কাগজটি দেখে আমার এতো মনোব্যথা হয় যে, আমি তা দ্বিখণ্ডিত করে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে সোজা আমার মুসলমান শিক্ষিকার নিকট চলে যাই। তাঁকে ঘটনাটি শুনাই। তিনি আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে আসেন, কাগজটি দেখেন এবং আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, তোমার দাদা তোমাকে জাগতিক ধনসম্পদের চেয়ে অনেক বড় নেয়ামত দানের অছিয়ত করেছেন যে, তুমি মুসলমান হও। কিন্তু আমি তাঁর কথা মানলাম না এবং পূর্ববৎ অপকর্মে লিপ্ত থাকলাম।”

তিনি বলেন যে, 'কিছুদিন পর পুনরায় একবার আমার মর্মপীড়া আমাকে চার্চে নিয়ে যায়। আমি পাদ্রী সাহেবকে বলি যে, আমি বারবার আপনার নিকট আসি আর আপনি আমাকে ক্ষমার সুসংবাদ শুনিয়ে ফিরে পাঠান, কিন্তু আমার জীবনে তো কোন পরিবর্তন আসে না। আমি পুনরায় নির্দ্বিধায় সে কাজগুলোই করতে আরম্ভ করি। পাদ্রী সাহেব পুনরায় সে কথাই বললেন যে, আমি যখন তোমার ক্ষমার জন্য দু'আ করছি, তখন তোমার আর কিসের চিন্তা? পাদ্রীর কথায় আমার ক্রোধের উদ্রেক হয়। আমি পকেট থেকে পিস্তল বের করে তার উপর এমনভাবে ফায়ার করি, যেন তিনি আহত হন কিন্তু বেঁচে থাকেন।'

তিনি বললেন যে, 'এ অঘটন ঘটিয়ে আমি বাইরে চলে এলে আমার মনের অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই এ ঘটনার পর আমার পালানোর কথা ছিল, কিন্তু আমি আমার অস্থিরতার কথা আমার মুসলমান ড্রাইভারকে বলি। ড্রাইভারটি এক পর্যায়ে আমাকে বলল—আমি আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে হয়ত আপনার অস্থিরতা লাঘব হবে। আমি সম্মতি প্রকাশ করলে সে আমাকে এমন একটি আসরে নিয়ে গেল, যেখানে অনেকগুলো লোক একত্রে বসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর যিকির করছিল। আমি যখন সে আসরে পৌঁছলাম, তখন আমার দেহের প্রত্যেকটি লোম দাঁড়িয়ে গেল। আমার উপর এক অবর্ণনীয় অবস্থা সওয়ার হল। যিকিরকারীদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আওয়াজ আমার শিরা–উপশিরায় বিস্তার লাভ করল। এই যিকির আমার উপর এমন এক যাদুময় প্রভাব ফেলল যে, আমার সমস্ত অস্তিত্ব কেঁপে উঠল। আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমি আপাদমস্তক বদলে গিয়েছি। আমি দ্রুত বাইরে চলে এসে আমার মুসলমান শিক্ষিকার নিকট চলে যাই। তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনাই। তখন তিনি উঠে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে সেই দ্বিখণ্ডিত কাগজটি তুলে আনেন, যা আমার দাদা আমার জন্য রেখে গিয়েছিলেন এবং আমি তা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আমার শিক্ষিকা ছিন্ন কাগজের টুকরোগুলোকে জোড়া দিয়ে আমাকে দেখালেন, তাতে লেখা ছিল—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

'আমার শিক্ষিকা বললেন যে, তোমার দাদার অছিয়তের উপর আমল করার মুহূর্ত চলে এসেছে। এখন তুমি এই কালিমার উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যাও। আমার জীবনে পূর্বেই ইনকিলাব এসেছিল। এই কালিমার সত্যতা আমার মর্মস্থলে প্রবিষ্ট হয়েছিল। আমি কোনরূপ বিলম্ব না করে ইসলাম কবুল করি।'

'ইসলাম কবুল করার পর আমি আমার খৃষ্টান পিতার নিকট যাই। তাকে বলি যে, আমি মুসলমান হয়েছি। আমার পিতা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যান। তিনি আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দেন। আমার বি.এম.ডব্লিউ গাড়িটি ফিরিয়ে নেন। তার সমস্ত সম্পদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু ইসলাম আমার অন্তরের ভালবাসার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। আমি কিছুদিন কয়েকজন মুসলমান দরবেশের নিকট অবস্থান করি। আমার অন্তরে এ কথা বসে যায় যে, আল্লাহর যিকিরই সবকিছু। তাই কিছুদিন পর আমি শহরের বাইরে একটি ঝুপড়ি বানাই। সেখানে দিনরাত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকিরে লিপ্ত থাকি। আমি এরূপ অনুভব করতাম যে, এই যিকির আমার পাপ–পঙ্কিল জীবনকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে। আমার সবকিছু এই যিকিরের বদৌলতেই হয়ে থাকে। আমি সে সময় নামায, রোযা এবং ইসলামের অন্যান্য বিধি–বিধান সম্পর্কেও অনবহিত ছিলাম। কেবলমাত্র যিকিরের উপরই আমি আত্মতুষ্ট ছিলাম। ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য অল্প কিছু কাজ করতাম। তারপর আমার ঝুপড়িতে এসে যিকিরে লিপ্ত হতাম। এ অবস্থায় কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন আমি স্বপ্নযোগে একজন বুযুর্গ লোককে দেখতে পেলাম। তিনি বললেন যে, আমি (শায়েখ) আবদুল কাদের জিলানী। যে পন্থা তুমি অবলম্বন করেছো তা সঠিক নয়। ইসলাম এ চায় না যে, মানুষ দুনিয়া ছেড়ে বনে–জঙ্গলে গিয়ে বসবে আর শুধু যিকির করতে থাকবে। ইসলামে যিকির ছাড়া অন্যান্য ফরয ইবাদতও রয়েছে, যার শীর্ষ তালিকায় হল নামায। ইসলামই এ বিধান দিয়েছে যে, মানুষ সুন্নাত মোতাবেক অন্যান্য মানুষের সঙ্গে জীবন–যাপন করবে, তাই এখন তুমি জঙ্গল ছেড়ে শহরে চলে যাও। ইসলামের সঠিক শিক্ষা লাভ করে সে অনুপাতে জীবন অতিবাহিত কর।'

উক্ত স্বপ্ন দেখার পর আমি পুনরায় শহরে চলে আসি। আমার মুসলমান শিক্ষিকার নিকট থেকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করি। ইতোমধ্যে আমার পিতার ক্রোধও প্রশমিত হয়ে যায়। আমি হলাম তার সন্তান। আমাকে হারিয়ে তিনি পেরেশান ছিলেন। আমি পুনরায় শহরে এলে তিনি আমার সঙ্গে পুনরায় সন্তানের ন্যায় আচরণ আরম্ভ করেন। যে সমস্ত সুযোগ–সুবিধা তিনি আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তার অনেকটা আমাকে ফিরিয়ে দেন। আমার মা অষ্ট্রেলিয়ায় থাকতেন। তিনিও ইন্দোনেশিয়ায় এসে আমার হারিয়ে যাওয়ার ফলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। আমি ফিরে আসার পর তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং আমাকে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি তাকে পরিস্কার ভাষায় বলে দেই যে, ইসলাম ছাড়ার কল্পনাও আমার জন্য অসম্ভব।'

'এ সময় আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা দেখা দেয়, যা আমার জীবনে অধিকতর গভীর প্রভাব ফেলে। আমার পিতার এক মুসলমান বন্ধু সেনাবাহিনীর জেনারেল ছিলেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমি দেখতাম যে, তিনি মসজিদ নির্মাণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সেবামূলক কাজে বেশী বেশী অংশগ্রহণ করতেন। তার মৃত্যু হলে আমি তার জানাযায় অংশগ্রহণ করি। তাকে কবরে নামানোর সময় হলে তার সঙ্গে আমার আন্তরিকতার কারণে আমিই তার কবরে নামি। তারপর তাকে কবরে মাটিচাপা দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ফেরার পথে সময় দেখার জন্য ঘড়ি দেখতে গিয়ে দেখি, হাতে ঘড়ি নেই। ঘড়িটি ছিল খুবই দামী। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে, ঘড়িটি কবরে পড়ে গিয়েছে। তখন আমি কারো সঙ্গে কথাটি আলোচনা করিনি। রাতের বেলা মরহুমের আত্মীয়দের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করি। ঘড়িটি যেহেতু খুব দামী ছিল, তাই তার আত্মীয়রা প্রস্তাব করেন যে, সকালবেলা কবর খুঁড়ে ঘড়িটি বের করা হোক। কিছুটা দ্বিধা–দ্বন্দ্বের পর আমিও রাজি হয়ে যাই। সকালে কবর খনন করা হলে সেখানে এমন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পাই, যা আজও আমার দৃষ্টির আড়াল হয় না। যেই জেনারেল সাহেবকে আমরা দাফন করে এসেছিলাম, তিনি কবরের মধ্যে উপুড় হয়ে বসেছিলেন।

তার মুখ ভয়ঙ্কর রূপে খোলা ছিল। তার কনুই থেকে রক্ত ঝরছিল। বুক ও হাতে পায়ে নীল নীল দাগ ছিল। আমরা গত দিনের বিকাল চারটার দিকে তাকে দাফন করেছিলাম, আর এখন ছিল পরদিনের সকাল ৮টা–৯টা। অর্থাৎ দাফন করার পর ১৬/১৭ ঘন্টার অধিক সময়ও অতিবাহিত হয়নি। এ অল্প সময়ে তার লাশের এ দুরাবস্থা দেখে আমাদের সবার উপর এমন ভীতি সওয়ার হয় যে, আজও সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য সবসময় চোখের সামনে ভাসে।"

"আমি এই ঘটনা আমার মহিলা শিক্ষিকার নিকট আলোচনা করি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, জেনারেল সাহেব তো সেবামূলক কাজে খুব বেশী অংশ নিতেন, এতদসত্ত্বেও তার সঙ্গে এমন আচরণ কেন করা হলো? আমার শিক্ষিকা বললেন, কোন ব্যক্তিই অন্য কোন ব্যক্তির ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারে না। তাছাড়া সেবামূলক কাজে যদি এখলাছ না থাকে বরং সুনাম ও যশ–খ্যাতির জন্য তা করা হয় তাহলে আল্লাহর নিকট তার কোনই মূল্য নেই।"

"এই ঘটনার পর সবসময় আমার নিজের কবরের কথা স্মরণ হতে থাকে। আমি অধিকতর গুরুত্ব সহকারে আমার অবস্থা সংশোধনের ফিকির আরম্ভ করি। অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, আমি আমার বিধর্মী পিতার সঙ্গে না থেকে নিজের জন্য অন্য কোন পন্থায় জীবিকার সন্ধান করব। তাই আমি অষ্ট্রেলিয়া চলে আসি। শুরুর দিকে আমি বড় দারিদ্র্যের মধ্যে সময় কাটাই। সড়কের ছোট ছোট কাজ করে পেট চালাই। ...... (যে সময় রিযওয়ান সাহেব এ ঘটনাটি শোনাচ্ছিলেন তখন তার সঙ্গে অপর একজন ইন্দোনেশীয় মুসলমান বসা ছিলেন। তার দিকে ইঙ্গিত করে রিযওয়ান সাহেব বললেন ঃ তার নিকট জিজ্ঞাসা করুন, ইনি আমার সেই সময়ের বন্ধু। ঐ ব্যক্তি ঘটনার সত্যায়ন করলেন যে, বাস্তবিকই তখন ইনি খুব দরিদ্র অবস্থায় অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করছিলেন)। কিন্তু আমি আমার অতীত জীবন থেকে দুটি শিক্ষা লাভ করেছিলাম। একটি হল আল্লাহ তাআলার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক রাখতে হবে এবং তাঁর বিধান মোতাবেক আমল করতে হবে। দ্বিতীয়, যে কাজই করা হবে এখলাছ ও মহব্বতের সঙ্গে করতে হবে। এই দুই মূলনীতির উপর অটল

থেকে আমি সর্ববিষয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে থাকি। বেশী বেশী নামায আদায় করতে থাকি। সবসময় আমি আমার সম্মুখে আমার কবর দেখতে পাই। অবশেষে আমার জন্য রিযিকের দরজা উন্মোচিত হতে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমি অনেকগুলো ফ্যাক্টরীর মালিক।”

রিযওয়ান সাহেব দীর্ঘ এ কাহিনী শেষ করলে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে যারা তাকে অনেকদিন ধরে চেনেন, তারা বললেন যে, ইতিপূর্বে তাদেরও তার এই পূর্ণ কাহিনী সম্পর্কে জানা ছিল না। আজ প্রথমবার তিনি এ ঘটনা সবিস্তারে শোনালেন। স্মর্তব্য যে, এই রিযওয়ান সাহেব ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্টের শ্বশুরকূলের আত্মীয় (তিনি তার সঙ্গের আত্মীয়তার সঠিক সম্পর্কের কথা বলেও ছিলেন। কিন্তু এখন তা আমার স্মরণ নেই)। এই আত্মীয়তার ভিত্তিতে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার অকৃত্রিম সম্পর্ক রয়েছে। তার এ কাহিনীর কিছু দিক বিস্ময়কর অবশ্যই, কিন্তু আমার নিকট তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে মিথ্যা বলার বা অতিরঞ্জনের কোন সম্ভাবনা চোখে পড়ে নাই।

সেন্ট্রাল কোষ্টের বন্ধুরা বললেন যে, রিযওয়ান সাহেব বর্তমানে মুসলমানদের সামাজিক কাজে খুব বেশী বেশী অংশগ্রহণ করেন। ওয়াইঅংয়ের সুদৃশ্য যেই মসজিদটিতে আমরা এশার নামায আদায় করি, তা তিনিই নির্মাণ করেছেন। তিনি মসজিদটির নাম 'মাসজিদুল কহ্‌হার' এজন্য রেখেছেন যে, তার সেই শিক্ষিকা—যাঁর উছিলায় তিনি ইসলামের দৌলত লাভ করেছেন—ইন্দোনেশিয়ার যে মাদরাসায় পড়াতেন, তার নাম ছিল 'আল–কহ্‌হার'। এছাড়া তিনি তার এক ফ্যাক্টরীর সঙ্গে একটি নামায ঘর বানিয়েছেন, সেখানেও পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয়, পরদিন সকালবেলা আমরা সেই নামায ঘরেই ফজর নামায আদায় করি।

নাস্তার পর আমার মেজবান আমাকে সেন্ট্রাল কোষ্টের একটি বিনোদন কেন্দ্র এনটারেন্স (Enterance)–এ নিয়ে যান। এটি মূলতঃ সেই জায়গা, যেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগর একটি উপসাগরের রূপ ধরে স্থলভাগের ভিতরে প্রবেশ করেছে। তারপর কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে তা অনেকগুলো নদীর রূপ ধারণ করেছে। নদীগুলোর তীরসমূহ

সবুজ-শ্যামল পাহাড় দ্বারা পরিপূর্ণ। অষ্ট্রেলিয়ার এই পূর্ব উপকূল নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী দ্বারা সমৃদ্ধশালী। যা দেখে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে—

تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ।'

কবি বলেন—

اس آئنہ خانے میں سبھی عکس ہیں تیرے
اس آئنہ خانے میں تو یکتا ہی رہیگا

'এ জগত হল একটি আয়না, যেখানে সবই তোমার প্রতিবিম্ব।
এখানে একমাত্র তুমিই চিরন্তন, তুমিই শাশ্বত।'

জাভেদ আকবর সাহেব এতদঅঞ্চলের একজন প্রভাবশালী হৃদয়বান মুসলমান। তিনি কিছুদিন ধরে এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার আইন ব্যবস্থায় মুসলমানদের 'পার্সোনাল ল" সরকারী পর্যায়ে স্বীকৃত ও গৃহীত হোক। এ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য তিনি একবার আমার নিকট করাচীতেও এসেছিলেন। তিনি এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যে সমস্ত পত্রালাপ করেছেন এবং যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তা দেখানোর জন্য তিনি আমাকে স্বগৃহে নিয়ে যান। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মতবিনিময় হয় এবং ভবিষ্যত কর্মসূচী তৈরী করা হয়। ইতোমধ্যে জুমুআর নামাযের সময় ঘনিয়ে আসে। আমরা ওয়েলংয়ের 'আল-কহ্হার' মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করি। সেখানে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণও হয়।

মাগরিবের পর আমরা ওয়েলং থেকে রওনা হই। সাড়ে সাতটার দিকে সিডনী পৌঁছি। এখানে মুহতারাম সরোয়ার সাহেব রাতের খাবারে কিছু লোক সমবেত করেন। সেখানে কিছু সময় কাটানোর পর আমরা এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা করি। যাওয়ার পথে তারা সিডনীর সুপ্রসিদ্ধ হারবার ব্রীজের নিকট দিয়ে গাড়ী নিয়ে যান। যদিও দিনের বেলায় আমরা এ এলাকা দেখেছিলাম, কিন্তু রাতের বেলা আলোকোজ্জ্বল আকাশচুম্বী ভবনসমূহ এবং সমুদ্রে পতিত তার প্রতিবিম্বের এই দৃশ্য

ভিন্নরকমের উপভোগ্য ছিল।

বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখি, সেখানে রিযওয়ান সাহেবও (যার দীর্ঘ কাহিনী আমি এইমাত্র বর্ণনা করেছি) আমাকে বিদায় জানানোর জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছেন। তিনি তার এক ব্যবসার পরিকল্পনা সম্পর্কেও পরামর্শ করেন। পরিশেষে সমস্ত বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে আমি সাড়ে নয়টায় অষ্ট্রেলিয়ার কোয়ান্টাস এয়ারলাইন্স–এ আরোহণ করি। বিমানটি প্রথমে মেলবোর্ন অবতরণ করে, তারপর রাত সাড়ে বারোটায় সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মা'আরিফুল্ল কুরআনের পঞ্চম খণ্ডের যে কাজ আমি সাথে এনেছিলাম তা আল্লাহর মেহেরবানীতে মেলবোর্ন থেকে রওনা হওয়া নাগাদ প্রায় সমাপ্ত হয়ে যায়। অল্প কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র বাকী থাকে। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। যখন চোখ খুলি, তখন সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছে। বিমান সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে অবতরণ করতে আরম্ভ করেছে। ভোর ছয়টায় বিমান সিঙ্গাপুরে অবতরণ করে। সিঙ্গাপুরে নিয়োজিত পাকিস্তানের হাইকমিশনার জনাব তাওহীদ সাহেব আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাওহীদ সাহেবের সঙ্গে আমার আগে থেকেই জানাশোনা রয়েছে। কিন্তু আমার জানা ছিল না যে, তিনি বর্তমানে সিঙ্গাপুরে রয়েছেন। সিডনীতে নিয়োজিত আমাদের কনস্যুলেট সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনের নিকট ফ্যাক্স পাঠালে তাওহীদ সাহেব আমার আসার বিষয়ে অবগত হন। তিনি তাঁর ভালবাসার কারণে নিজেই স্বাগত জানানোর জন্য চলে আসেন। আমার জন্য এখানে এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে একটি হোটেল বুক করা ছিল। কিন্তু তাওহীদ সাহেব এই কয়েক ঘন্টা তাঁর বাড়ীতেই কাটানোর জন্য পীড়াপীড়ি করেন। সুতরাং তিনি আমাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান। সিঙ্গাপুরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা অরচার্ড–এ বাড়ীটি অবস্থিত। এখানে আমি কিছু সময় বিশ্রাম করি এবং মা'আরিফুল কুরআনের অবশিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো শেষ করি। পরবর্তীতে তাওহীদ সাহেব সিঙ্গাপুরের অবস্থা বর্ণনা করেন। দেশটি ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করার পর কত দ্রুত উন্নতি করে এবং তার পিছনে কি কি কারণ রয়েছে, সেগুলো তিনি আলোচনা করেন। এই কথাবার্তার মধ্যে বিমান রওনা হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। তাওহীদ

সাহেবের সঙ্গে আমি পুনরায় বিমানবন্দরে চলে যাই। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের বিমান দুপুর আড়াইটায় করাচীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এখান থেকে করাচী পাঁচ ঘন্টার পথ। আমি এ সময়টিকে অষ্ট্রেলিয়ার এই ভ্রমণকাহিনী লেখার কাজে ব্যয় করি। অবশেষে পাকিস্তানের সময় অনুপাতে ৬ই মে শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় করাচী ফিরে আসি। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রতিক্রিয়া

অষ্ট্রেলিয়ায় অতিবাহিত এ নয়টি দিন যেন চোখের পলকেই শেষ হয়ে গেল। আমার মেজবানদের অনুযোগ ছিল এবং আমারও অনুভূত হয় যে, অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশ ভ্রমণের জন্য নয়দিন সময় নিতান্তই অপ্রতুল। তবুও এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়া ও সেখানকার মুসলমানদের অবস্থা দেখার ও জানার যথেষ্ট সুযোগ লাভ হয়। প্রত্যেক ভাষার ও প্রত্যেক চিন্তাধারার মুসলমানগণ আমার সঙ্গে যে ভালবাসা, উষ্ণতা ও অতিথিপরায়ণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান, তার চিত্র অন্তর থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। এঁরা প্রতিকূল পরিবেশে যেভাবে নিজেদের ইসলামী স্বকীয়তাকে সংরক্ষণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তা অতি প্রশংসার যোগ্য। ধর্মীয় জ্ঞান লাভের জন্য তাঁদের আগ্রহ ও একাগ্রতা এ থেকে ফুটে ওঠে যে, আমার প্রত্যেকটি ভাষণে মানুষ অনেক সময় শত শত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আসে। সর্বশ্রেণীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক এ সমস্ত ভাষণ অত্যাধিক আগ্রহ ও একাগ্রতার সঙ্গে শ্রবণ করেন এবং সেগুলো ক্যাসেটে রেকর্ড করা হয়। প্রত্যেক ভাষণের পর প্রশ্নের চিরকুটসমূহের স্তূপ বলছিল যে, মানুষ অতি সূক্ষ্মদৃষ্টির সঙ্গে এমন সব মাসআলা জিজ্ঞেস করছে, যেগুলো অনেক সময় আমাদের নিজেদের দেশেও শোনা যায় না। মহিলা ও তরুণ যুবকরাও এ আগ্রহে বয়ঃবৃদ্ধ পুরুষদের চেয়ে কোনক্রমেই পিছিয়ে ছিলেন না।

অষ্ট্রেলিয়ার মুসলমানগণ দেশব্যাপী বিশাল সংগঠন 'অষ্ট্রেলিয়ান ফেডারেশন অব ইসলামিক কাউন্সিলস' (AFIC)এর সঙ্গে জড়িত। এই সংগঠনের নেটওয়ার্ক মহল্লা পর্যায়ে বিস্তৃত। এ বিষয়টি আনন্দদায়ক যে, এ সংগঠনে ভাষা বা চিন্তাধারা ভিত্তিক কোন দলাদলি নেই। সমস্ত ভাষার এবং সমস্ত চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত মুসলমানগণ নিজেদের

সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত। এই সংগঠনের অধীনেই সারা দেশে অনেকগুলো শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেগুলো মোটের উপর কল্যাণকর সেবাদান করছে।

তাবলীগ জামাতের কাজ মাশাআল্লাহ প্রত্যেক দেশে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে দেখা যায়। আল্লাহর মেহেরবানীতে অষ্ট্রেলিয়াতেও তার কল্যাণকর প্রভাব পদে পদে উপলব্ধি হয়। তাবলীগ জামাত অষ্ট্রেলিয়াতেই শুধু নয়, বরং আশে পাশের ঐ সমস্ত ছোট ছোট দ্বীপেও ইসলামের তাবলীগ করছে, যেখানে কালিমাধারী কোন মুসলমান অতি কষ্টেই পাওয়া যায়। এছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় জাগৃতির যে লহর দৃষ্টিগোচর হয়, তা সৃষ্টি ও উন্নতি দানে তাবলীগ জামাতের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। মেলবোর্নের দারুল উলূম কলেজ—যা অষ্ট্রেলিয়ায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—মূলতঃ তাবলীগ জামাতের লোকদেরই প্রচেষ্টার ফল।

এ সমস্ত প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অষ্ট্রেলিয়ার মুসলমানগণও ঐ সমস্ত সমস্যার শিকার, যেগুলো অমুসলিম দেশসমূহে বিশেষ করে পশ্চিমা দেশসমূহে মুসলমানদের সম্মুখে রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার সমস্যা। শিশুরা দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে লেখাপড়া করলে সেখানকার পরিবেশ দ্বারা তারা প্রভাবান্বিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী বিষয়। মা-বাবাগণ তাদের বিশেষভাবে তত্ত্বাবধায়ন না করলে—যা কিনা খুবই কঠিন ব্যাপার—তাদের দ্বীন, ঈমান, আখলাক ও আমলের সংরক্ষণের কোন পথ নেই। সুতরাং যে সমস্ত মা-বাবা এদিক থেকে নিজেদের সন্তানদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেন নাই, তারা নিজেদের সন্তানদেরকে নিজেদের হাতছাড়া করেছেন। বিশেষ করে মেয়েদের বিষয়টি চরম জটিল। এমন ঘটনাও অনেক ঘটেছে যে, মেয়েরা বিধর্মীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চলে গেছে। আর মা-বাবাকে শুধু তাকিয়েই থাকতে হয়েছে, তারা কিছুই করতে পারেননি। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হল, মুসলমানদেরকে নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেরা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং সন্তানদেরকে শুরু থেকেই ইসলামী পরিবেশ যোগান দিতে হবে। আমি এ সমস্ত দেশে এই প্রয়োজনীয় বিষয়টির উপর সবসময়ই জোর দিয়ে আসছি এবং তাদের নিকট আরজ করে আসছি যে, এটি মুসলমানদের জীবন-মরণ সমস্যা।

আল্লাহর মেহেরবানীতে অনেক জায়গার লোকেরা এদিকে দৃষ্টি দিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ায় এ চেতনা আমি অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক উপলব্ধি করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত মুসলমানদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তবু এতে ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধি ঘটছে।

মুসলমানদের বড় একটি সমস্যা এও রয়েছে যে, এখন পর্যন্ত বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার বিষয়ে তাদের 'পার্সোনাল ল" ঐ সমস্ত দেশে স্বীকৃত ও গৃহীত নয়, যার ফলে অনেক পরিবার জটিল সমস্যার শিকার রয়েছে। আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক ধর্মের লোকদের পার্সোনাল ল' স্বীকৃত। যে সমস্ত ধর্মের লোক অতি অল্পসংখ্যক, তাদের বিবাহ, তালাক ইত্যাদির ফায়সালা তাদেরই ধর্মমতে হয়ে থাকে। কিন্তু এ সমস্ত দেশ, যারা কিনা নিজেরা নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষবাদী বলে থাকে এবং নিজেরা নিজেদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতার ধ্বজাধারী আখ্যা দিয়ে থাকে, তারা নিজেদের অধিবাসীদের এই বিশাল সংখ্যক লোককে এখনও পর্যন্ত তাদের বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকারের ফায়সালা তাদের নিজেদের ধর্মমতে সম্পাদন করার অধিকার দিতে প্রস্তুত নয়। আমি অষ্ট্রেলিয়ার কতিপয় প্রভাবশালী মুসলমানের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে, তারা যেন তাদের সরকারকে এই প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগী করে এবং যেভাবে মরিশাস ও ভারত প্রভৃতি দেশে মুসলমানদের পার্সোনাল ল' স্বীকৃত রয়েছে, তেমনিভাবে এখানেও যেন তা মঞ্জুর করা হয়। এ ব্যাপারে প্রাথমিক কিছু তৎপরতা ইতোমধ্যে আরম্ভও হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ, অষ্ট্রেলিয়ায় মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর ভাল আর সম্ভবতঃ এ কারণেই মানুষ সেখানে বসবাস করাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু আমি আমার এ প্রতিক্রিয়া সেখানেও প্রকাশ না করে পারিনি যে, নিজের দেশে হাজার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তা নিজের দেশ। অন্য দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে স্বর্ণ-চাঁদি নিয়ে খেলা করা যেতে পারে কিন্তু অন্তর ও অন্তঃস্থলের সেই প্রশান্তি লাভ করা অতি দুরূহ, যা পরিচিত ও নিজস্ব পরিবেশে অবস্থান করে লাভ করা যায়।

আয়ারল্যাণ্ড ও অক্সফোর্ডে এক সপ্তাহ

পাশ্চাত্যের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের বহু সংখ্যক মুসলমানের বসবাস রয়েছে। তারা ঐ সমস্ত দেশকেই নিজেদের দেশরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। ফলে সে সমস্ত স্থানে ইসলামী প্রতীক ও নিদর্শনসমূহের বহিঃপ্রকাশ ও প্রদর্শন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামী সভ্যতার নিদর্শনসমূহ এ সমস্ত দেশে এখন আর অপরিচিত নয়। এর সাথে সাথে সে সমস্ত দেশের সার্বিক ও ব্যাপক ধর্মহীনতার পরিবেশে মুসলমানগণ বহুবিধ সমস্যারও মুখোমুখি। যেগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁরা বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সে সমস্ত সমস্যার মধ্য থেকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—নিজেদের ও নিজেদের বংশধরদের ইসলামী স্বকীয়তার সংরক্ষণ। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুসংখ্যক মুসলমান এমনও রয়েছে, যারা পাশ্চাত্য দেশসমূহের কৃষ্টি-কালচারের সঙ্গে এমন মারাত্মকভাবে একাকার হয়ে গিয়েছে যে, তা তাদের ইসলামী পরিচয়কে হয়ত একেবারেই বিলুপ্ত করে দিয়েছে, কিংবা কেবল নামেমাত্র তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে থাকে এবং মনে করে থাকে। কিন্তু তাদের বাস্তব জীবনে না এর কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, না তাদের মধ্যে নিজেদের হৃত সেই পুঁজিকে পুনরায় অর্জন করার কোন চিন্তাই রয়েছে। অপরদিকে এমন মুসলমানের সংখ্যাও অনেক এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে তাঁদের সংখ্যা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যাঁরা নিজেদের ইসলামী পরিচয়কে কেবল টিকিয়েই রাখেনি, বরং তাকে ঐ সমস্ত দেশে গ্রহণযোগ্যও করে তুলেছে। তাঁদের চিন্তা হল, তারা অনৈসলামী এ সমস্ত দেশে বসবাস করেও নিজেদের জীবনকে শরীয়তের অনুশাসনের অনুগামী রাখবে। তাই তাঁদের কর্মধারায় হালাল ও হারাম এবং জায়েয ও নাজায়েযের তারতম্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বরং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, এমন অনেক লোক রয়েছেন, যারা

মুসলমান দেশে থাকতে নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে এত চিন্তাশীল ছিলেন না, যতটা পাশ্চাত্যে আসার পর হয়েছেন।

এদিকে সমগ্র বিশ্বে সাধারণভাবে এবং পশ্চিমা দেশসমূহে বিশেষভাবে জীবনের অবকাঠামো এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে, সেখানে প্রত্যহ নিত্য–নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তার মধ্যে এমন কিছু সমস্যাও রয়েছে, পূর্বে যেগুলোর কল্পনাও করা যেত না। সুতরাং প্রতিদিনের ডাকে খোদ আমার নিকটই এ জাতীয় অনেক প্রশ্ন এসে থাকে। পশ্চিমা দেশসমূহের মুসলমান অধিবাসীগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ সমস্ত সমস্যার শরয়ী সমাধান অবগত হতে চান। তার মধ্যে অনেক সমস্যার উত্তরদানের জন্য গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিবেচনার প্রয়োজন হয়। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন আলেম এ সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা–গবেষণা করে থাকেন। সহজাতভাবেই অনেক সময় এ সমস্ত আলেমদের গবেষণার ফলাফলে মতদ্বৈততাও হয়ে থাকে। আবার এমনও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোতে এ সমস্ত আলেমদের বিভিন্ন মতামত ও তাঁদের দলীল–প্রমাণের উপর বিচার–বিশ্লেষণ করে সম্মিলিত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ও তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান সমগ্র ইউরোপব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মূলতঃ আরবের আলেমগণ প্রতিষ্ঠা করেন। এর আরবী নাম 'আল মাজলিসুল ইউরবী লিল ইফতা ওয়াল বুহুস' এবং ইংরেজী নাম (European Council For Fatwa and Research)। এর প্রেসিডেন্ট আরব বিশ্বের খ্যাতনামা আলিম শায়েখ ইউসুফ আল কারযাভী। বিভিন্ন ইউরোপীয়ান দেশের ইসলামী কেন্দ্রসমূহের পরিচালক আলেমগণ এর সদস্য। জুলাইয়ের শুরুতে একটি সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য আমি লণ্ডনে অবস্থান করছিলাম। শায়েখ ইউসুফ আল কারযাভী (যিনি আমার তালিবে ইলমসুলভ দুঃসাহসিক আচরণ সত্ত্বেও বহুদিন ধরে আমার প্রতি কৃপাশীল) সে সময় ফরমায়েশ করেন যে, 'আল মাজলিসুল ইউরোবীর' যে সমাবেশ ২৮শে আগষ্ট থেকে পহেলা সেপ্টেম্বর ২০০০ ঈসায়ী পর্যন্ত আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, আমি যেন তাতে অংশগ্রহণ করি। যদিও এতে অংশগ্রহণের অর্থ হল আমাকে

দুই মাস সময়ে ইউরোপের তিনটি সফর করতে হবে। যা দারুল উলূম করাচীর সহীহ বুখারী শরীফের দরস দানের দায়িত্ব থাকায় আমার জন্য সহজ ছিল না। কিন্তু শায়েখ কারাযাভী এবং পরবর্তীতে কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল শায়েখ হুসাইন হালাওয়ার বারবার আবেদনের ফলে আমি এই সফর করতে সম্মত হই।

২৭শে আগষ্টের রাতে আমি করাচী থেকে রওয়ানা হই। দুবাইয়ের পথে বৃটিশ এয়ারওয়েজ–যোগে ভোর সাড়ে ছয়টায় লণ্ডন অবতরণ করি এবং সেখান থেকেই একটি আইরিশ বিমানে সকাল নয়টায় আয়ারল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিন পৌঁছি। ডাবলিনের ইসলামী সেন্টার এ কনফারেন্সের আতিথ্যের দায়িত্ব সম্পাদন করছিল। তার প্রতিনিধিগণ স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষা সমাপনকারী আলিম মাওলানা ইসমাঈল সাহেব––যিনি এখানকার অপর একটি ইসলামী সেন্টারের দায়িত্বশীল—সবান্ধবে তাশরীফ এনেছিলেন। এঁরা ছাড়া আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১৬ ঘন্টার দীর্ঘ সফরের পর সেদিন বিকাল পর্যন্ত বিশ্রামের জন্য বিরতি ছিল। যার বেশীর ভাগ সময় আমার অবস্থানস্থল ষ্টালো ঘ্রান হোটেলে অতিবাহিত হয়।

আসরের পর কনফারেন্সের উদ্বোধনী অধিবেশন ছিল। হোটেল থেকে আনুমানিক পনের মিনিটের দূরত্বে 'ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অব আয়ারল্যাণ্ডের' আলীশান ভবনটি অবস্থিত। যা সুপ্রশস্ত ও সুদৃশ্য মসজিদ, শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য মাদরাসা এবং প্রচার ও প্রকাশনার একটি কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত। এই সুবিস্তৃত ও সুপ্রশস্ত ভবনটি দুবাইয়ের শায়েখ রাশেদ আল মাখতুমের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। বর্তমানে আয়ারল্যাণ্ডের সর্ববৃহৎ ইসলামী কেন্দ্র এটিই। মিসরের শায়েখ হালাওয়া এ সেন্টারটি পরিচালনা করছেন। এই সেন্টারেই একটি কনফারেন্স হলও রয়েছে। সেখানে চারদিন পর্যন্ত উক্ত ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের সমাবেশ চলতে থাকে। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত শায়েখ ইউসুফ আল কারযাভীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে উদ্বোধনী ভাষণ ছাড়াও কনফারেন্সে আলোচিতব্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ

করা হয় এবং যারা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাঁদের লেখাগুলো বিতরণ করা হয়।

আয়ারল্যাণ্ডের একজন পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত মুসলমান ব্যবসায়ী জনাব গোলাম বারী সাহেব এখানকার হাতেগোনা কিছু বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের অন্যতম। তাঁর ব্যবসার ষ্টোরসমূহ সারাদেশে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুসলমান ভাইদের খেদমত এবং ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের সবিশেষ তাওফীক দান করেছেন। তিনি এখানে ইসলামিক সেন্টার ও শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠায় পরিপূর্ণ অংশ নিয়েছেন। আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য তিনি বিমানবন্দরে এসেছিলেন। তখনই তিনি বলেছিলেন যে, কোন এক প্রয়োজনে তাঁর পাকিস্তান যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি এখানে আসার কারণে একদিনের জন্য তিনি যাত্রা পিছিয়ে দেন। আজ রাতে তিনি স্বগৃহে নৈশভোজের ব্যবস্থা করতে চান। সুতরাং তাঁর বাসনা মত মাগরিবের পর আমাকে তাঁর বাড়ীতে যেতে হয়। সেখানে মাগরিবের নামায হচ্ছিল প্রায় সাড়ে আটটায়। মাগরিবের পর তাঁর বাড়ীতে পৌছতে পৌছতে নয়টা বেজে যায়। তিনি ডাবলিনের বিশেষ বিশেষ বন্ধুদেরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। একটি অমুসলিম দেশে কোন মুসলমানের এ ধরনের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে মন আনন্দে ভরে যায়। বিশেষ করে যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে জনসেবা ও দ্বীনের খেদমতেরও তাওফীক দান করেন।

পরদিন সকাল নয়টা থেকে কনফারেন্সের মূল অধিবেশন শুরু হয়। সুদানের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা শায়েখ আলী আল ইমাম প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। শায়েখ আলী আল ইমাম সুদানের জ্ঞান ও ধর্মীয় জগতে অতি উঁচু পদে অধিষ্ঠিত। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি পবিত্র কুরআনের কেরাত বিষয়ে তাঁর ডক্টরেটের প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি পবিত্র কুরআনের মৌলিকত্বের ব্যাপারে প্রাচ্যবিদদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সন্দেহ ও সংশয়সমূহের সবিস্তারে উত্তর দান করেছেন। তিনি আরবী ছাড়া ইংরেজী ও জার্মানী ভাষা সম্পর্কেও অবগত। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর। তিনি তাঁর গ্রন্থ দু'টি অত্যন্ত ভালবাসা সহকারে আমাকে উপহার দেন।

বিশেষতঃ প্রথমোক্ত গ্রন্থটি একটি বড় প্রয়োজন পুরা করেছে।

কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে ঐ সমস্ত প্রশ্ন আলোচনায় আসে, যেগুলো ইউরোপের বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে মুসলমানগণ কাউন্সিল বরাবর পাঠিয়েছে। যোহর নাগাদ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তৈরী করা হয়। দু'টোর সময় যোহর নামায ও দুপুরের আহারের জন্য বিরতি দেওয়া হয়। তারপর বিকাল ছয়টা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত আমার সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অবশিষ্ট প্রশ্নসমূহের উত্তর নিয়ে আলোচনা হয় এবং সেগুলোর উত্তর তৈরী করা হয়।

মাগরিবের নামায আমাকে অপর একটি ইসলামী সেন্টারে পড়তে হয়। সেন্টারটি ডাবলিন নগরীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। সেখানে একটি নামায ঘর (অস্থায়ী মসজিদ) এবং 'মাদরাসায়ে নূরুল ইসলাম' নামে শিশুদের শিক্ষাদানের একটি মাদরাসা রয়েছে। মাদরাসাটি আমাদের মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সাহেবের পরিচালনাধীনে কাজ করছে। মাওলানা ইসমাঈল সাহেব একজন তরুণ আলিম। তিনি বৃটেনে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় দরসে নিযামীর শিক্ষা সমাপন করেন। অবশেষে আমাদের দারুল উলূম করাচীতে দু'বছর ফতওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বৃটেন ফিরে আসেন। আয়ারল্যাণ্ডের মুসলমানগণ তাঁকে ডাবলিন ডেকে আনেন। প্রথমে তিনি শায়েখ হুসাইন হালাওয়ার সঙ্গে ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে কাজ করেন। তারপর গোলাম বারী সাহেবের নিমন্ত্রণে তিনি শহরের মধ্যভাগে এই ইসলামী সেন্টারটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি তা'লিম-তরবিয়ত ও ইসলাহী খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। মাদরাসায় পরিপূর্ণ শিক্ষাদানের দায়িত্ব সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাবলিনের প্রসিদ্ধ টরেন্টি কলেজে ইসলামী বিষয়সমূহের উপর সাপ্তাহিক লেকচারও দিয়ে থাকেন। তাতে মুসলিম ও অমুসলিম ছাত্রগণ অংশগ্রহণ করে থাকে। ডাবলিনের অন্যান্য জায়গায় এবং আয়ারল্যাণ্ডের অন্যান্য শহরেও তাঁর প্রোগ্রাম চলতে থাকে। তিনি আরবী ও ইংরেজী উভয় ভাষাতে সাবলীলভাবে ভাষণ দান করে থাকেন। এ অবস্থা দেখে বড়ই আনন্দিত হই যে, তিনি এই তরুণ বয়সেই প্রতিকূল পরিবেশে অবিচলতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর

পথ–নির্দেশে এখানকার মুসলমানগণ উপকৃত হচ্ছেন। যতজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে, তাদের সবাইকে তাঁর প্রশংসায় মুখরিত এবং তাঁর খিদমতে বাধিত দেখতে পেয়েছি।

মাগরিব নামাযের পর তাঁরই 'মাদরাসায়ে নূরুল ইসলামে' উর্দূ ও ইংরেজীতে আমার ভাষণ হয়। শ্রোতাদের মধ্যে পুরুষরা ছাড়া নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডে ভারত বা পাকিস্তানের আলিমদের আগমন অনেকটা না হওয়ারই সমান। তাই আমার মত তালিবে ইলমের কথা তারা সবাই গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করেন এবং আমার সঙ্গে অসাধারণ ভালবাসার আচরণ করেন। পূর্ব থেকে ঘোষণা না হওয়ায় সমাবেশ তেমন বড় ছিল না, তবে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন, দ্বীনের মুহাব্বত ও আজমত নিয়েই এসেছিলেন। তাই আল্লাহর মেহেরবানীতে মোটের উপর এ সমাবেশ উপকারী হয়।

কনফারেন্স পরের দিনও মাগরিব পর্যন্ত চালু থাকে। মাগরিব নামাযের জন্য আমাকে ডাবলিনের প্রাচীনতম মসজিদের সুদানী ইমাম সায়্যিদ ইয়াহইয়া সাহেব দাওয়াত করেছিলেন। সুতরাং মাগরিব নামায সেখানে আদায় করি। এটি ডাবলিনের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক মসজিদ, যা একটি চার্চের ভবন ক্রয় করে এখানকার মুসলমানগণ নির্মাণ করেছিলেন। ইসলামিক কাল্‌চারাল সেন্টার নির্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ডাবলিনের সর্ববৃহৎ ইসলামী সেন্টার এ মসজিদটিই ছিল। এটিও বেশ বড় মসজিদ। মসজিদের সঙ্গে মাদরাসা এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন অব আয়ারল্যাণ্ড নামে প্রচার ও প্রকাশনার একটি ইসলামী সেন্টারও রয়েছে। এ মসজিদের আশেপাশে বেশীর ভাগ আরবদের বসবাস বিধায় এখানকার নামাযীদেরও বেশীর ভাগ আরব। সুতরাং এখানে আমার ভাষণ হয় আরবীতে। তারপর মসজিদেরই একটি অংশে আমার বন্ধু ডঃ নাভিদ সাহেব নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন। ডঃ নাভিদ সাহেব পুরো সফরটিতে আমার সঙ্গে বড় ভালবাসার আচরণ করেন। তিনি নিজের গাড়ীতে করে আমাকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর মনোবাসনা ছিল, তাঁর নিজের বাড়ীতে নৈশভোজের ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু তাঁর বাড়ী ছিল বহু দূরে। তাই তিনি আমার ব্যস্ততা ও সুবিধার দিকে নজর দিয়ে মসজিদ

সংলগ্নেই নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন। তাতে অনেক বন্ধুই শরীক ছিলেন। নৈশভোজের পর ডঃ নাভিদ সাহেব ডাবলিন শহরটি একবার দ্রুত ঘুরিয়ে দেখানোর পর আমাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দেন।

বৃহস্পতিবার ছিল কনফারেন্সের শেষ দিন। ডাবলিন ভ্রমণে আমার একটি আকর্ষণ এ কারণেও ছিল যে, এখানকার চেষ্টার বিট্টি (Chester Beatty) প্রাচীন আরবী গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপিসমূহের বিশ্ববিখ্যাত একটি লাইব্রেরী। আমার তা ঘুরে দেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গত তিনদিনের বিরামহীন ব্যস্ততায় এ বাসনা পূরণের সুযোগ পাইনি। আজ সকালে কনফারেন্সের ড্রাফটিং কমিটির মিটিং ছিল। যা এই হোটেলেই অনুষ্ঠিত হয়। আমি সকাল দশটার মধ্যে এই মিটিং থেকে অবসর হই। কনফারেন্সের পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ এত বেশী জরুরী ছিল না। সুতরাং আমি মাওলানা ইসমাঈল সাহেব এবং ডাক্তার শাহজাদ সাহেবের সঙ্গে পূর্বেই সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, তাঁরা দশটার সময় এসে আমাকে লাইব্রেরীতে নিয়ে যাবেন। তাঁরা ওয়াদা মাফিক চলে আসেন। আয়ারল্যাণ্ডে মাশাআল্লাহ পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত বহু সংখ্যক ডাক্তার রয়েছেন। ডাক্তার শাহজাদ সাহেবও একজন দক্ষ ডাক্তার। তিনি আয়ারল্যাণ্ডের সেনাবাহিনীতে ডাক্তার পদে দায়িত্ব পালন করছেন। সাথে সাথে তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক তৎপরতাসমূহেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে লাইব্রেরীতে নিয়ে যাবেন বলে প্রস্তাব করেছিলেন।

ডাবলিন থেকে প্রায় তিন ঘন্টার দূরত্বে গালওয়ে নামে আয়ারল্যাণ্ডের অপর একটি শহর রয়েছে। সেখানেও একটি মসজিদ, মাদরাসা এবং ইসলামী সেন্টার রয়েছে। এর পরিচালনার দায়িত্ব মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেবের হাতে। মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেবও আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তাঁর মাতৃভূমি বৃটেন। কিন্তু তিনি উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য দারুল উলূম করাচীতে আসেন। দাওরায়ে হাদীস শেষে আমাদের এখান থেকে শিক্ষা সমাপন করেন। আমাদের এখানকার দাওরায়ে হাদীসের জামাতে সাধারণতঃ আড়াইশ'র মত ছাত্র থাকে। তাই ক্লাসের

মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্রের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যে সমস্ত ছাত্র পিছনের সারিতে বসে এবং খুব বেশী প্রশ্নোত্তর করে না, তাদের কথা মনে রাখা কঠিন হয়ে থাকে। মাওলানা ইলিয়াস সাহেবও এমনই নীরব প্রকৃতির তালিবে ইলম ছিলেন।

তিনি যখন আমাদের মাদরাসায় শিক্ষারত ছিলেন তখন তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়নি। এখানে আসার পর তাঁর হিরন্ময় যোগ্যতার পরিস্ফুটন ঘটে। মাশাআল্লাহ, তিনি গালওয়েতে ধর্মীয় পথনির্দেশ দানের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এখানকার শিশুদের জন্য অনেকগুলো পুস্তকও লিখেছেন। অধিক অধ্যয়নের রুচির অধিকারী তিনি। ডাবলিনে আমার অবস্থানের সময় তিনি সেখানেই অবস্থান করেন এবং প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে তাঁর নীরব প্রকৃতি নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, চেষ্টার বিট্টি ছাড়া এখানে আরো একটি দর্শনীয় লাইব্রেরী রয়েছে। চেষ্টার বিট্টির খ্যাতির কারণে মানুষ সেখানে খুব বেশী গিয়ে থাকে। কিন্তু এ লাইব্রেরীটি সম্পর্কে মানুষ খুব বেশী জানে না বিধায় সেখানে পর্যটকদের আগমন কম হয়ে থাকে। মাওলানা ইলিয়াস সাহেব প্রথমে সেই লাইব্রেরীটি দেখার পরামর্শ দেন।

মারিশ লাইব্রেরী

এই লাইব্রেরীর নাম 'আর্চ বিশপ মারিশ লাইব্রেরী'। লাইব্রেরী'টি একটি পুরাতন চার্চের ভবনে অবস্থিত। এটি ডাবলিনের আর্চ বিশপ মারিশ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে, এটি ডাবলিনের সর্বপ্রথম পাবলিক লাইব্রেরী। আর্চ বিশপ মারিশ তার আয়ের বড় একটি অংশ এ সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহে ব্যয় করেন। আয়ারল্যাণ্ড সরকার এটিকে তার মূল আকৃতিতে সংরক্ষণ করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। সুতরাং ভবন ও তার সমস্ত কক্ষও প্রাচীন ধাঁচের। আলমারীসমূহও পুরাতন কাঠের। গ্রন্থসমূহকেও যদ্দুর সম্ভব পুরাতন ঢালে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে। লাইব্রেরীর হলকক্ষে প্রবেশ করার পর মানুষ অনুভব করে যে, সে চারশ' বছর পূর্বের যুগে প্রবেশ করেছে। লাইব্রেরীর একটি মজার অংশ ঐটি, যাকে Study cage অর্থাৎ 'অধ্যয়নের পিঞ্জিরা' নাম দেওয়া

হয়েছে। যে সমস্ত লোক লাইব্রেরীতে অধ্যয়ন করতে আসত, তাদেরকে এই অংশে একটি পিঞ্জিরা সদৃশ দরজার পিছনে আলমারীর সম্মুখে বসিয়ে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হত। যেন তারা অধ্যয়নান্তে বই চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে। এতে বোঝা যায় যে, সে যুগে বই চুরির ব্যাপক প্রচলন ছিল।

লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা আর্চ বিশপ মারিশের একটি লেখা ফ্রেমে বাঁধা রয়েছে। তাতে তিনি নিজের এক ভাতিজীর ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন যে, 'সে আল্লাহর ভয়ের পরোয়া না করে জনৈক ব্যক্তির সাথে পালিয়ে গেছে এবং যাওয়ার কালে লাইব্রেরীর কিছু বইও চুরি করে সঙ্গে নিয়ে গেছে।'

এই গ্রন্থাগারে বর্তমানে ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের অনেক বড় দুর্লভ সংগ্রহ রয়েছে। তার মধ্যে ল্যাটিন, ইংরেজী, আরবী, গ্রীক, সুরিয়ানী, ইবরানী, আরামায়ী, কাসদি, চালডাইক (Chaldaic), হাবসী, ফারসী ও তুর্কী ভাষার গ্রন্থসমূহ অন্তর্ভুক্ত। আর্চ বিশপ মারিশ প্রথম দিকে এখানে প্রাচ্যের গ্রন্থসমূহের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহেরও বিরাট বড় সংগ্রহ সঞ্চয় করেছিলেন। এজন্য তিনি হল্যাণ্ডের ল্যাডিন নগরী থেকে হস্তলিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি আনিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেখেন যে, ডাবলিনে এ সমস্ত পাণ্ডুলিপির যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, তাই তিনি ঐ সমস্ত পাণ্ডুলিপি অক্সফোর্ডের বোডলিয়ান (Bodleian) লাইব্রেরীকে প্রদান করেন।

লাইব্রেরীর ইনচার্জ–কর্মকর্তা খুব আগ্রহ সহকারে আমাকে লাইব্রেরী'টি পরিদর্শন করান। মাওলানা ইলিয়াস সাহেব তাঁকে আমার আগমন সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত করেছিলেন। তাই তিনি কয়েকটি দুর্লভ গ্রন্থ আমাকে দেখানোর জন্য বের করে পৃথক করে রেখেছিলেন। তার মধ্যে কুরআন শরীফের একটি কপি ছিল, যা ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর একজন প্রাচ্যবিদ আব্রাহাম হিঙ্কেলম্যান (Hinckelman) হামবুর্গ থেকে প্রকাশ করেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশসমূহে মনে করা হত যে, এটি পবিত্র কুরআনের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ। কিন্তু পরবর্তীতে ইতালীর ভেনিস শহরে মুদ্রিত একটি কপি আবিষ্কৃত হয়, যা ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ছাপা

হয়েছিল। তারপর থেকে এটিকেই পবিত্র কুরআনের প্রথম মুদ্রিত কপি মনে করা হতে থাকে। পবিত্র কুরআনের এই কপির সঙ্গে ল্যাটিন ভাষায় তার সংক্ষিপ্ত তরজমাও রয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কিত অপর একটি মজার কিতাব উত্তর হল্যাণ্ডের এক প্রাচ্যবিদ এড্রিয়ান রিল্যাণ্ড (Adrlan Reland)এর লেখা। তার ল্যাটিন নাম Mohammedica Libriduo De Religione। রিল্যাণ্ড মূলতঃ দর্শনের ছাত্র ছিলেন। তিনি এ গ্রন্থে ল্যাটিন ও আরবী ভাষায় ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। ইসলামের আকীদা ও শিক্ষা সম্পর্কে যে সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তিনি সেগুলোরও উত্তর দিয়েছেন।

ইংরেজী ভাষায় পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অনুবাদক জর্জ সেল (George Sale)এর সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদের সর্বপ্রথম সংস্করণও এখানে রয়েছে। যা ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তার প্রচ্ছদে সে যুগের মক্কার হার্‌ম এলাকার একটি ছবিও ছাপানো রয়েছে। এর মাধ্যমে সে যুগের পবিত্র মক্কার একটি ধারণা মানুষ করতে পারে।

আরবী ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আজরুমিয়া'র একটি কপিও আমরা দেখি, যা ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের প্রাচ্যবিদ এরপেনিয়াস (Erpenius) ল্যাডিন থেকে প্রকাশ করেছিলেন। ইবনে সিনার আইন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ ইদরিসীর ভূগোল বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নুযহাতুল মাসালিকে'র ল্যাটিন অনুবাদও লাইব্রেরীতে রয়েছে, যা ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে ছেপেছিল।

এটি যেহেতু একজন খৃষ্টান আর্চ বিশপের লাইব্রেরী, তাই আমার ধারণা ছিল যে, এখানে বাইবেলের প্রাচীন কপি এবং তার ঐ সমস্ত পুরাতন ভাষ্য গ্রন্থসমূহও পাওয়া যাবে, যেগুলোকে আমি ঐ সময় থেকে তালাশ করে আসছি, যখন আমি হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানভী (রহঃ)এর 'ইযহারুল হক' গ্রন্থের কাজ করছিলাম। বাইবেলের পুরাতন কপি তো অনেক পেলাম, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সম্পূর্ণ বাইবেলের পরিপূর্ণ ভাষ্যগ্রন্থ একটিও পেলাম না। লাইব্রেরীর গ্রন্থতালিকা কম্পিউটারাইজড, কিন্তু কম্পিউটারের সাহায্যে কোন ভাষ্যগ্রন্থ না আমি পেলাম, না লাইব্রেরীর কর্মকর্তা। পরিশেষে আমি অনুরোধ করি যে,

কম্পিউটারে গ্রন্থতালিকা উঠানোর পূর্বে লাইব্রেরীর যে পুরাতন রেজিষ্টার রয়েছে, তাতে খুঁজে দেখা যাক। সংশ্লিষ্ট মহিলা আমার এ অনুরোধ রক্ষা করেন এবং আমার সম্মুখে পুরাতন রেজিষ্টার এনে দেন। ঐ রেজিষ্টারসমূহে আর না হলেও বাইবেলের বিভিন্ন অংশের ভাষ্যগ্রন্থসমূহ পাওয়া গেল। এগুলো পাওয়ার পর সে মহিলা বললেন, 'কম্পিউটার যত উন্নতিই করুক না কেন, মানুষের শূন্যতা পুরো করতে পারে না।' কিন্তু আমি যে সমস্ত গ্রন্থ তালাশ করছিলাম সেগুলো এখানেও পেলাম না। মহিলা অঙ্গিকার করলেন, তিনি খোঁজ চালিয়ে যাবেন। পাওয়া গেলে আমাকে ই-মেইলের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

যে সময় আমি 'ইযহারুল হক' গ্রন্থের উপর কাজ করছিলাম এবং খৃষ্টবাদ আমার অধ্যয়নের বিশেষ বিষয়বস্তু ছিল, সে সময় যদি আমি এরকম লাইব্রেরী পেতাম এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার উপকরণ লাভ করতাম তাহলে আমি কয়েক মাস এতে কাটিয়ে দিতাম। 'ইযহারুল হক' গ্রন্থের উপর আমি এমন নিঃস্ব অবস্থায় কাজ করি যে, পাকিস্তানে প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যও আমাকে প্রতিদিন বিকেল বেলা দারুল উলূম কৌরঙ্গী থেকে বাসে ঝুলে শহরের লাইব্রেরীসমূহে যেতে হত। এখন এই লাইব্রেরী আমার সম্মুখে রয়েছে, যেখান থেকে নিশ্চয়ই খৃষ্টবাদের উপর অনেক কাজ করা সম্ভব এবং আলহামদুলিল্লাহ এখন এমন উপকরণও রয়েছে যে, আমি যতদিন ইচ্ছা এখানে অবস্থান করতে পারি, কিন্তু আমার সময়গুলো বিভিন্ন দায়িত্বে এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, এখন আর কিছু করা সম্ভব নয়। আর আজ তো আমার হাতে খুবই সীমিত সময় রয়েছে। তাই লাইব্রেরী থেকে উপকৃত হওয়ার এছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না যে, এখানকার ইনচার্জ তার ই-মেইল এড্রেস আমাকে দিয়ে দেন, যেন প্রয়োজনের সময় তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। তবে এ কথাটি এত বিস্তারিত এ জন্য লিখলাম যে, খৃষ্টবাদ-বিষয়ে যারা কাজ করছেন, তারা এ লাইব্রেরীর প্রাচীন সংগ্রহ দ্বারা উপকৃত হতে পারলে যেন অবশ্যই করেন।

চেষ্টার বিট্টি লাইব্রেরী

মারিশ লাইব্রেরী ঘুরে দেখার পর আমরা চেষ্টার বিট্টি লাইব্রেরীতে যাই। এটি শহরের মধ্যভাগে সুউচ্চ একটি ভবনে অবস্থিত। এ লাইব্রেরীটিরও তার প্রতিষ্ঠাতার নামে নামকরণ করা হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতার নাম স্যার আলফ্রেড চেষ্টার বিট্টি (Sir Alfred Chester Beatty)। তার প্রতিষ্ঠাকৃত এ লাইব্রেরীটি শুধুমাত্র বিশ্বের সমস্ত ধর্মের গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সমন্বিত। তাতে ইসলাম, খৃষ্টবাদ, ইহুদীবাদ, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধমত, জৈন, শিখ, তাও, শান্টু, সব ধর্মের গ্রন্থ সংগ্রহ রয়েছে। এ সমস্ত গ্রন্থ আরবী, ল্যাটিন, ইংরেজী, ফারসী, তুর্কী, উর্দূ, হিন্দী ইত্যাদি কত ভাষায় যে লেখা, তার ইয়ত্তা নেই। হস্তলিখিত আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহেরও এখানে বিরাট এক সংগ্রহ রয়েছে। যার শুধুমাত্র ক্যাটালগই আট ভলিউমের। এ লাইব্রেরীতে আমার আসার উদ্দেশ্য ছিল, এখানে কতিপয় প্রাচীন আরবী গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহ তার মূল রূপে দেখার সুযোগ পাব। কিন্তু এখানে এসে জানতে পারলাম যে, এ সমস্ত পাণ্ডুলিপি পৃথকভাবে বের করা থাকে না। বরং এর জন্য আগে থেকে তারিখ, সময় ও কোন্ গ্রন্থ তা নির্ধারণ করতে হয়। তাছাড়া সেগুলো পড়ে দেখার কোন সুযোগও নেই। তবে সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য তারা এমন একটি শোরুম বানিয়েছে, যেখানে হস্তলিপির বিভিন্ন নমুনা পরিদর্শন করানো হয়। সুতরাং এখানে একটি শোকেসের মধ্যে দশম খৃষ্ট শতাব্দীর (অর্থাৎ প্রায় তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর) লেখা পবিত্র কুরআনে কারীমের একটি কপি রয়েছে, যা স্পেনে লেখা হয়েছিল, এখনও তার ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি ও লিপির সৌন্দর্যের মধ্যে কোন তফাত সৃষ্টি হয়নি। পবিত্র কুরআনের এ কপিটি ছাড়া এই শোরুমে আমার আকর্ষণের মতো অন্য কিছু ছিল না। তবে লাইব্রেরীর আরবী গ্রন্থসমূহের ৮ ভলিউমের ক্যাটালগটি এখানে তুলনামূলক কম মূল্যে পাওয়া যায়। তাই আমি তা গনীমত মনে করে ক্রয় করি। সেই ক্যাটালগে সমস্ত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির পরিচিতি রয়েছে এবং তার পৃষ্ঠাসমূহের ছবিও দেওয়া রয়েছে। এর অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকারদের স্বহস্তে লিখিত।

ডাবলিনের এই দুই গ্রন্থাগারের ভ্রমণ বড় মনোমুগ্ধকর হয়। আমাদের

মহান পূর্বপুরুষদের গ্রন্থসমূহের এগুলোই সেই বিশাল ভাণ্ডার, যা ইউরোপের বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। যেগুলো দেখে প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল মরহুম বলেছিলেন—

وہ حکمت کے خزانے' وہ کتابیں اپنے آبا کی
جو دیکھیں جا کے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ

'জ্ঞান–বিজ্ঞানের সেই ভাণ্ডার এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই অমর গ্রন্থসমূহ, ইউরোপে গিয়ে যা দেখে আমার হৃদয় চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে যায়।'

এ প্রশ্নটি সাধারণ্যের মস্তিষ্কে অনেক সময়ই জেগে থাকে যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ ইউরোপে কী করে পৌঁছল এবং ঐ সমস্ত অমুসলিম জাতি সেগুলোর এত অধিক সংরক্ষণ কেন করল? এ প্রশ্নের উত্তর যদিও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। সংক্ষিপ্ত এ ভ্রমণকাহিনী যা বর্ণনা করার পরিসর রাখে না, কিন্তু এর উত্তরের মধ্যে যেহেতু আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তাই সংক্ষেপে সেদিকে ইঙ্গিত করা যথার্থ হবে।

ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্বে সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান–বিজ্ঞানের সর্ববৃহৎ কেন্দ্রসমূহ ছিল আলমে ইসলামে তথা মুসলিম বিশ্বে। সে যুগে অমুসলিম ইউরোপ জ্ঞান–বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় সার্বিকভাবে খুব বেশী পরিচিত ছিল না। এ ব্যাপারে তারা মুসলিম বিশ্বের মুখাপেক্ষী ছিল। ইউরোপের শাসকগণ রাজপুত্রদেরকে উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য স্পেনে পাঠাত। কিন্তু যখন মুসলমানদের নিজেদের বদআমলের কারণে তাদের রাজনৈতিক ধস নামে, তখন আলমে ইসলামের জ্ঞান–বিজ্ঞানের ভাণ্ডার, ইউরোপিয়ান বিজয়ীদের হাতে যেতে আরম্ভ করে। স্পেনের পতনের পর সেখানকার ক্ষমতাশালী খৃষ্টান সরকার এত অধিক পরিমাণ সাম্প্রদায়িক এবং জ্ঞান–বিজ্ঞানের দুশমন ছিল যে, সে মুসলমানদের গ্রন্থাগারসমূহ আগুনে ভস্মিভূত করে দেয়। জ্ঞান–বিজ্ঞানের কত ভাণ্ডার যে গ্রানাডার চৌরাস্তায় মাসকে মাস ভস্মিভূত হতে থাকে, তার গোনা জোখা নেই। তবে আমাদের মহান পূর্বপুরুষগণ জ্ঞান–বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় এত অধিক পরিমাণ গ্রন্থভাণ্ডার তৈরী করেছিলেন যে, এভাবে জ্বালানো সত্ত্বেও

সেগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হতে পারেনি। জ্ঞানবন্ধু কিছু মানুষ এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও মুসলমানদের গ্রন্থসমূহ গোপন করে লুকিয়ে রাখেন, যখন এমন জ্ঞান–বন্ধুত্ব খৃষ্টানদের হাতে নিজেকে নিজে মৃত্যুর দাওয়াত দেওয়ার সমার্থক ছিল। তারপর ক্রমান্বয়ে যখন ইউরোপে বহুমুখী ধর্মচর্চা আরম্ভ হয়, তখন এ সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। ইউরোপের পুনর্জাগরণের (Renaissance) কারণসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ এও ছিল যে, যে সমস্ত লোক খৃষ্টবাদের বন্ধন ছিন্ন করে, তারা মুসলমানদের এ মহান জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। এই মাত্র আমি মারিশ লাইব্রেরীর কথা উল্লেখ করেছি, তার মুদ্রিত ক্যাটালগে ইবনে সিনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছে—

"ইবনে সিনা চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের উপর শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তদীয় রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'কানূনুত্ তিব্বি' গ্রন্থকে ইউরোপের ইউনিভার্সিটিসমূহে 'জ্ঞানভাণ্ডার' আখ্যা দেওয়া হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত পাঠ্যগ্রন্থরূপে তার পাঠদান করা হতে থাকে।"

(The Wisdom of the East : Marsh's Oriental Books P. 17)

তাই মুসলিম উম্মাহর মহান পূর্বসূরীদের এ সমস্ত গ্রন্থ যেহেতু ইউরোপের জন্য মহান কৃপাশীলের মর্যাদা রাখে তাই পুনর্জাগরণের পর ইউরোপ সেগুলো সংরক্ষণ করার প্রতি যত্নবান হয়। ইউরোপিয়ান জাতি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের পর তরবারীর জোরে এ সমস্ত গ্রন্থের বিরাটাংশ সেখান থেকে লাভ করে। আর ইউরোপের গ্রন্থাগারসমূহ ভালভাবে লক্ষ্য করলে এ বাস্তবতাও পরিলক্ষিত হয় যে, এর বিরাট একটি অংশ তারা মুসলমানদের থেকে ক্রয়ও করেছে। এটি ছিল মুসলমানদের একাডেমিক অধঃপতন ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার যুগ। তাই অনেক দুর্লভ গ্রন্থসংগ্রহ অমুসলিমদের হাতে বিক্রি করতে লোকদের শংকা বা সংকোচ হয়নি। শুরুর দিকে এ সমস্ত গ্রন্থের প্রতি ইউরোপবাসীর মনোযোগের আসল কারণ ছিল তাদের পুনর্জাগরণে এ সমস্ত গ্রন্থের বিরাট বড় ভূমিকা ছিল। অজ্ঞতা ও জ্ঞানের শত্রুতার

অন্ধকার যুগ বিলুপ্ত হওয়ার পর ইউরোপে জ্ঞানপ্রেমের এমন ঝোঁক জন্মায় যে, তারা সব ধরনের জ্ঞান–বিজ্ঞান ও শিল্পকলার মূল্যায়নের এবং তা সংরক্ষণ করার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টাই চালায়। জ্ঞান–বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা ও শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তির অধিকারী (Specialized) স্কলারস তৈরী করে। এমনকি বাস্তব ক্ষেত্রের সঙ্গে ঐ শাস্ত্রের কোন সম্পর্ক না থাকলেও। মুসলমানদের ধর্মীয় জ্ঞান–বিজ্ঞান ও শাস্ত্রসমূহের সংরক্ষণের পিছনে একটি কারণ তো ছিল এই, দ্বিতীয়তঃ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে জোরদার করার যারা ইচ্ছা পোষণ করত, তাদেরকে শক্তিশালী করার জন্য সে সমস্ত প্রাচ্যবিদরাই জ্ঞান–বিজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় অস্ত্র যোগান দেয়, যারা ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণায় আত্মনিবেদিত ছিল।

যাই হোক, যে কারণেই হোক না কেন প্রাচীন একাডেমিক উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ ইউরোপ খুব ভালভাবে করে। এমনকি যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ দেখার লোকও এখন সেখানে কদাচিতই দেখা যায়, বহু অর্থব্যয়ে অত্যন্ত যত্নসহকারে সেগুলোরও সংরক্ষণ করা হয়। সেগুলোকে কালের আবর্তন থেকে বাঁচানোর জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। ডাবলিনের লাইব্রেরীসমূহকে পার্লামেন্টের একটি এ্যাক্টের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছে। আলহামদুলিল্লাহ, এখন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে উন্নতমানের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে এ ব্যাপারে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্লভ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির কপিসমূহ আধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিনের মাধ্যমে আলমে ইসলামের বিভিন্ন দেশে যেমন সৌদী আরব, আরব আমিরাত, মিসর, তুরস্ক ও সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশ পাকিস্তান এ ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সারা দেশের কোথাও একটি লাইব্রেরীও সম্ভবতঃ এমন নেই, যা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। বরং আমাদের দেশের প্রত্যন্ত মফস্বল এলাকায় গ্রন্থসমূহের বড় দুর্লভ সংগ্রহ রয়েছে। সিন্ধুর পীরঝাণ্ডুর গ্রন্থাগার স্বীয় সমৃদ্ধির দিক থেকে বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ। এছাড়াও সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কিছু গ্রন্থাগার

অতুলনীয়। কিন্তু সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। এ সমস্ত গ্রন্থাগার প্রবীণ জ্ঞানবন্ধু ও বিদ্যানুরাগী গুণীজনেরা প্রতিস্ঠা করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা নিজেদের সামর্থ্য মত সেগুলো সংরক্ষণও করে এসেছেন। কিন্তু গ্রন্থ সংরক্ষণের আধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিনারী তাঁদের নিকট নেই। আমি সেগুলোর কিছু গ্রন্থাগারে স্বচক্ষে দেখেছি যে, অনেক দুর্লভ গ্রন্থ উঁইপোকার আক্রমণ ও ঋতুর প্রতিকূল প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি বারবার এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কিন্তু ফলাফল তথৈবচ। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমানে আমাদের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী নিজেই একজন স্কলার। তাঁর জ্ঞান–বন্ধুত্ব সন্দেহাতীত। যদি তিনি সরকারকে একথা বুঝাতে সক্ষম হন যে, উন্নয়নশীল একটি দেশের জন্য এটিও অতীব জরুরী যে, তাকে নিজের লাইব্রেরীসমূহ সমৃদ্ধ ও সুসংহত করতে হবে, এজন্য উপকরণ যোগান দিতে হবে ; তাহলে হয়ত আমাদের দেশের এ সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার যুগের থাবা থেকে রক্ষা পাবে।

গ্রন্থাগারসমূহ দেখা শেষ হলে ডঃ শাহজাদ সাহেব ডাবলিন শহরটিও কিছুটা ঘুরে দেখান। শহরটি লিফেই (Liffey) নদীর উভয় দিকে অবস্থিত। শহরের মধ্যভাগও নদীর তীরেই অবস্থিত। ইউরোপের অন্যান্য শহরের ন্যায় ডাবলিনও একটি সুদৃশ্য শহর। কিন্তু এখানে রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিস্ঠ বিধায় প্রাচীন ঐতিহ্যসমূহের অনুবর্তিতায় তারা ইউরোপের অন্যান্য শহর থেকে অধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

আয়ারল্যাণ্ড ১৯২১ ঈসায়ী পর্যন্ত বৃটেনের অংশ ছিল। ১৯২১ ঈসায়ীর একটি এ্যাক্টের মাধ্যমে তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা অংশরূপে ছিল। অবশেষে ১৯৪৮ ঈসায়ীতে থেকেও তার শেষ সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে। ফলে সে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশের রূপ লাভ করে। আয়ারল্যাণ্ড মূলত বৃটেনের পশ্চিমের একটি দ্বীপ। উত্তর ও দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের সমন্বয়ে এই দ্বীপটি গঠিত। দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড বৃটেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপরোক্ত পন্থায় পৃথক দেশের রূপ লাভ করেছে। একে রিপাবলিক অব আয়ারল্যাণ্ড বলা হয়। ডাবলিন এর রাজধানী। কিন্তু উত্তর আয়ারল্যাণ্ড—যার বড় শহর বেলফাষ্ট—এখনও বৃটেনের অধীনে রয়েছে। সেখানে স্বাধীনতার আন্দোলন অব্যাহত

রয়েছে। এ কারণে বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে সংঘাতও হতে থাকে। তবে উভয় দেশ পরস্পরের যাত্রীদের যাতায়াতের এত সুবিধা দিয়েছে যে, তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে হয়। উভয় দেশের আকাশপথের ভ্রমণ, আভ্যন্তরীণ ভ্রমণের মত মনে হয়। এখানে ইমিগ্রেশন ও ভিসা ইত্যাদির ধাপ অতিক্রম করতে হয় না।

আয়ারল্যাণ্ডের নিজস্ব ভাষা 'আইরিশ'। তবে ইংরেজীও সমভাবে বলা হয়, বোঝা হয় ও লেখা হয়। দেশের অর্থনীতি বেশীর ভাগ নির্ভরশীল ছিল কৃষির উপর। এজন্যই তাকে কৃষকদের দেশ বলা হত। কিন্তু এখন শিল্পেও উন্নতি হয়েছে। পূর্বে এটি ইউরোপের তুলনামূলক পশ্চাদপদ দেশসমূহের মধ্যে গণ্য হত। কিন্তু এখন কিছুদিন ধরে সুসংহত অর্থনৈতিক পলিসির ফলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। দেশটি বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করছে। আইরিশ সমাজের উপর এখনও পর্যন্ত ধর্মের বন্ধন অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশের তুলনায় বেশী। অধিকাংশ অধিবাসী রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান। বৃটেনের প্রোটেস্টেন্ট অধিবাসীদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেও তাদের মতবিরোধ চলতে থাকে। এখানকার সমাজে ধর্মের অবস্থিতির ফলে এ দেশ নির্লজ্জতা ও নগ্নতার সেই প্লাবনে তুলনামূলক কম প্রভাবিত হয়েছে, যা সমগ্র পশ্চিমা জগতকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে।

আয়ারল্যাণ্ডে হাজার হাজার মুসলমান অধিবাসীও রয়েছে। তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক অধিবাসী পাকিস্তানী। যাদের অনেকে ব্যবসায়ী এবং অনেকে চাকুরীজীবি। পাকিস্তানী ডাক্তারদের এখানে বেশ কদর রয়েছে। তারা এখানে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। আরবদের সংখ্যাও অনেক। মাশাআল্লাহ বেশীর ভাগ মুসলমান এখানে সচ্ছল। তাদের সঙ্গে স্থানীয় লোকদের আচার-ব্যবহার মোটের উপর ভাল।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ছিল কনফারেন্সের সর্বশেষ কার্যকরী অধিবেশন। যা মাগরিবের পরও এশা পর্যন্ত চলতে থাকে। এশার পর—যা এখানে রাত সাড়ে দশটায় হচ্ছিল—এক বন্ধুর বাড়ীতে খাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। সেখান থেকে রাত বারোটায় হোটেলে ফিরি। জুমুআর দিন সকাল নয়টায় হোটেল থেকে রওয়ানা করি। বৃটিশ মিডল্যাণ্ডের

বিমানযোগে সাড়ে বারোটায় লণ্ডন পৌঁছি। বৃটেনের কিছু লোক মুসলিম জনসাধারণের জন্য ইসলামসম্মত পন্থায় পুঁজি বিনিয়োগের একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। শনিবার সকালে আমার তাতে অংশগ্রহণের প্রোগ্রাম ছিল। জুমুআর দিনের বিকালটি কয়েকদিনের বিরামহীন সফর ও ব্যস্ততার পর অবসর ছিল। ক্লান্তিতে দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ ছিল। টেম্‌স নদীর তীরে টাওয়ার ব্রীজ সংলগ্ন হোটেলে আমি অবস্থান করি। অদূরের একটি পাকিস্তানী রেস্তোরাঁয় মেজবানদের সঙ্গে খানা খেয়ে আমি হোটেলে এসে আরাম করি। আমার নিরিবিলি কয়েক ঘন্টা সময় প্রয়োজন ছিল। লণ্ডনের কোন বন্ধু আমার আগমনের ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। তাই নিরিবিলির এই কয়টি মুহূর্তে বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাজও করা সম্ভব হয়। রাতও নিরিবিলিতে কাটে। সকাল ৯টা থেকে বারোটা পর্যন্ত হোটেলেই মিটিং হয়। এটি ছিল সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ। পরদিন আমাকে ইসলামিক রিচার্স–এর অক্সফোর্ড সেন্টারে হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) সম্পর্কে একটি সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দুপুর বারোটায় অক্সফোর্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি।

অক্সফোর্ডে

অক্সফোর্ড লণ্ডন থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি ছোট একটি শহর। তবে তার ইউনিভার্সিটির কারণে বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ। এর শিক্ষার মান সারা বিশ্বে স্বীকৃত। এখানে ইসলামিক ষ্টাডিজের স্কলারশিপের জন্য একটি সেন্টার দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) এই সেন্টারের বোর্ড –এর সভাপতি ছিলেন এবং সৌদী আরবের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব জনাব আবদুল্লাহ উমর নাসীফ এর সহ–সভাপতি ছিলেন। হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)এর ইন্তেকালের পর বর্তমানে আবদুল্লাহ উমর নাসীফ সাহেবই এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানটি ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসান বালকিয়ার পক্ষ থেকে প্রতিবছর কোন ব্যক্তিত্বকে তার ইসলামী খেদমতের ভিত্তিতে পুরস্কারও প্রদান করে

থাকে। এই পুরস্কারের যোগ্য লোক নির্ধারণের জন্য বিচারকরূপে আমি ইতিপূর্বেও একবার এখানে এসেছি। সেন্টারের ডাইরেক্টর ফারহান নিযামী—যিনি ভারতের প্রসিদ্ধ লেখক জনাব খালিক আহমাদ নিজামীর পুত্র—আন্তরিক ভালবাসার কারণে আমাকে কয়েকবারই এখানে আসার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে কেবলমাত্র একবারই উপস্থিত হতে পেরেছি। এবার তিনি হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)এর স্মরণসভার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করেন। এতে অংশগ্রহণের আমি ওয়াদা করেছিলাম।

আমি দু'টার দিকে অক্সফোর্ড পৌঁছি। সন্ধ্যায় সেন্টারে অতিথিদের সম্মানে নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল। নৈশভোজের উদ্দেশ্যে বের হতে যাচ্ছি এমন সময় দারুল উলূম দেওবন্দ (ওয়াক্ফ)এর মুহতামিম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী সাহেবের ফোন আসে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত অপ্রত্যাশিত নেয়ামত মনে হল। নৈশভোজে গিয়ে দেখি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার বর্তমান মুহতামিম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে' নদভী সাহেব তাশরীফ এনেছেন। তিনি হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ সাহেব (কুঃ ছিঃ)এর ভাতিজা। হযরত মাওলানার যোগ্য উত্তরসূরীরূপে তাঁর মিশনের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে আরোপিত হয়েছে। 'আল বা'সুল ইসলামী'র সম্পাদক জনাব মাওলানা ওয়াযেহ রশীদ সাহেব নদভীও তাশরীফ এনেছেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হয়। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে' সাহেব এর সঙ্গে এটি আমার প্রথম সাক্ষাত। তাঁর পোশাক-আশাক ও অঙ্গভঙ্গি দেখে হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)এর স্মৃতি মানসপটে ভেসে ওঠে। সম্প্রতিই প্রায় একমাস পূর্বে ইংল্যাণ্ডের ডিউসভেবারী শহরে হযরত মাওলানা (রহঃ)এর আলোচনার উদ্দেশ্যে অধমের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ভারত, পাকিস্তান, ইউরোপ, আমেরিকা ও কুয়েত থেকে অনেকে অংশগ্রহণ করেন। সেই সমাবেশে আমি হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)এর চিন্তা ও কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাষণ দানের সুযোগ পাই। যা টেপ

রেকর্ডারের মাধ্যমে নকল হয়ে এখন পৃথকভাবে পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দেওয়া তাওফীকে সেই ভাষণে আমি অধম হযরত মাওলানার ইলম, আমল ও দাওয়াতী জীবন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করার প্রয়াস পাই। সে ভাষণে আমি তাঁর বিশেষ ভারসাম্যপূর্ণ রুচি-প্রকৃতির বেশিষ্ট্যাবলীও বর্ণনা করি। বৃটেনের বেশীর ভাগ আলেম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই ভাষণকে ব্যাপক সাধুবাদ জানানো হয়। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে আমার নিকট পত্র আসে যে, এটি দ্রুত প্রকাশিত হওয়া দরকার। মাওলানা ওয়াযেহ রশীদ সাহেব নদভী (দাঃ বাঃ) বললেন, মাওলানা সালমান নদভী সাহেবের মধ্যস্থতায়—যিনি ঐ সমাবেশে তাশরীফ নিয়েছিলেন—ঐ ভাষণের আলোচনা ভারতেও পৌঁছে এবং এটিকে হযরত মাওলানা (রহঃ)এর রুচি ও প্রকৃতির সঠিক ব্যাখ্যা আখ্যা দেওয়া হয়। আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা।

সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ডঃ আবদুল্লাহ উমর নাসীফ ছাড়াও আমার আরব বন্ধুদের মধ্যে কুয়েতের শায়েখ খালেদ আল মাজকুর, সিরিয়ার ডঃ আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ, ইরাকের ডঃ মুহীউদ্দীন কুররা দাগী এবং রাবেতাতুল আদাবুল ইসলামী, দামেস্ক-এর আবু সালেহও তাশরীফ এনেছিলেন। ডঃ আবদুল্লাহ উমর নাসীফের ইচ্ছায় একটি অধিবেশনের সভাপতিত্বও অধমের উপর ন্যস্ত করা হয়। শায়খ ইউসুফ আল কারজাভী 'সাফীরুল আজম ইলাল আরব' শিরোনামে তাঁর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি উপস্থিত হতে না পারায় আমার বন্ধু ডঃ মুহীউদ্দীন কুররা দাগী তা পাঠ করেন। শায়খ ইউসুফ আল কারজাভী সেই প্রবন্ধে হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)কে 'আরবদের সমীপে অনারবদের দূত' আখ্যা দেন। তিনি তাতে হযরত মাওলানার লেখনী, ভাষণ এবং ততোধিক তাঁর বাস্তব জীবন আরব বিশ্বের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা তুলে ধরেন। শায়খ কারজাভী যে ভাষায় হযরত মাওলানাকে ভক্তিমাল্য পেশ করেন, তা নিশ্চয়ই অসাধারণ। আরবের বিশিষ্ট এক ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে হযরত মাওলানার উচ্চাসনের এই স্বীকৃতি উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য নিঃসন্দেহে

অতি বড় গর্বের বিষয়। মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী সাহেব (মুঃ যিঃ)এর 'মুশকিলাতুন ওয়ালা আবা হাসানা লাহা' শিরোনামের প্রবন্ধটি বড় চমৎকার ছিল। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী (মুঃ যিঃ) তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু সর্বাঙ্গীন ভাষণে হযরত মাওলানার সার্বিক চিন্তা-চেতনার উপর আলোকপাত করেন। ডঃ আবু সালেহ রাবেতাতুল আদাবিল ইসলামীর মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্যের উপর হযরত মাওলানার কর্মের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তাঁর বিভিন্ন সেবা ও কর্মের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উচ্ছসিত হয়ে কেঁদে ফেলেন। আল্লামা খালেদ মাহমুদ সাহেবও তাঁর বিশেষ আঙ্গিকে ভাষণ দান করেন। ফলে উপস্থিতির ধন্যবাদ ধ্বনিতে হলকক্ষ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

অধিকাংশ ভাষণ হয় আরবীতে। আর কিছু হয় উর্দূতে। ডঃ ফারহান নিযামী সাহেব আমাকে উভয় ভাষায় ভাষণ দানের জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর সে অনুরোধ আমাকে রক্ষা করতে হয়। ভাষণদানকারীদের সংখ্যা অধিক হওয়ায় এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ ছিল না। তবে আমি সংক্ষেপে হযরত মাওলানার দাওয়াতী জীবনের ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করি, যা আমার ক্ষুদ্র মতে তাঁর দাওয়াতের মধ্যে অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টির কারণ ছিল এবং যেগুলোর কারণে তাঁর বক্তব্য বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। একে আমার ডিউসবেরীর ভাষণের সারাংশ বলাই যথার্থ। ইনশাআল্লাহ তা সত্বরই ছেপে বের হবে। তাতে দ্বীনের কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম রয়েছে।

কিছু আরব কবি হযরত মাওলানা সম্পর্কে স্তূতি-কাব্য রচনা করেছিলেন। সেগুলোও আবৃত্তি করে শোনানো হয়। সেগুলো আরব সুধীজনকে এক অপূর্ব ভাব-বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন করে।

এবার আমি এই একটিমাত্র দিনের জন্যই বৃটেন এসেছিলাম। অবিলম্বে আমাকে করাচী পৌঁছতে হবে বিধায় অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু যে কয়জন ব্যক্তিই অধমের অক্সফোর্ড আসার ব্যাপারে অবগত হতে পেরেছিলেন, তারা সবাই দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে অক্সফোর্ড চলে আসেন। মাওলানা ইবরাহীম রাজা, যিনি দারুল উলূম বার্নীর যোগ্য ওস্তাদদের অন্যতম এবং অধ্যয়ন ও গবেষণার বিশেষ

রুচির অধিকারী, তিনি আমাকে এত ভালবাসেন ও করুণা করেন যে, আমি বৃটেনের আশেপাশে যেখানেই থাকি না কেন, তিনি দীর্ঘ পথ সফর করে সেখানেই চলে আসেন। এবারেও তিনি ব্লাকবার্ন থেকে চার ঘন্টার পথ অতিক্রম করে শনিবারেই এখানে চলে এসেছিলেন। পরের দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গেই থাকেন। আমার অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বন্ধু মাওলানা মুহাম্মাদ দীদাত সাহেব—যিনি দারুল উলূম বার্নীর লাইব্রেরী-প্রধান—বহু বছর ধরে আমার সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক ভালবাসার সম্পর্ক। তিনি গ্রন্থ বিষয়ে বিশেষ রুচির অধিকারী। আমাকে ভালবাসেন বিধায় আমার নিকট সময় সময় নতুন নতুন গ্রন্থ এবং হস্তলিপি কপির ফটোকপি পাঠিয়ে থাকেন। তিনি মাওলানা ইবরাহীমের মাধ্যমে হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব (মেশকাতুল মাসাবিহের মূল গ্রন্থ) 'আল মাসাবিহের' আল্লামা তুরপুশ্‌তী (রহঃ)-এর উৎকৃষ্টতম ভাষ্যগ্রন্থের হস্তলিপি কপি আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। যা এখনও কোথাও মুদ্রিত হয়নি। এটি ছিল আমার জন্য একটি বিশাল নেয়ামত।

ইসলামিক ইয়থ ফোরামের প্রধান জনাব মাওলানা সালীম ধৌরাত সাহেব—যিনি মাশাআল্লাহ এখানকার তরুণদের মধ্যে অতি উচ্চমূল্যের শিক্ষা প্রদান করছেন এবং দাওয়াত ও সামাজিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন—লেষ্টার থেকে সফর করে এখানে তাশরীফ আনেন এবং আমার ভাষণে অংশগ্রহণ ও সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের পর অবিলম্বে ফিরে যান। মুফতী রিয়াজুল হক সাহেব বার্মিংহামের ইসলামী সেন্টারের প্রধান। তিনি সিম্পোজিয়াম সমাপ্ত হওয়ার পর এসে পৌছান। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাত হয়। ডিউসবারীর মাওলানা ইয়াকুব ইসমাঈল মুনশী সাহেব, যিনি বৃটেনের প্রসিদ্ধ আলেমদের অন্যতম এবং অনেক গবেষণা মূলক কাজ করে থাকেন, তিনিও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের জন্য তাশরীফ এনেছিলেন, তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়।

অক্সফোর্ড অতি ছোট একটি শহর। সেখানে তিনটি মসজিদ রয়েছে। তার মধ্যে মদীনা মসজিদ হচ্ছে সবচে' বড়। সেখানে শিশুদের দ্বীনী শিক্ষার জন্য মাদরাসা এবং ইসলামী সেন্টারও রয়েছে। এই সেন্টারের প্রধান মাওলানা মুহাম্মাদ জামিল সাহেব সখখরের (পাকিস্তান) অধিবাসী

এবং মাদরাসায়ে আশরাফিয়া সখখর থেকে শিক্ষা সমাপনকারী আলেম। তিনি বহুদিন ধরে এখানে সেবাদান করে যাচ্ছেন। সিম্পোজিয়ামে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অল্পসময়ের জন্য তাঁর মসজিদ পরিদর্শনে যেতে অনুরোধ করেন। সুতরাং আসর নামায আমি সেখানে পড়ি। উপস্থিত সুধীজনের অনুরোধে সংক্ষিপ্ত ভাষণও দান করি। সেন্টারের ধর্মীয় তৎপরতা দেখে বড় আনন্দিত হই। ফেরার পথে মাওলানা জামিল সাহেব অক্সফোর্ড শহর ঘুরে দেখান।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রথমে একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে আরম্ভ হয়েছিল। তবে ক্রমে ক্রমে তাতে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর পর এটি প্রকৃত অর্থেই উন্নতি আরম্ভ করে। এমনকি তা বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই ইউনিভার্সিটি এদিক থেকে ব্যতিক্রমধর্মী যে, এর নিজস্ব কোন ভবন বা ক্যাম্পাস নেই। তার বদলে এখানে প্রচুর কলেজ রয়েছে। এ সমস্ত কলেজ ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সংযুক্ত। কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদেরকে ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে ডিগ্রী দান করা হয়। অতি ছোট এই শহরটিতে প্রায় চল্লিশটি কলেজ রয়েছে। যেগুলোতে সমগ্র বিশ্বের ছাত্ররা শিক্ষালাভ করছে। এর মধ্যে অধিকাংশ কলেজ কয়েক শ' বছরের প্রাচীন। এগুলোর ভবনসমূহও প্রাচীন। এগুলোকে তার প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ ধাঁচে অব্যাহত রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এমনকি ভবনের বহিঃপ্রাচীরসমূহে কালের আবর্তনে যে কালিমা পড়েছে, তা দূর করে রং-পালিশের ব্যবস্থাও করা হয়নি। পুরাতন কাঠের ভগ্নফটক ওভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

পার্শ্ববর্তী গলিসমূহে শত শত বছর পূর্বে পাথরের সড়ক থেকে থাকলে এখনও তা পাথরেরই রেখে দেওয়া হয়েছে। যে যে কলেজে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বগণ শিক্ষালাভ করেছেন, সেগুলোর কতক স্থানে তাদের স্মৃতিচিহ্নও রয়েছে।

বোডলিয়ান লাইব্রেরী (Bodlian Library) আক্সফোর্ডের সেই প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী, যেখানে আরব ও প্রাচ্যের হস্তলিপিগ্রন্থের বহু সংগ্রহ রয়েছে। মারিশ লাইব্রেরীর আলোচনা করতে গিয়ে আমি লিখেছি যে, আর্চ বিশপ

মারিশ তার সংগৃহীত হস্তলিপি গ্রন্থসমূহ অক্সফোর্ডের এই লাইব্রেরীকেই দিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল আর দিনটি ছিল রবিবার তাই লাইব্রেরীর ভিতরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বাহির থেকে শুধু ভবন দেখে ফিরে আসি। এ অঞ্চলেরই একটি জায়গাকে এদিক থেকে স্মরণীয় মনে করা হয় যে, বৃটেনে সর্বপ্রথম কার তৈরীকারী ব্যক্তি মারিশ এই জায়গাতেই কারটি বানিয়েছিলেন। সেই কারের ছবিও এখানে লাগানো রয়েছে। পরবর্তীতে মারিশের নামে বহুদিন পর্যন্ত এই কার বানানো হয়। এখন তা Rover 'রোভার' নামে তৈরী হচ্ছে।

পরদিন সকাল নয়টায় মাওলানা জামিল সাহেবের সঙ্গে লণ্ডন হিথ্রো বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বৃটিশ এয়ারওয়েজে সাত ঘন্টা ওড়ার পর দুবাই অবতরণ করি। বিমানে ওড়ার এ সময়টি এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখার কাজে ব্যয় করি। এ লাইন কয়টি এখানে লাউঞ্জে বসে শেষ করছি। রাত একটা বেজে চলছে। বিমান যাত্রা করবে বিধায় বিমানে আরোহণের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এ ভ্রমণ বৃত্তান্তও সমাপ্ত হল।

অক্টোবর ২০০০ ঈসায়ী।

ইয়ামানের সান'আ নগরীতে

ইয়ামানের রাজধানী 'সান'আ' নগরীর নাম আমি সর্বপ্রথম আমার দশ বছর বয়সে দারুল উলূম করাচীতে 'মাকামাতে হারীরী' নামক প্রসিদ্ধ আরবী–সাহিত্য–গ্রন্থ পাঠ করার কালে শ্রবণ করি। গ্রন্থটির প্রত্যেকটি 'মাকামা'কে কোন একটি নগরীর সাথে সম্পৃক্ত করে নামকরণ করা হয়েছে। তার প্রথম 'মাকামা'র নাম 'সান'আনিয়্যাহ'। তাতে 'সান'আ' নগরীর একটি আলেখ্য বিবৃত হয়েছে। পরবর্তীতে হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে এ নগরীর গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারলেও কখনও তা দেখার সুযোগ হয়নি। আরব দ্বীপের প্রত্যেকটি দেশে আমার বারবার যাওয়া হলেও ঘটনাচক্রে ইয়ামানের এ ভূখণ্ডে কখনো যাওয়ার সুযোগ হয়নি। একবারমাত্র নাইরোবী যাওয়ার পথে 'সান'আ' বিমানবন্দরে বিমান যাত্রা বিরতি করেছিল। কিন্তু তখনও শহরাভ্যন্তরে যাওয়া হয়নি।

এ বছর (১৪২২ হিজরী) সফর মাসে আমি সান'আ নগরীর 'জামেআতুল ঈমান'এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শায়েখ আবদুল মাজীদ জিন্দানী (হাফিযাহুল্লাহ)এর পক্ষ থেকে এ মর্মে একটি দাওয়াতপত্র পাই যে, তিনি ২রা মে, ২০০১ সালে তদীয় প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপনকারীদের ১ম ব্যাচের সম্মানার্থে সান'আ নগরীতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছেন। তিনি সেই সম্মেলনে আমার অংশগ্রহণের প্রত্যাশী। ঘটনাচক্রে সেই তারিখেই কায়রোতেও সেখানকার ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হতে যাচ্ছিল। তাতে অংশগ্রহণের জন্য তাদের পক্ষ থেকে আমার উপর জোর পীড়াপীড়ি চলছিল। কিন্তু বেশ কয়েকটি কারণে আমি কায়রোর পরিবর্তে সান'আয় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এ সিদ্ধান্তের একটি কারণ এও ছিল যে, কায়রোতে বারবার যেয়ে থাকি, কিন্তু

ইয়ামান যাওয়ার বাসনা এখনও অপূর্ণই রয়ে গেছে।

ইয়ামানের ভূখণ্ড নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরা কিংবা নগরায়নের দিক থেকে দর্শনীয় বিধায় আমার এ আগ্রহ ছিল তা নয়। আমার এ আগ্রহের মূল কারণ ছিল, আল্লাহ তাআলা এ দেশটিকে এমন এক বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন, যা পবিত্র মক্কা-মদীনার পর অন্য কোন দেশের ভাগ্যে জোটেনি। হাদীস শরীফে ইয়ামান ও ইয়ামানের অধিবাসীদের বিষয়ে অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ ভূখণ্ড আম্বিয়া কেরাম, সাহাবা, তাবেঈন ও বুযুর্গানে দ্বীনের ভূখণ্ড ছিল। একজন মুসলমানের জন্য আকর্ষণের অনেক উপাদানই এ ভূখণ্ডে রয়েছে। কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে এ ভূখণ্ড সম্পর্কে যে সমস্ত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সংকলন করা হলে পূর্ণ একটি গ্রন্থ তৈরী হবে। তাই তার বিশেষ কিছু ফযীলত নিম্নে প্রদত্ত হল।

হাদীস শরীফে আছে যে, যখন ইয়ামানের প্রতিনিধিদল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আসে, তখন তিনি বলেন—

اتاكم اهل اليمن هم ارق افئدة والين قلوبا، الايمان يمان والحكمة يمانية

অর্থ ঃ 'তোমাদের নিকট ইয়ামানের লোক এসেছে, তাদের মন বড় কোমল এবং তাদের হৃদয় বড় বিনম্র। ঈমান ইয়ামানের এবং হিকমাত ইয়ামানের।' (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৪১২৭)

অন্য এক রেওয়ায়াতে এই শব্দ এসেছে—

الفقه يمان والحكمة يمانية

অর্থ ঃ 'ফেকাহ ইয়ামানের এবং হিকমাত ইয়ামানের'।

(সহীহ বুখারী, হাদীস-৪১২৯)

অপর একসময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন—

الايمان ههنا

অর্থ ঃ 'ঈমান এদিকে রয়েছে।' (সহীহ বুখারী, মাগাযী, হাদীস-৪১২৭)

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের দিকে তাকালেন এবং এই দু'আ করলেন—

اللهم اقبل بقلوبهم

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! তাদের অন্তরসমূহকে (ঈমানের দিকে) আকৃষ্ট করুন।' (তিরমিযী শরীফ, মানাকের, হাদীস–৩৯৩০)

হযরত জুবায়ের বিন মুতয়িম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল আসমানের দিকে উত্তোলন করে বলেন—

اتاكم اهل اليمن كقطع السحاب خير اهل الارض

অর্থ ঃ 'তোমাদের নিকট ইয়ামানের লোকেরা মেঘখণ্ডের ন্যায় আসছে। তারা সমগ্র পৃথিবীবাসীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের চেয়েও কি?' তিনি বললেন, 'তোমাদের ছাড়া।' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

হযরত আমর বিন আবাছা (রাযিঃ) বলেন যে, একবার উয়াইনা বিন হাসান ফাযারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে নজদবাসীকে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক আখ্যা দিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

كذبت، بل خير الرجال اهل اليمن، والايمان يمان، وانا يمان

অর্থ ঃ 'তুমি ভুল বলেছো, বরং সর্বশ্রেষ্ঠ লোক ইয়ামানের লোক এবং ঈমান ইয়ামানের এবং আমিও ইয়ামানের।' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে যে ইয়ামানের দিকে সম্পৃক্ত করলেন তার কারণ এই হতে পারে যে, 'ইয়ামান' ছিল মূলতঃ আরবদের পূর্বপুরুষ 'কাহতানের' পুত্রের নাম। তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)এর সন্তানদের অন্যতম। এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ–সম্পর্ক ইয়ামানীদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, ইয়ামানের লোকদের নীতি–অভ্যাস

যেহেতু আমার পছন্দনীয় তাই আমিও যেন ইয়ামানের। মোটকথা, কারণ যাই হোক না কেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজেকে ইয়ামানের লোকদের দিকে সম্পৃক্ত করা এত বড় এক মর্যাদা যে, এ নিয়ে যত গর্বই করা হোক না কেন তা কমই হবে। অপর একটি হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই এরশাদ বর্ণিত হয়েছে—

الايمان يمان و هم منى والى، و ان بعد منهم المربع ويوشك ان ياتوكم انصارا و اعوانا فامركم بهم خيرا

অর্থ ঃ 'ঈমান ইয়ামানের এবং তারা (অর্থাৎ ইয়ামানের অধিবাসীরা) আমার থেকে এবং আমার দিকে, চাই তারা যত দূরেই অবস্থান করুক না কেন এবং সেই সময় অদূরে, যখন তারা (ইসলাম ও মুসলমানদের) সাহায্যকারীরূপে আবির্ভূত হবে। আমি তোমাদেরকে তাদের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছি।' (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এছাড়া একটি হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানবাসীর এ বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছেন যে, মোসাফাহা পদ্ধতির সর্বপ্রথম প্রচলন ঘটায় তারা।' (আবু দাউদ শরীফ)

যে মুসলমান এ সমস্ত হাদীসের মাধ্যমে ইয়ামান ও ইয়ামানবাসীর এ সমস্ত ফযীলত জানতে পারবে, তার নিঃসন্দেহে এ দেশ ও এর অধিবাসীদের দেখার বাসনা জাগবে, যদিও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের লোকদের এ সমস্ত ফযীলত সে যুগের হিসাবে বলেছিলেন। এবং এটি জরুরী নয় যে, চৌদ্দশ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের মধ্যে এ সমস্ত গুণাবলী অবশিষ্ট থাকবে। তবুও প্রথমতঃ

بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است

অর্থ ঃ 'বুলবুলের জন্য ফুলের সঙ্গের অন্তঃমিলই যথেষ্ট।'

দ্বিতীয়তঃ, আল্লাহ তাআলার নিয়ম এমনই যে, যখন কোন ভূখণ্ডের লোকদের মধ্যে কিছু গুণ ও যোগ্যতা দেন, তখন কালাবর্তে তার বাস্তব প্রয়োগ যতই ব্যাহত হোক না কেন, কিন্তু স্বভাবগত যোগ্যতার কিছু না কিছু নিদর্শন তার পরও রয়ে যায়।

যাই হোক, এ সমস্ত কারণে ইয়ামানকে এক নজর দেখার বাসনা আমি দীর্ঘদিন ধরে অন্তরে পোষণ করে আসছিলাম। 'আল-ঈমান' বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই নিমন্ত্রণ আমাকে সে বাসনা পূরণের সুযোগ করে দেয়। তাই অবিলম্বে আমি তা গ্রহণ করি।

৭ই রবিউল আউয়াল ১৪২২ হিজরী মোতাবেক ১লা জুন ২০০১ ঈসায়ী সকাল ৮টায় পি.আই.এ. এর বিমানযোগে আমি দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। সান'আর বিমানে আরোহণের প্রতীক্ষায় এখানে আমাকে সাড়ে চার ঘন্টা সময় অপেক্ষা করতে হয়। তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের সংশোধনের বেশীর ভাগ কাজ আমি বিমানেই করেছি। আল্লাহর মেহেরবানীতে এভাবেই তার পাঁচ ভলিউমের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এখন আমার সঙ্গে ৬ষ্ঠ ভলিউমের সূরা 'ত্ব-হার' অংশ ছিল। এর পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছেন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা জনাব ইশরাত হুসাইন সিদ্দীকি সাহেব। দুবাইয়ে অপেক্ষার এ সময় আমি তার সংশোধনে ব্যয় করি। আজ ছিল জুম'আ বার। জুমআর নামায পড়ার জন্য বিমানবন্দরের বাইরে যাওয়ার ভিসা আমার নিকট ছিল না। বেলা একটার সময় আমি দুবাই বিমানবন্দরের নির্ধারিত নামাযের জায়গায় চলে যাই। সেখানে এ পরিমাণ লোক উপস্থিত ছিল যে, তাদের নিয়ে জুমআর নামায হতে পারে।[১]

সুতরাং উপস্থিত সবাই জুমআর নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং আমাকে নামায পড়ানোর কথা বলে। এক ব্যক্তি আযান দেয়। আমি খুৎবা দিয়ে নামায পড়াই। এভাবে বিমানবন্দরে জুমআর নামায পড়ানোর প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

বেলা দুইটায় ইয়ামান এয়ারলাইন্সের বিমান দুবাই থেকে রওয়ানা হয়। বিমান প্রথমে বাহরাইন যায় তারপর সেখান থেকে সান'আর

---

১. হানাফীদের মতে জুমআর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য 'ইযনে আম' তথা 'সাধারণ অনুমতির' যে শর্তটি রয়েছে, তার সঠিক অর্থ এই যে, যে বৃহৎ অঞ্চলে জুমআর নামায পড়া হচ্ছে, সেখানকার লোকদের উপর জুমআর নামাযে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা না থাকতে হবে। নিরাপত্তা প্রভৃতির কারণে বড় কোন এলাকার মধ্যে বাইরের লোকের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকলে তাতে জুমআ শুদ্ধ হওয়ার উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বাহরাইন থেকে সানআর পথ তিন ঘন্টায় অতিক্রম করে। এর বেশীর ভাগ সময়ও আমি মাআরিফুল কুরআনের কাজে ব্যয় করি। বিকাল ছয়টা বাজছিল। বিমান সান'আর বিমানবন্দরে অবতরণ করল। সেখানকার সিঁড়ির উপরেই 'জামেয়াতুল ঈমানের' সভাপতি শায়েখ আবদুল মাজিদ জিন্দানী, প্রধান পরিচালক শায়েখ আবদুল ওহাব ও আরো অন্যান্য অনেকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। ভি.আই.পি লাউঞ্জে আমাদের থেকে পাসপোর্ট ও সামানাপত্রের টিকিট নিয়ে কোনরূপ অপেক্ষা ছাড়া আমাদেরকে হোটেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হোটেলে গিয়ে আমরা মাগরিব নামায আদায় করি। হোটেলটির নাম 'ফিন্দাক সান'আ আদ্‌দুয়ালী।' সম্প্রতিই হোটেলটি নির্মিত হয়েছে। জামেয়াতুল ঈমানের অতিথিদের দ্বারাই এখানে অতিথিদের অবস্থান সূচিত হয়।

করাচী থেকে সরাসরি কোন বিমান সান'আর উদ্দেশ্যে এলে খুব জোর তিন/সাড়ে তিন ঘন্টায় এখানে পৌঁছা সম্ভব ছিল। কিন্তু ঘোরাপথে ভ্রমণের ফলে এখানে পৌঁছতে আমাকে বার ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়। জামেয়াতুল ঈমানের জনৈক প্রফেসর শায়েখ আদেল হাসান আমীন আমার গ্রন্থাদির মাধ্যমে আমার সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌর নদওয়াতুল উলামায় হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)এর বিশিষ্ট সাগরেদ ছিলেন। তিনি আমার রওনা হওয়ার পূর্বেই করাচীতে বারবার আমাকে ফোন করছিলেন। তিনি আমার আরবী কিতাবসমূহ সঙ্গে আনার জন্য ফরমায়েশ করেছিলেন। তিনি বিমানবন্দর থেকে অনবরত আমার সঙ্গে ছিলেন। দুবাই থেকে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (রহঃ)এর সুযোগ্য নাতি ডঃ সালমান সাহেবও একই বিমানযোগে সান'আ পৌঁছেন। তাঁর সঙ্গে শায়েখ আদেলের বহুদিনের হৃদ্যতা ও অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিল। ডঃ সালমান সাহেবের ছেলে ইউসুফ সাহেব জামেয়াতুল ঈমানেই শিক্ষারত রয়েছেন। হোটেলে পৌঁছার পর আমার কক্ষ অনেকক্ষণ পর্যন্ত এঁদের উপস্থিতিতে আলোকোজ্জ্বল থাকে। রাতের খাবারও সবাই এখানেই খায়। এগারোটার দিকে সবাই নিজ নিজ বিছানায় চলে যায়।

আমার কক্ষটি (যা একটি বেডরুম, ড্রয়িং রুম ও ডাইনিং রুম বিশিষ্ট ছিল) পঞ্চম তলায় ছিল। কক্ষের খিড়কি দিয়ে পাহাড়সারির পাদদেশে সান'আ নগরীর বিস্তৃত জনপদ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। করাচী ও দুবাইতে গ্রীষ্ম তার যৌবনে অবস্থান করছিল। কিন্তু সান'আর ঋতু ছিল বড় মনোরম। খিড়কি গলিয়ে আসা শীতল বায়ু সারা দিনের ক্লান্তি সত্ত্বেও দেহে সজীবতা ও পুলক জাগিয়ে তুলছিল। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উঁচু হওয়ার কারণে মে–জুনেও এখানকার তাপমাত্রা ছাব্বিশ থেকে ত্রিশ ডিগ্রীর মধ্যে বিরাজ করছিল। মানুষ ছায়ায় অবস্থান করলে এখানে মোটেও গরমের কষ্ট অনুভব করে না। হোটেলে যদিও এয়ার কণ্ডিশান বা পাখা ছিল না, কিন্তু জানালা খোলার পর কৃত্রিম শৈত্যের কোন প্রয়োজনই অনুভূত হয়নি।

ভোর চারটায় এখানে সুবহে সাদিক হচ্ছিল। তাই ফজরের পর আরও কিছু সময় ঘুমানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। সকাল সাড়ে ৬টায় পুনরায় ঘুম থেকে জেগে অভ্যাসমাফিক প্রাতঃভ্রমণে বের হই। সান'আর সর্ববৃহৎ মহাসড়ক 'শারে' সিত্তীন' হোটেলের সম্মুখ দিয়েই চলে গেছে। মহাসড়কের প্রান্ত ধরে দ্রুত পায়ে আধাঘন্টা পথ চলে আমার প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাসটি পুরা করি। হোটেলে ফিরে এসে নাস্তা শেষ করতেই আমার মেজবান জামেআর সমাবেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ী নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। জামেয়াতুল ঈমান এখান থেকে আনুমানিক দশ মিনিটের পথ। আমরা যখন জামেয়ার গেটে পৌঁছি, তখন জনসাধারণের ভীড়ের ফলে গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করা দুষ্কর হয়ে যায়।

জামেয়াতুল ঈমান

'জামেয়াতুল ঈমান' আরব দেশসমূহের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী গুরুত্বের অধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়। উপমহাদেশের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যায় প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারণা এখন আরব দেশসমূহে অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাদ দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষাদানের উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান এসব দেশে পাওয়া যায় না। তবে

জামেয়াতুল ঈমান আমার জানামতে আরব দেশসমূহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় না হওয়া সত্ত্বেও এত বৃহৎ পরিসরে ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জামেয়ার মহাপরিচালক শায়েখ আবদুল মাজীদ বিন আবদুল আজীজ যিন্দানী ইয়ামানের প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী আলেমদের অন্যতম। আফগান জিহাদের সূত্রে তিনি দীর্ঘদিন পাকিস্তানেও অবস্থান করেন। পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতার উপর তাঁর বিশেষ গবেষণা অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এক সময় তিনি ইয়ামানের পার্লামেন্টে পার্টির লীডার ছিলেন। প্রেসিডেন্টের পর প্রোটোকলের দিক থেকে সারাদেশের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় অবস্থানে। কিন্তু তিনি স্বীয় বিদ্যানুরাগের কারণে উক্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আজ থেকে সাত বছর পূর্বে জামেয়াতুল ঈমান প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে তিনি শিক্ষাদান কাজেই ব্যাপৃত রয়েছেন।

জামেয়াতুল ঈমানে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী কিছু বিষয় বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি এই জামেয়াকে নিছক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এটিকে আমল ও দাওয়াতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও বানানোর প্রয়াস চালান। সুতরাং এখানে ছাত্রদের ভর্তির নিয়মও সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ব্যতিক্রম। এখানে 'সানুবিয়ার' পর থেকে শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। যে সমস্ত ছাত্র ভর্তির একাডেমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাদেরকে ভর্তি করার পূর্বে ৪০ দিনের এক বাস্তবকর্ম ভিত্তিক পরীক্ষা কাল অতিক্রম করতে হয়। এ ৪০ দিন সময়ে তাদেরকে ওয়াজের মজলিসে অংশ নিতে হয়। জামাআতে নামায পড়ার বাধ্যবাধকতার সাথে সাথে তাদেরকে প্রতি রাতে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তে হয়। সপ্তাহে দু'দিন রোযা রাখতে হয়। প্রতিদিন যত্নসহকারে শারিরীক ব্যায়াম করতে হয়। ন্যূনতম পক্ষে একবার একঘন্টার বিরামহীন দৌড়ে অংশ নিতে হয়। উপরোক্ত সমস্ত বিষয়ে প্রত্যেক ভর্তিচ্ছুক তালিবে ইলমের জন্য নম্বর রয়েছে। যে সমস্ত ছাত্র এই চল্লিশদিন সময়ে কাঙ্খিত নম্বর লাভ করে কেবলমাত্র তাদেরকেই ভর্তির যোগ্য মনে করা হয়। তাই দেড় হাজার ছাত্র

ভর্তির জন্য দরখাস্ত করলে তার মধ্যে হাজার বারো শ' ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। উত্তীর্ণ হওয়ার পর উপরোক্ত নিয়মসমূহ বাধ্যবাধকতাপূর্ণ না হয়ে উৎসাহব্যাঞ্জক বিষয়ে পরিণত হয়। তবে শিক্ষা চলাকালীন বছরসমূহে দু' মাসের জন্য সমস্ত ছাত্রকে দেশের মফস্বল ও দূরবর্তী পাহাড়ী এলাকাসমূহে দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। এই দাওয়াতী ভ্রমণ পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত নয়। বরং এটিও পাঠ্যক্রমের অংশবিশেষ। যার মাধ্যমে ছাত্ররা জনসাধারণের সঙ্গে একীভূত হয়ে তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে অবহিত করার কাজ করে থাকে। বার্ষিক ছুটি পয়লা রমাযান থেকে ১০ই শাওয়াল পর্যন্ত এবং ঈদুল আযহার সময় দু' সপ্তার জন্য ছুটি হয়ে থাকে।

জামেয়ার পাঠ্যক্রম ৭ বছরের। তার প্রথম তিন বছর সমস্ত ছাত্রের জন্য একই রকম। তার মধ্যে তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ, উসূলে হাদীস, উসূলে ফেকাহ ও আরবী সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষাদান করা হয়। কুরআন হিফজ করা প্রত্যেক ছাত্রের জন্য আবশ্যকীয়। পরবর্তী চার বছরের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। তাতে ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞানসমূহের উচ্চতর শিক্ষাদান ছাড়া বিভিন্ন আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানের শিক্ষাদানও করা হয়। ছাত্রীদের শিক্ষাদানের জন্য পর্দাসহ পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। যে সমস্ত সন্তানধারিণী নারী দ্বীনী ইলম লাভ করতে ইচ্ছুক, তাদের সন্তানদের দেখাশোনার জন্যও একটি শাখা রয়েছে। সেখানে শিক্ষালাভকালীন সময় তাদের সন্তানদের পরিচর্যা করা হয়। ছাত্রীদের পক্ষ থেকে 'আশ্ শাকাইক' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। শিক্ষাদান ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা বিনামূল্যে। বর্তমানে জামেয়াতে পাঁচ হাজার ছাত্র শিক্ষাধীন রয়েছে। তারা ইয়ামানের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে এখানে শিক্ষালাভের জন্য এসেছে। তার মধ্যে সৌদী আরব, উপসাগরীয় দেশসমূহ ও বিভিন্ন আফ্রিকান দেশসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন ছাত্র পাকিস্তানের, আর একজন হিন্দুস্তানেরও রয়েছে। 'জামেয়াতুল ঈমান' এদিক থেকে উপমহাদেশের বড় বড় মাদরাসার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যে, এটি একটি প্রাইভেট শিক্ষাকেন্দ্র এবং এখানে শিক্ষাদান ও থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যয়ভার জামেয়া নিজে বহন করে থাকে। জনসাধারণের চাঁদা ছাড়া

এর নির্দিষ্ট কোন আমদানীর পথও নেই। কিন্তু পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যব্যবস্থার দিক থেকে এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

এ বছর ছাত্র–ছাত্রীদের প্রথম ব্যাচ সাত বছরের পাঠ্যক্রম সমাপন করছে। এ পর্যায়ে জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা শায়েখ আবদুল মাজীদ যিন্দানী একটি আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত করা সমীচীন মনে করেন। আজকের এই মহাসমাবেশ সে উদ্দেশ্যেই ছিল।

উপমহাদেশের মত এ ধরনের সাধারণ সভা–সমাবেশের ধারণা বেশীর ভাগ আরব দেশে পাওয়া যায় না। তবে জামেয়াতুল ঈমানের এই সভায় জনসাধারণের এত বড় সমাবেশ এবং তাদের আবেগ–উদ্যম উপমহাদেশের ধর্মীয় জলসার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। সমাবেশ হচ্ছিল মসজিদের সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত হলকক্ষে। কিন্তু হলকক্ষের চতুর্দিকে প্রচুর শ্রোতা খোলা আকাশের নীচে রোদে দাঁড়িয়ে ভাষণ শুনছিলেন।

ষ্টেজের প্রথম সারিতে বিশেষ মেহমানদের জন্য বহুদূর পর্যন্ত সোফাসেট পাতা ছিল। সেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী ইয়ামানের ভাইস প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্টের স্পিকার এবং বিভিন্ন মন্ত্রীবর্গ ছাড়াও সৌদী আরব, কুয়েত, মিসর, জর্দান, সিরিয়া, আমিরাত, সুদান, কাতার, পাকিস্তান ও ভারতের আলেমগণকে উপবেশন করানো হয়েছিল। এ সমস্ত দেশের আলেমদের মধ্যে শায়েখ ইউসুফ আল কার্জাভী, শায়েখ খলীফা জাসিম, শায়েখ আবদুর রাজ্জাক আসসিদ্দীক, ডঃ ইয়াসীন গজবান ও শায়েখ খালেদ হিন্দাভীর নাম এখন আমার স্মরণ আছে। পাকিস্তান থেকে আমি ছাড়া শ্রদ্ধেয় ভাই জনাব মাওলানা সামীউল হক সাহেব এবং জামায়াতে ইসলামীর আমির জনাব কাজী হুসাইন আহমাদ সাহেবও নিমন্ত্রিত হন। তাঁদের সঙ্গে সেখানে সাক্ষাত হয়। ভারত থেকে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)এর নাতি ডঃ সালমান নদভী সাহেবও তাশরীফ আনেন।

সাড়ে নয়টার সময় পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসা আরম্ভ হয়। তারপর জামেয়াতুল ঈমানের ব্যবস্থাপক ও ছাত্রদের ভাষণ হয়। তাতে জামেয়ার পরিচিতি ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। ইয়ামানের কতিপয় প্রখ্যাত আলেম ও বক্তা তাঁদের বক্তব্যে ভাষালংকারের চমক দেখান। সত্যিই ভাষণ–শিল্পের দিক থেকে এ

ভাষণগুলো ছিল বড় উঁচুমানের। এক ভদ্রলোক আরবীতে সুদীর্ঘ ও উঁচুমানের কবিতা পেশ করেন। উপস্থিতি এ সমস্ত ভাষণ ও কাব্যের প্রশংসায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনে হাততালি না দিয়ে বরং 'আল্লাহু আকবার' ও 'ওয়ালিল্লাহিল হামদ' (আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা)এর গগনবিদারী শ্লোগান দিচ্ছিলেন।

বহির্দেশীয় মেহমানদের মধ্য থেকে দু' ব্যক্তিকে ভাষণদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। একজন শায়েখ ইউসুফ আল কারজাভী আর দ্বিতীয়জন এই লেখককে। শায়েখ ইউসুফ আল কারজাভী জামেয়ার সূচনা থেকেই তার পাঠ্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়নে শামিল ছিলেন। তাই তিনি তাঁর ভাষণে জামেয়ার বৈশিষ্ট্যাবলী ও তার আবশ্যকতার উপর জোর দেন। সাথে সাথে ঐ শ্রেণীর লোকদের জোরালো প্রতিবাদ করেন, যারা ধর্মনিরপেক্ষতার আবেগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদানকে অনর্থক মনে করে এবং এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বদনাম রটানোর কোন সুযোগকে হাতছাড়া করে না।

শায়েখ কারজাভীর পর আমাকে ভাষণ দানের জন্য আহবান করা হয়। আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠের পর আমি নিবেদন করি যে, আজ এই প্রথমবার ইয়ামান এসে আমার দীর্ঘদিনের লালিত একটি মনোবাসনা পূর্ণ হল। ইয়ামান দেখার এবং ইয়ামানবাসীদের সঙ্গে নিকটে বসে সাক্ষাত করার বাসনা আমার পর্যটন ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং এর মূল কারণ হলো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামান ও ইয়ামানবাসীদের ঈমান ও হিকমতের পদক দানে ভূষিত করেছেন। তাই বিশ্বের অপরাপর লোক তাদের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, উন্নত শিল্পকলা ও জাঁকজমকপূর্ণ নগর ব্যবস্থার উপর গর্ব করুক, কিন্তু হে ইয়ামানবাসী! আপনাদের গর্বের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত এ আলোকদীপ্ত পদকই যথেষ্ট। এর চেয়ে বড় গর্বের আর কোন বস্তু হতে পারে না। কিন্তু এ মর্যাদা যত বড় গর্বের, তার দাবীও ততই নাজুক এবং তার দায়িত্বও ততই বৃহৎ। কাজেই ইয়ামানের জনসাধারণ, উলামা ও শাসকদের উপর এ দায়িত্ব বর্তায় যে, তাঁরা ঈমান ও হিকমাতকে প্রাচ্য ও

প্রতিচ্যে বিস্তার করার কাজে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করবেন। বিশ্ববাসীর সম্মুখে ঈমান ও হিকমাতের অপরূপ বাস্তব প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে ইসলামের ঐ সমস্ত দুশমনের মুখ বন্ধ করবেন, যারা ইসলামকে বিকৃতরূপে তুলে ধরে থাকে।

আমি নিবেদন করি যে, ইয়ামানের সঙ্গে ঈমানের অলংকার যেভাবে গ্রন্থিত রয়েছে, তার দাবীও এই যে, এখানে জামেয়াতুল ঈমানের ন্যায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেখানে ঈমান ও হিকমতের মূর্তপ্রতীক তৈরী করা হবে।

এই ভূমিকার পর আমি সংক্ষেপে ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করি, যেগুলোর প্রতি জামেয়া ও এখান থেকে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত।

শায়েখ আবদুল মাজীদ যিন্দানী—যিনি কার্পেটে স্থান সংকুলান না হওয়ায় নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে সাধারণ বিছানায় উপবিষ্ট ছিলেন—ষ্টেজে এসে জামেয়ায় তাঁর সাত বছরের পরিশ্রমের ফলাফল এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা বর্ণনা করেন। সর্বশেষ ভাষণ দান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী ইয়ামানের ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি তাঁর লিখিত ভাষণটি জনসাধারণের বাচন-ভঙ্গীতে পেশ করেন। তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বের স্বীকৃতিদানের সাথে সাথে সরকারের পক্ষ থেকে এর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার ঘোষণা করেন।

ভাষণদান শেষে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। শায়েখ আবদুল মাজীদ সনদপত্রের নাম 'শাহাদাত' বা 'ডিগ্রী' ইত্যাদি না দিয়ে নামকরণ করেছেন 'ইজাযাত'। তাঁর বক্তব্য হল, ডিগ্রী আধুনিক কালের আবিস্কার। পূর্বকালীন মহান বুযুর্গগণ ছাত্রদেরকে ডিগ্রী নয় বরং এজাযত তথা অনুমতিদান করতেন। তাই তিনিও এ সমস্ত সনদের নাম 'ইজাযত' রাখেন। সর্বোপরি এই সমাবেশের সর্বাধিক হৃদয় বিগলিতকারী দৃশ্য ছিল সেটি, যেটি শায়েখ আবদুল মাজীদ যিন্দানী শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের নিকট থেকে অঙ্গিকার গ্রহণকালে অবতারিত হয়। শিক্ষাসমাপনকারী শতাধিক ছাত্রের সকলে দেহে নীলবর্ণের সুদৃশ্য 'কাবা' এবং মস্তকে ছোট সুদৃশ্য পাগড়ী আচ্ছাদিত ছিলেন। অঙ্গিকার

গ্রহণকালে তাঁরা সকলে একসারিতে দাঁড়িয়ে যান। এটি বড় আবেগ উদ্দীপক ও প্রভাবশালী একটি অঙ্গিকারপত্র ছিল, যা শায়েখ আবদুল মাজীদ পাঠ করছিলেন আর শিক্ষাসমাপনকারী ছাত্ররা তা পুনরাবৃত্তি করছিলেন। এভাবে ছাত্রদের থেকে অঙ্গিকার গ্রহণ করা হয় যে, যে ইলম তাঁরা এতদিন শিখেছে, যতদূর সম্ভব তা তাঁরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তা অন্যদের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন। যখন ছাত্ররা এই অঙ্গিকার করছিলেন, তখন তাঁদের কারো কারো চক্ষু অশ্রুসিক্ত ছিল।

একটার দিকে মনোহরী এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। জনসাধারণের প্রচুর ভীড় হেতু বাইরে বের হয়ে গাড়ী পর্যন্ত পৌঁছা দুস্কর হয়ে পড়ে। প্রত্যেকে বহিঃর্দেশীয় মেহমানদের সঙ্গে মোসাফাহা করার ফিকিরে ছিল। তাদের মুখমণ্ডলে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের দ্বীপ্তি সুস্পষ্ট পাঠ করা যাচ্ছিল।

ইয়ামানের পার্লামেন্টের চেয়ারম্যান শায়েখ আবদুল্লাহ আল আহমার স্বগৃহে বহিঃর্দেশীয় মেহমানদের সম্মানে আজ দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। তাঁর বাসস্থানটি সানআ নগরীর মধ্যবর্তী এলাকায় একটি প্রাচীন ধাঁচের সুপ্রশস্ত হাবেলী ধরনের। বহিঃর্দেশীয় মেহমানগণ ছাড়াও ইয়ামান সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং নগরীর সম্মানিত লোক নিমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করেন।

অতিথিদের আতিথেয়তায় ইয়ামানের জাতীয় ঐতিহ্যসমূহ পরিপূর্ণ পরিস্ফুটিত ছিল। উপস্থিত সকলে ইয়ামানের জাতীয় পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত ছিলেন। যার অবশ্যম্ভাবী অংশরূপে ছিল সেই খঞ্জর, যা তাদের কোমরবন্ধনীতে ঝুলানো থাকে। এই খঞ্জরকে স্থানীয় ভাষায় 'জাম্বিয়া' বলা হয়। কারণ এটি এখানকার প্রত্যেকের কটিদেশে ঝোলানো থাকে। গোত্রীয় জীবনে এ হাতিয়ারটি সবাই নিজের সঙ্গে রাখত। বর্তমানে এর ব্যবহার শহুরে জীবনে পরিত্যক্ত হলেও তা ইয়ামানবাসীদের পোশাকের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এতে নিত্যনতুন কারুকার্য করা হয়। এক ভদ্রলোক বললেন, আমাদের নিমন্ত্রণকারী শায়খ আবদুল্লাহ আল আহমারের খঞ্জরটি এক লক্ষ

ইয়ামানী রিয়াল থেকে অধিক মূল্যবান। পোশাকের এই আঙ্গিক সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ইয়ামান ছাড়া ওমানেও গোচরীভূত হয়। তবে ওমানও মূলত প্রাচীন ইয়ামানেরই একটি অংশ ছিল। আহারের জন্য বসার ব্যবস্থা ছিল মেঝেয়। বড় একটি হলকক্ষের গালিচার উপর দস্তরখান বিছানো হয়েছিল। খাদ্যের আয়োজন ছিল পুরোটাই ইয়ামানী। ইয়ামানবাসীর মধ্যে ছাগল ও দুম্বার গোশত রান্না করার বহু বিচিত্র প্রকারের পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। সেসবের মধ্য থেকে অধিকাংশ প্রকারেরই আয়োজন করা হয়েছিল। আর বাস্তবিকই প্রত্যেক প্রকারের স্বাদও ছিল ভিন্নরকম। সাধারণতঃ আমরা যখন স্বদেশী খাবারে অভ্যস্ত হয়ে যাই, তখন ভিনদেশী কোন খাবার সুস্বাদু মনে হয় না। কিন্তু এই নিমন্ত্রণের সমস্ত খাবারই আমাদের রুচির দিক থেকেও বড় উন্নতমানের ছিল। ঘটনাচক্রে আমাদের নিমন্ত্রণকারী শায়খ আবদুল্লাহ আল আহমার আমার নিকটেই বসেছিলেন। তিনি তাঁর ঐতিহ্যবাহী আতিথেয়তার লক্ষ্যে পরিণত করেন আমাকে ও মাওলানা সামিউল হক সাহেবকে। আমাদের প্লেট তিনি বারবার পূর্ণ করছিলেন। বাধা দিলেও মানছিলেন না। সবশেষে বড় একটি থালাতে পরোটা সদৃশ একটি খাদ্যবস্তু আনা হয়। এটি ছিল ঘি দ্বারা তৈরী অনেক বড় একটি রুটি, যা সুবিস্তৃত থালায় বিস্তীর্ণ ছিল। তার উপর দিয়ে মধু গড়িয়ে পড়ছিল। শায়খ আহমার বললেন, এটি ইয়ামানের বিশেষ রুটি। একে 'বিন্তুস্ সহান' (থালকন্যা) বলা হয়। এটি ইয়ামানবাসীর অতি প্রিয় খাবার, যা বিশেষ বিশেষ দাওয়াতের ক্ষেত্রে তৈরী করা হয়। এর উপর যে মধু গড়িয়ে পড়ছিল তা খাঁটি মধু। যা ইয়ামানের বিশেষ উপঢৌকন।

যাই হোক, আমরা আসরের সময় উপভোগ্য এই নিমন্ত্রণ শেষ করে হোটেলে ফিরে আসি।

সন্আ নগরী

কিছু সময় হোটেলে বিশ্রাম করার পর মাগরিবের কিছু পূর্বে আমরা আমাদের পথপ্রদর্শক শায়খ হাসান আদেল আমীনের সঙ্গে সন্আ নগরীর কিছু স্মরণীয় স্থান দেখার জন্য বের হই। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মাওলানা সামীউল

হক সাহেবও সঙ্গে ছিলেন। গাড়ী আমাদের তিনজনকে নিয়ে সন্‌আর বিভিন্ন মহল্লা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে।

সন্‌আ পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরীসমূহের অন্তর্গত। তাতে প্রাচীনতার ছাপ আজও সুস্পষ্ট। কতিপয় ঐতিহাসিক লেখেন, এ নগরীর গোড়াপত্তন করেন হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নাতি গামদান বিন সাম। (মু'জামুল বুলদান লিল হামভী, পৃঃ ৮৪৩, খণ্ড–২)

নগরীটির প্রাচীন নাম ছিল 'আযাল'। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের জনৈক সন্তানের নামে এর নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে আবিসিনিয়ার অধিবাসী কিছু লোক এখানে এসে প্রস্তর নির্মিত এই শহর দেখে বলে 'সনআ', 'সন্‌আ'। আবিসিনীয়দের ভাষায় এর অর্থ 'এটি বড় মজবতু নগরী'। তখন থেকেই এই নগরীর নাম 'সনআ' প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

(মু'জামুল বুলদান লিল হামভী, পৃঃ ২৬, খণ্ড–৪)

এ নগরী বহুবিধ প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে এর উপর পারস্য সম্রাট কিস্‌রার আধিপত্য ছিল। কিসরার পক্ষ থেকে বাযান নামক একজন গভর্নর এখানে শাসন চালাত। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুসলমান হওয়ার তাওফীক দান করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকেই নিজের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

(আল ইসাবা, হাফেজ ইবনে হাজার কৃত)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের শেষ দিকে এখানে মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবীদার আসওয়াদে আনাসী বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অনেক লোক তার প্রতারণার জালে ফেঁসে যায়। অবশেষে সে হযরত বাযান (রাযিঃ)কে শহীদ করে সন্‌আ দখল করে। কিন্তু তার দখলদারিত্ব বেশীদিন টেকসই হয়নি। হযরত ফিরোজ দাইলামী (রাযিঃ)—যিনি ইয়ামানেরই অধিবাসী ছিলেন—আসওয়াদে আনাসীকে হত্যা করে সন্‌আকে তার হাত থেকে মুক্ত করেন। এ ঘটনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম রোগকালীন সময়ের। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ঘটনা অবহিত করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, আসওয়াদে আনাসী নিহত হয়েছে। ফিরোজ

দাইলামী (রাযিঃ) তাকে হত্যা করেছে।

(আল ইসতিয়াব, ইবনে আবদুল বার কৃত, পৃঃ ২০৪–২০৫, খণ্ড–৩)

তারপর থেকে এ নগরী মুসলমানদের হাতেই রয়েছে।

এখন আমাদের গন্তব্য সন্‌আর প্রাচীন নগরী। কিন্তু সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে আধুনিক নগরীর বিভিন্ন মহল্লা অতিক্রম করতে করতে মাগরিবের সময় হয়ে যায়। তাই আমরা পথের একটি মসজিদে নামায পড়ার জন্য যাত্রা বিরতি করি। আযান শেষ হওয়ার পরও মুয়ায্‌যিন মাইকে কিছু বাক্য পাঠ করছিল। কাছে গিয়ে অনুমিত হল যে, সে কিছু দু'আ পাঠ করছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এখানকার প্রচলন হল, মুয়াযযিন একামতের কিছু পূর্বে দু'আ পাঠ করে। দু'আ শেষে একামত বলে। এখানকার বেশীর ভাগ মসজিদেই এ প্রচলন রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে মানুষের কর্মপন্থা দেখে একথা যথার্থই অনুমিত হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) থেকে প্রমাণিত সুন্নাত তরীকার তো একই রূপ, তাই পৃথিবীর যে কোন ভূখণ্ডে যান না কেন, সেগুলোর সেই একই রূপ দেখতে পাবেন। কিন্তু বিদআত যেহেতু মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত, আর প্রত্যেক মানুষের মানসিকতা ভিন্নরূপ, তাই বিদআতসমূহও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পন্থায় প্রচলিত। একটি পন্থাকে একদেশে জরুরী মনে করা হয় এবং তা নিয়ে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়, অথচ তা অন্য দেশের লোকের জানাও থাকে না। সুতরাং একামতের পূর্বে উচ্চস্বরে দু'আ করার এ পন্থা আমি অন্য কোন মুসলিম দেশে দেখিনি।

মাগরিব নামাযের পর শায়খ আদেল আমাদেরকে নিয়ে একটি প্রাচীন মহল্লা অতিক্রম করেন, যা ছিল জীর্ণ ভবনসমূহের সমন্বয়। এখানের একটি মসজিদের পিছনে তিনি আমাদেরকে তালাবদ্ধ একটি কক্ষের সম্মুখে নিয়ে দাঁড় করালেন। যেখানে বহুদূর পর্যন্ত ঘোর অন্ধকার বিরাজ করছিল। তিনি বললেন, তালাবদ্ধ এই কক্ষের মধ্যে দু'টি কবর রয়েছে। তার একটি কবর হযরত ফারওয়া ইবনে মুস্‌ক (রাযিঃ)এর, আর অপরটি আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আল ওয়াযীর আস্‌ সান্‌আনী (রহঃ)এর।

হযরত ফরওয়া বিন মুস্‌ক (রাযিঃ) ঐ সমস্ত সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম, যাঁরা ৯ হিজরী বা ১১ হিজরী সনে ইয়ামান থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করেছিলেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে তাঁদের বনী মুরাদ ও বনী মুযহাজ গোত্রের জন্য নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। (আল ইসাবা, পৃঃ ২০৫, খণ্ড–৩)

এমনি তো সন্‌আয় আরো অনেক সাহাবায়ে কেরামই সমাহিত হয়েছেন, তবে শায়খ আদেল বললেন যে, তার মধ্য থেকে কেবলমাত্র হযরত ফারওয়া বিন মুস্‌ক (রাযিঃ)এর কবর এখানে প্রসিদ্ধ। তাঁর নামেই অদূরবর্তী মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে 'মসজিদে মুস্‌ক'। বরং পুরো মহল্লাটিকেই 'মুস্‌ক' বলা হয়ে থাকে। কবরের এ কক্ষটি তালাবদ্ধ ছিল। তবে অদূরেই কিছু শিশু খেলা করছিল। তারা যখন দেখল যে, বাইরের কিছু লোক তালাবদ্ধ এই দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তখন একটি শিশু কোথাও থেকে কক্ষের চাবি এবং একটি টর্চ নিয়ে এল। তালা খোলা হলে ভিতরে কক্ষের পরিবর্তে একটি গুহার ন্যায় দেখা গেল। টর্চের আলোতে দু'টি কবর দৃষ্টিগোচর হল। এখানে সালাম পেশ করার ও ফাতেহা পাঠ করার তাওফীক হল।

দ্বিতীয় কবরটি ছিল আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল ওয়াযীর আস সন্‌য়ানী (রহঃ)এর। তিনি অষ্টম বা নবম হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত আলেমদের অন্যতম। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তবে তার মধ্যে 'আল আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফিযযাব্বি আন্ সুন্নাতি আবিল কাসিম' এবং 'আর রাওযুল বাসিম' অত্যাধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। তিনি হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ)এর সমসাময়িক। তাঁর পুরো পরিবার ছিল 'যায়দী'। হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) তাঁর ভাই আল্লামা হাদী বিন ইবরাহীম আল ওয়াযীরের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর সম্পর্কেও দু' লাইন লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে,

مقبل على الاشتغال بالحديث، شديدى الميل الى السنة بخلاف اهل بيته

"তিনি হাদীস শাস্ত্রের লিপ্ততায় পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন এবং স্বীয় পরিবারের বিপক্ষে তিনি সুন্নাতের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন।"

হাফেজ সাখাভী (রহঃ) 'আয্ যাওউল লামে' গ্রন্থে তাঁর প্রশংসা করে বলেন যে, তিনি যায়েদী মতবাদের প্রত্যাখ্যানে 'আল আওয়াসেম ওয়াল কাওয়াসেম' গ্রন্থ রচনা করেন। তবে হাদীস ও ফেকাহ্‌র ক্ষেত্রে তিনি নিজেই ইজতিহাদ করতেন। ইমাম চতুষ্টয়ের কারো ফেকাহ্‌র অনুবর্তী ছিলেন না। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) কমবেশী তাঁরই পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি তাঁকে 'মুজতাহিদে মুতলাক' আখ্যা দেন। তিনি তাঁর জ্ঞান-গরিমা বর্ণনায় অসাধারণ শব্দমালা প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন—

والذى يغلب على الظن ان شيوخه لو جمعوا جميعا فى ذات واحدة لم يبلغ علمهم الى مقدار علمه، وناهيك بهنا.... ولو قلت: ان اليمن لم تنجب مثله لم ابعد عن الصواب.

অর্থ ঃ আমার প্রবল ধারণা এই যে, তাঁর সকল ওস্তাদকে একটি সত্তায় সমবেত করা হলে তাঁদের সকলের জ্ঞান তাঁর জ্ঞানের সমপরিমাণে পৌঁছতে পারবে না। আর এতটুকু বলাই যথেষ্ট.... আমি যদি বলি ইয়ামান তাঁর মত অন্য কাউকে জন্ম দেয়নি তাহলে তা অত্যুক্তি হবে না, বরং যথার্থই বলা হবে।

(আল বাদরুত তালী, শাওকানী কৃত পৃঃ ৯২, খণ্ড-২)

তাঁর দীর্ঘ একটি সময় সমকালীন লোকদের সঙ্গে জ্ঞানবিষয়ক বিতর্কে অতিবাহিত হয়েছে। তবে শেষকালে তিনি নিজেকে ইবাদতের কাজে নিযুক্ত করেন। তিনি নির্জনতা অবলম্বন করে ইবাদতে রত থাকেন। জীবনের যে অংশ সমকালীন লোকদের সঙ্গে বিতর্কে অতিবাহিত হয়েছিল তার জন্য তিনি আক্ষেপ করতেন।

(আল বাদরুত তালি', শাওকানী কৃত পৃঃ ৯২, খণ্ড-২)

এখান থেকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর প্রাচীন সনআ নগরীর নগর-প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। প্রাচীরের একটি ফটক দিয়ে কার ভিতরে প্রবেশ করে। আমাদের মনে হতে লাগল, যেন আমরা কয়েক শতাব্দী পূর্বের একটি নগরীতে প্রবেশ করেছি। প্রাচীরঘেরা নগরী এখনও

পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে রয়েছে। আমার সেগুলো দেখারও সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এ প্রাচীরঘেরা নগরীটি এদিক থেকে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে, এটি এখনও যথারীতি জীবন্ত একটি নগরীরূপে বিদ্যমান রয়েছে। বরং এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুবিন্যাস আমার নিকট সনআর আধুনিক নগরী থেকেও অধিক মনে হয়। পাথর বা ইট দ্বারা নির্মিত সড়ক ও গলিপথসমূহ ধরণ-ধারণে প্রাচীন বলে মনে হলেও দৃঢ়তা ও উজ্জ্বলতায় তার উপর প্রাচীনতার কোন ছাপ পরিলক্ষিত হয় না।

প্রাচীরঘেরা এই নগরীতে আমাদের মূল গন্তব্য ছিল এখানকার সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রাচীন মসজিদ 'আল জামে' আল কাবীর'। আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম, তখন এশার আযান হচ্ছিল। এ মসজিদটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কথিত আছে যে, হযরত বাযান (রাযিঃ)—যাঁকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সনআর গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন—এখানে তাঁর একটি বাগান ছিল। বাগানটি তিনি মসজিদের জন্য ওয়াকফ করেন। তবে মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য অপর একজন সাহাবী হযরত ওয়াবার বিন ইয়াহনাস (রাযিঃ) লাভ করেন। তিনি দশম হিজরী সনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হন। তাঁর ফেরার কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সনআয় মসজিদ তৈরী করার নিদের্শ দেন। তিনি সনআয় এসে এখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। (আল ইসাবা, পৃঃ ৬৩০, খণ্ড-৩)

এখন তো এ মসজিদ বিস্তর আয়তনে বিস্তৃত। তার একটি হল কেবলার দিকে, আরেকটি হল পিছন দিকে। উভয় হলের মাঝে সুবিস্তৃত একটি আঙ্গিনা। পিছন দিকের হলে দু'টি স্তম্ভ রয়েছে। তার একটির উপর 'মানকুরা' আর দ্বিতীয়টির উপর 'মাসমুরা' লিপিবদ্ধ রয়েছে। স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশ সেই মসজিদ, যা হযরত ওয়াবার বিন ইয়াহনাস (রাযিঃ) নির্মাণ করেছিলেন।

আমরা ইশার আযানের পর মসজিদে প্রবেশ করি। নতুনভাবে অযু করার জন্য অযুখানার দিকে অগ্রসর হয়ে দেখতে পাই যে, অযুখানার নল এবং আমাদের মাঝে একটি হাউজ প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। যা

অতিক্রম না করে নলের নিকট পৌঁছা সম্ভব নয়। মানুষ ঐ হাউজের মধ্য দিয়েই অবাধে আসা–যাওয়া করছিল। আমরা নল পর্যন্ত পৌঁছার জন্য শুকনো কোন পথ তালাশ করলাম কিন্তু পেলাম না। অবশেষে আমাদের পথপ্রদর্শক বললেন, আপনারা মোজা ইত্যাদি খুলে ঐ হাউজের মধ্যে পা রেখে চলে আসুন। আমরা অপ্রত্যাশিত এ পরিস্থিতির কারণে মূর্ত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই পথপ্রদর্শকের নির্দেশ পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আমরা পানিতে পা রাখি, গোছার এক চতুর্থাংশ পানির মধ্যে হেঁটে অপর প্রান্তে পৌঁছি। সেখানে নল দ্বারা অযু করে পুনরায় ঐ হাউজ অতিক্রম করে মসজিদে প্রবেশ করি। পরবর্তীতে জানতে পারি যে, এ ব্যবস্থা এজন্য করা হয়েছে যে, অযুখানায় অযু করার পর মানুষ যখন খালি পায়ে হেঁটে আসে, তখন ভেজা মেঝের উপর কোন ময়লা থাকতে পারে বিধায় সতর্কতা স্বরূপ মসজিদের প্রবেশ পথে এ হাউজ তৈরী করা হয়েছে, যেন প্রত্যেকে জোর–জবরদস্তি হাউজে পা ভিজিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।

যাই হোক! প্রাচীন এ মসজিদে নামায পড়ার এক স্বাদই ছিল অপূর্ব। নামাযান্তে ইমাম সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি মসজিদের বিভিন্ন অংশ অত্যন্ত মুহাব্বতের সঙ্গে ঘুরে দেখান। এটি এমন একটি মসজিদ, যেখানে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ), তাবেঈন ও বুযুর্গানে দ্বীন (রহঃ) নামায পড়েছেন। যেখানে বড় বড় মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আলেমদের শিক্ষাদানের মজলিস বসেছে। এ মসজিদের পরিবেশে সে সমস্ত বুযুর্গের পবিত্র আত্মাসমূহের সুরভি আজও ছড়ানো অনুভূত হয়। ইয়ামান বড় বড় আলেমদের কেন্দ্র ছিল বিধায় অন্যান্য এলাকার আলেমগণও এখানকার আলেমদের থেকে জ্ঞানার্জানের জন্য সফর করে ইয়ামানে আসতেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)এর এ উক্তি তো প্রসিদ্ধই রয়েছে যে—

لا بدمن صنعاء و ان طال السفر

অর্থঃ "পথ যত দীর্ঘই হোক না কেন,সনআ না গিয়ে গত্যন্তর নেই।"

সুতরাং সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আবদুর রাজ্জাক সনয়ানী (রহঃ)এর নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি সনআ ভ্রমণ করেন এবং

দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করেন।

এ মসজিদ সংলগ্ন একটি গ্রন্থাগারও রয়েছে। সেখানে প্রাচীন হস্তলিখিত বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি রয়েছে। রাতের বেলায় গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা ইশার নামায পড়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসি। শায়খ আদেল তাঁর বাড়ীতে নৈশভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে আরো অনেক আলেমকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে রাতের খাবার খাই। আলেমদের সঙ্গে সেখানে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মনোমুগ্ধকর মজলিস চলতে থাকে। রাত এগারোটার দিকে আমরা হোটেলে পৌঁছতে সক্ষম হই।

সনআ থেকে প্রায় আড়াইশ' কিলোমিটার দূরে কওমে সাবা এর প্রসিদ্ধ 'মাআরিব' এলাকা। যেখানে সেই বাঁধের (সাদ্দে মাআরিব) কিছু নিদর্শন এখনও অবশিষ্ট আছে বলে লোকে বলে, যার দিকে পবিত্র কুরআন সুরায়ে 'সাবা'র মধ্যে ইঙ্গিত করেছে। আমার সেখানেও যাওয়ার বাসনা ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, রোববার বিকেলে আমার দেশে ফেরার জন্য বিমান বুক করা ছিল। অপরদিকে বিকাল নাগাদ সেখান থেকে ফেরা সম্ভব হবে কিনা তাতে সন্দেহ ছিল। শায়খ আবদুল মাজীদ যিন্দানী বললেন, আমার দিল চায় আপনি সেখানে যান। কিন্তু বিবেক বাধা দেয়। কারণ, পথ বেশ দুর্গম। তাছাড়া বিকাল নাগাদ ফিরতে পারবেন কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। আর ফিরতে পারলেও আমার আশংকা হয় যে, আপনি তখন বড় ক্লান্ত থাকবেন। এমতাবস্থায় সম্মুখবর্তী সফর আপনার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমি মাআরিবের বাঁধ দেখার জন্য ইয়ামানে আরো সময় অবস্থান করতাম, কিন্তু পরেরদিন প্রত্যাবর্তনের জন্য কোন বিমান ছিল না, তাই ফিরতে কয়েকদিন দেরী হয়ে যাবে। আর সে সময় আমার হাতে ছিল না। তাই আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রোগ্রামটি স্থগিত করি। তবে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মাওলানা সামীউল হক সাহেব এবং জামায়াতে ইসলামীর আমীর কাজী হুসাইন আহমাদ সাহেবকে অধিক সময় সেখানে অবস্থান করতে হবে বিধায় তাঁরা সেখানে যান।

'মাআরিবে'র পরিবর্তে সকালবেলা আমি এখানকার যাদুঘর, হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির গ্রন্থাগার এবং 'জরওয়ান' এলাকা দেখার প্রোগ্রাম

বানাই। সর্বপ্রথম আমরা সনআ নগরীর প্রাচীন যাদুঘর দেখতে যাই। যাদুঘরটি ইয়ামানের আলেম শাসক শায়খ মুরতজা কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদ সদৃশ একটি ভবনে অবস্থিত। তাতে ইয়ামানের বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। তার মধ্যে 'সাবা' জাতি ও 'হিমইয়ারে'র নিদর্শনসমূহ ছাড়া ইসলামী যুগের বহুবিধ স্মৃতি সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু আফসোস! অনেকগুলো প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মারক সম্পর্কে জানতে পারলাম যে, তা বিভিন্ন ভিনদেশী (বরং বিধর্মী) ব্যক্তি বা যাদুঘরের নিকট বিক্রি করা হয়েছে।

যাদুঘর থেকে বের হয়ে আমরা সনআর প্রাচীন প্রাচীরঘেরা নগরীর ফটকে এসে পৌঁছি। ফটকটি আজও জাঁকজমকপূর্ণ। সম্ভবতঃ এটিই সেই ফটক, খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে পরিখা খননের সময় যেটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখানো হয়েছিল এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, পৃথিবীর এই প্রাচীন নগরীটিও ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে আসবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, তাবরানীর উদ্ধৃতিতে)

হাদীস শরীফে 'উতরুয' নামক একটি ফলের উল্লেখ এসেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তার স্বাদ উৎকৃষ্ট এবং গন্ধও উত্তম। যে ব্যক্তি নিজের ইলম দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌঁছায় তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'উতরুজ' ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমি জেনেছিলাম যে, 'উতরুজ' ইয়ামানে উৎপন্ন হয়। তাই আমি শায়খ আদেলকে অনুরোধ করে বলেছিলাম, ফলটি বাজারে পাওয়া গেলে আমি সাথে নিয়ে যাব। তিনি এখানে গাড়ী থামিয়ে বাজারে ফলটি তালাশ করলেন। জানা গেল যে, এখনও তার পূর্ণ মৌসুম আরম্ভ হয়নি। তবে এক লোক কিছু কাঁচা 'উতরুজ' নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। শায়খ আদেল 'উতরুজ' কেমন তা দেখার জন্য একটি ফল তুলে নিলেন। কাঁচা হওয়ার ফলে তার মধ্যে পরিপূর্ণ স্বাদ এখনও হয়নি, তারপরও কিছু স্বাদ হয়েছে। তবে এমতাবস্থায়ও তার সুগন্ধ ছিল বড় চমৎকার। পাকার পর তার স্বাদ ও সুগন্ধ উভয়ই যে আরো চমৎকার হবে তা নিশ্চিত।

যোহরের নামায আমরা আরেকবার 'জামেয়ুল কাবীরে' পড়ি।

নামাযান্তে অবিলম্বে পাণ্ডুলিপির গ্রন্থাগার ঘুরে দেখি। এতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল হস্তলিখিত পবিত্র কুরআনের কপিটি। এই কপি সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি হযরত আলী (রাযিঃ), হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাযিঃ) এবং হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লিখিত হয়। একথাও প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এটি ঐ সমস্ত কপির একটি, যা হযরত উসমান (রাযিঃ) লিখিয়ে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে পাঠিয়েছিলেন। আর এ কপিটি পাঠিয়েছিলেন সনআয়। যদিও এ কথার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই তবে এখানকার জ্ঞানীজনদের বক্তব্য হল, প্রাচীনকাল থেকে সনআবাসীদের মধ্যে এ বর্ণনাটি স্বতঃসিদ্ধরূপে বর্ণিত হয়ে আসছে। কপিটির শেষে লেখকের নাম আলী বিন আবু তালিব লিখিত রয়েছে। যার কারণে কেউ কেউ এ সংশয় প্রকাশ করেছে যে, এই লেখক হযরত আলী (রাযিঃ) নন, বরং অন্য কেউ। কারণ, যদি লেখক হযরত আলী (রাযিঃ) হতেন তাহলে 'আলী বিন আবি তালিব' লিখতেন। কিন্তু ইয়ামানের কতিপয় আলেম বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাযিঃ) নিজেকে নিজে ইবনে আবু তালিব লেখার বিষয়টি অন্য কিছু সূত্রেও প্রমাণিত রয়েছে এবং বৈকারণিকভাবেও এর ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

এ গ্রন্থাগারে প্রথম হিজরী শতাব্দী থেকে নিয়ে চতুর্থ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত পবিত্র কুরআনের অনেকগুলো কপি সংরক্ষিত রয়েছে। তার বেশীর ভাগ হরিণের চামড়ার উপর লিখিত। তবে দেখতে তা উন্নতমানের কাগজ বলে মনে হয়। কপিগুলোর কিছু 'কুফী' বর্ণলিপিতে, কিছু 'হিময়ারী' বর্ণলিপিতে আর কিছু 'নুসখ' লিপিতেও রয়েছে। অনেক সুপ্রসিদ্ধ আলেমের স্বহস্তে লিখিত গ্রন্থসমূহও এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। তার মধ্যে হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ)এর লেখাও রয়েছে। তবে গ্রন্থকারদের মূললিপিতে লিখিত গ্রন্থসমূহ জীর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে সেগুলো পৃথক আলমারিতে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। দর্শনার্থীরা তার ফটোকপি দেখতে পারে মাত্র।

'জামইয়্যাতুল ইসলাহ' যোহরের পর নিমন্ত্রিতদের সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করে। সনআ নগরীর উভয় পাশে পাহাড় রয়েছে।

তার একটিকে 'আইবান' আর অপরটিকে 'নকম' বলে। 'আইবান' পাহাড়ের উপর ছোট একটি বিনোদন কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে একটি রেস্তোরাঁও রয়েছে। মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা সেই রেস্তোরাঁতেই অপূর্ব পরিবেশে করা হয়েছিল। জুন মাসের দুপুর দু'টা বেজেছিল, কিন্তু এখানকার আলো-বাতাসে এক অপূর্ব শৈত্য বিরাজ করছিল। সমস্ত মেহমান উপভোগ্য সেই পরিবেশে খুবই পরিতৃপ্ত হন।

'আসহাবুল জান্নাহর' অবস্থানস্থল 'যরওয়ানে'

সনআ নগরী থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে 'যরওয়ান' নামে একটি জায়গা রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনাসূত্রে জানা যায় যে, পবিত্র কুরআনের সূরা 'কলামে' 'আসহাবুল জান্নাহ'র যেই ঘটনা বিবৃত হয়েছে, তা 'যরওয়ানে' ঘটেছিল। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই যে, একজন সৎ ও খোদাভীরু ব্যক্তি নানা জাতের ও বিচিত্র প্রকারের ফলবৃক্ষের সুবিস্তীর্ণ বাগান লাগিয়েছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, যখন কোন ফল কাটার সময় হত, তখন তিনি সর্বপ্রথম বাগানের ফল নিজ এলাকার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এতে করে বাগানের উৎপাদিত ফসলের বড় একটি অংশ দরিদ্রদের পিছনে ব্যয় হত।

যখন সেই ব্যক্তির মৃত্যু হল এবং বাগান তার অযোগ্য সন্তানদের হাতে চলে গেল, তখন ছেলেরা বলতে লাগল যে, আমাদের আব্বা বোকা ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। ফলে বাগানের ফসলের বড় একটি অংশ অন্যদের মধ্যে বিতরণ করতেন। আমরা নির্বুদ্ধিতার এই কাজটিকে চলতে দেবো না। সুতরাং ফসল কাটার সময় হলে তারা এমন ব্যবস্থা নিল যে, কোন দরিদ্র মানুষ যেন বাগানের নিকটেও ভীড়তে না পারে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে তারা রাতে ঘুমাল। সকালবেলায় সম্পদের নেশায় একথা চিন্তা করে বাগানের দিকে রওয়ানা হল যে, আজ আমরা কাউকে ভাগ না দিয়ে বাগানের সম্পূর্ণ ফসল দ্বারা কেবল আমরাই উপকৃত হব। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মন্দ নিয়তের ফলে তাদেরকে এ শাস্তি প্রদান করেন যে, রাতারাতি সম্পূর্ণ বাগানটি ধ্বংস হয়ে যায়। যখন এরা

সকালে বাগানে গেল, তখন সেখানে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

পবিত্র কুরআন ঘটনাটিকে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছে। কিন্তু এ কথা পরিষ্কার উল্লেখ করেনি যে, ঘটনাটি কোথায় ঘটেছিল। যদিও কতিপয় লোক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এটি আবিসিনিয়ার কোন এক জায়গার ঘটনা। কিন্তু বেশীর ভাগ মুফাসসিরের বক্তব্য হল, এ ঘটনাটি ইয়ামানে ঘটেছিল। হাফেজ ইবনে কাসীর (রহঃ) প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন—

كانوا من قرية يقال لها : ضروان على ستة اميال من صنعاء

অর্থ ঃ "এরা 'যরওয়ান' নামক জনপদের অধিবাসী ছিল, যা সনআ থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।"

(তাফসীরে ইবনে কাসির, পৃঃ ৪০৬, ভলিউম–৪)

'যরওয়ান' নামক জনপদটি বর্তমানেও সনআ থেকে কিছু দূরে অবস্থিত। এখানকার আলেমগণ বলেন যে, ইয়ামানে এ বিষয়টি ব্যাপক প্রসিদ্ধ যে, এটিই সেই জনপদ, যেখানকার ঘটনা পবিত্র কুরআন ' সূরা আল কলামে' বর্ণনা করেছে। আমার মনে ইচ্ছা জাগল যে, ইয়ামান থেকে যাওয়ার পূর্বে 'যারওয়ান' জনপদের সেই শিক্ষণীয় স্থানটিও দেখে যাই, পবিত্র কুরআন অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে যার বর্ণনা দিয়েছে।

সন্ধ্যা আটটায় আমার ফিরতি বিমান। আমার মেজবান আমার টিকিট ও পাসপোর্ট নিয়ে পূর্বেই বিমানবন্দরে পৌছার ওয়াদা করেছিলেন। তাই আমি ভাবলাম অবসর এ সময়টিকে কাজে লাগিয়ে 'যরওয়ান' দেখে যাই। সুতরাং আসর নামাযের পর সাড়ে পাঁচটার দিকে আমরা হোটেল থেকে রওয়ানা হই। ডঃ সালমান নদভী সাহেবও আমার সঙ্গে ছিলেন। বিমানবন্দরগামী সড়ক থেকে যখন আমরা যরওয়ানগামী সড়কে মোড় নেই, তখন সম্মুখের দিগন্তে সূর্য ঢলে পড়েছিল। আর তৎসংলগ্ন একটি পাহাড় দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। শায়খ আদেল বললেন, এটি 'যইন' পাহাড়। তিনি নির্ভরযোগ্য ওস্তাদদের নিকট শুনেছেন যে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওয়াবার বিন ইয়াহনাস (রাযিঃ)কে সনআ নগরীতে মসজিদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি একথাও বলেছিলেন যে, 'যইন' নামক পাহাড়ের দিকে তার

কেবলা রাখবে। এখন সূর্যের দিক থেকেও বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল যে, কেবলা ঠিক 'যইন' পাহাড়ের দিকে অবস্থিত।[১]

সনআ নগরী থেকে বের হওয়ার পর সড়কের উভয় দিকে ছোট ছোট পাহাড় এবং সেগুলোর মাঝখানে প্রশস্ত উপত্যকাসমূহ দেখা যাচ্ছিল। উপত্যকাসমূহে একই ধরনের ক্ষেত সুদূর বিস্তৃত ছিল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এগুলো 'কাত' বৃক্ষ। 'কাত' একপ্রকারের ঘাসের নাম। তার পাতা হয় লম্বা লম্বা। ইয়ামানবাসীর এটি একটি দুর্বলতা যে, পান, তামাক, ... এর মত কাত চাবানোও তাদের একটি অভ্যাস। যার কারণে তারা মারাত্মক সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। কারো কারো ধারণা এতে হালকা নেশাও রয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের বক্তব্য, এগুলো নিছক শরীরে ফুর্তি আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে পান, তামাক ও ..... এর বিপরীতে এর বৈশিষ্ট্য এই যে, পান ইত্যাদি হাঁটাচলা অবস্থায় ও কাজের মাঝেও খাওয়া যায়, কিন্তু কাত সেবনের পিছনে অনেক সময় ব্যয় হয়। তাই ইয়ামানবাসী সাধারণতঃ আহারের পর কাত মুখে নিয়ে বসে যায় এবং ঘন্টা–ঘন্টা সময় এর পিছনেই ব্যয় করে। কতিপয় আলেম 'কাত'কে নেশাকর আখ্যা দিয়ে নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম একে নেশাকর বলে স্বীকার করেন না বটে, তবে সময় ও সম্পদ অপচয় হয় হেতু এ থেকে বারণ করেন। জানতে পারলাম যে, কাতের মূল্য অনেক বেশী। আমাদের সম্মুখে কাতের যে বিস্তৃত ক্ষেত রয়েছে, এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক শক্তিশালী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রায় আধাঘন্টা সময় পথচলার পর গাড়ী যরওয়ানের সীমানায় প্রবেশ করে। এখানে ছোট একটি বাজার রয়েছে। 'আসহাবুল জান্নাহর' বিশেষ সেই জায়গাটি জনবসতি থেকে আরো সম্মুখে। তাই আমরা

---

১. পরবর্তীতে এ বর্ণনাটি আমি পেয়ে যাই। ইবনুস সাকান ও ইবনে মান্দাহ, আবদুল মালিক বিন আবদুর রহমান আয্ যামারী এর সূত্রে বর্ণনা করেন—ওয়াবার বিন ইয়াহনাসই হলেন সেই সাহাবী, যাঁকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং মসজিদের কেবলা যইন পাহাড়ের দিকে বানানেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সেখানকার লোকদের নিকট ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হই। একটি পাহাড় অতিক্রম করে নীচে নামতেই একটি বিস্ময়কর শিক্ষণীয় দৃশ্য আমাদের সম্মুখে দেখতে পাই। আর তা হল এ পর্যন্ত যে এলাকা আমরা অতিক্রম করে এসেছি, তাতে পাহাড় ও ক্ষেতের মাটি স্বভাবমাফিক মাটিরঙা ছিল, কিন্তু সেই জায়গাটি ছিল সম্পূর্ণ কালো, যেখানকার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এখানেই সেই বাগান ছিল, যা আল্লাহ প্রদত্ত আযাবের ফলে ধ্বংস হয়েছে। এ জায়গাটি শুধু কালোই ছিল না, বরং জমিনের মধ্যে কালো কাঁটার মত এত অধিক পরিমাণ পাথরও দেখা যাচ্ছিল, যার উপর দিয়ে হাঁটাও দুষ্কর ছিল। যদিও কালো পাথরের জমি পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডেও পাওয়া যায় (পবিত্র মদীনার আশেপাশেও 'হাররা' নামে এমন কিছু জমি রয়েছে)। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণের এই জমিনের ধরন সেগুলো থেকে ভিন্নতর ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন, এখানে মারাত্মক আগুন লেগেছিল, যা পুরো এলাকাটিকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে। অনেক বিস্তৃত ও প্রশস্ত এলাকা সেই আগুনে আক্রান্ত হয়েছে। আশপাশের এলাকাসমূহেও যেহেতু অন্য কোন জমিন এ ধরনের নেই, তাই বাহ্যতঃ মনে হয় যে, এগুলো আযাবেরই নিদর্শন। যা শত শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজও শিক্ষণীয় হয়ে আছে।

পবিত্র কুরআন কর্তৃক বর্ণিত একটি শিক্ষণীয় স্থান দেখার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি বটে, কিন্তু এই পরিবেশে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করার সাহস আমাদের হল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযাবের স্থানসমূহ থেকে দ্রুত চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে করতে আমরা এখান থেকে চলে আসি।

বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে জামেয়াতুল ঈমানের পরিচালক শায়খ আবদুল ওয়াহাব সবান্ধবে আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। বিমানের সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তাঁরা আমাদেরকে 'আল বিদা' জানালেন। দু' দিনের সংক্ষিপ্ত অবস্থানের পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া বহন করে আমরা ইয়ামানীয়া এয়ারলাইন্সের বিমানে আরোহণ করি।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

ইয়ামানে আমাদের অবস্থানকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে অনেক বাসনা অপূর্ণ থাকার আক্ষেপও রয়ে যায়। আমি 'মাআরিব' যেতে পারিনি। তাছাড়া ইয়ামানের আরো কিছু এলাকাতেও যাওয়ার বাসনা ছিল। বিশেষ করে যে এলাকায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ) এবং হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাযিঃ)কে শাসক ও শিক্ষক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে যাওয়ার সবিশেষ আগ্রহ ছিল। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, সেই এলাকাটি ছিল দুই জেলা বা দুই প্রদেশের সমন্বয়ে। (হাদীসে এর জন্য 'মাখলাফ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) এই পৃথক ভূখণ্ড দু'টি 'জুন্দ' ও 'যুবায়েদ' নামে আজও প্রসিদ্ধ রয়েছে। 'জুন্দ' ছিল হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)এর কেন্দ্র। সেখানে তাঁর নির্মিত মসজিদ আজও বিদ্যমান। আর 'যুবায়েদ' হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাযিঃ)এর মাতৃভূমিও ছিল এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সেখানকারই শাসক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। ইয়ামানের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর 'হাযরামাউত'। হযরত ওয়ায়েল বিন হাজার (রাযিঃ) সেখানকারই অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু এ তিনটি জায়গাই সনআ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এগুলো দেখার জন্য পৃথক সময়ের দরকার ছিল।

আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইয়ামান বহু বড় এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীতে ইয়ামান বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। যার বড় একটি অংশ 'ওমান' রাজ্য। যা নিজেই আরব উপদ্বীপের বড় একটি দেশ। (গত মাসে আমি সেখানেও গিয়েছি)। ইয়ামানেরই একটি অংশ 'নাজরান'। বর্তমানে তা সৌদী আরবের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় একটি অংশ 'আদন'। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তা বৃটেনের শাসনাধীন ছিল। পরবর্তীতে তা দক্ষিণ ইয়ামান নামে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের রূপ নিয়েছিল। সেখানে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে তা পুনরায় ইয়ামানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইয়ামানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত তার

ফযীলতের কারণে তার সঙ্গে একজন মুসলমানের হৃদ্যিক সম্পর্ক সহজাত বিষয়। বাস্তবেও ইয়ামানের সাধারণ পরিবেশে ধার্মিকতার বহিঃপ্রকাশ অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট ভাস্বর। সাধারণতঃ সেখানকার লোকদের মধ্যে নামায-রোযার গুরুত্ব, সদাচরণ ও আতিথেয়তার গুণাবলী সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। নারীদের মধ্যে পর্দার গুরুত্ব এখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আমি আমার অবস্থানকালে সড়ক ও বাজারে একজন নারীকেও পর্দাহীন অবস্থায় দেখিনি। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক 'যায়েদী'। যাদের মধ্যে শিয়াদের হালকা ছাপ রয়েছে। এরা হযরত আলী (রাযিঃ)এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা। তবে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকেও পূর্ণ সম্মান দিয়ে থাকে। কারো সাথে গোস্তাখী করে না। তাদের ফিকহী পন্থা হানাফী মাযহাবের বেশ নিকটবর্তী। ইয়ামানে যায়েদীরা ছাড়া বিরাটসংখ্যক শাফেঈ মাযহাবের লোকেরও বাস রয়েছে এবং বহু সংখ্যক লোক আল্লামা শাওকানী (রহঃ)এর কর্মপন্থার অনুসারী। তবে কোনরূপ দলীয় সাম্প্রদায়িকতা বা মাযহাব ভিত্তিক কলহের মানসিকতা সাধারণভাবে এখানে নেই। সবাই নিজ নিজ মাযহাবমত স্বাধীনভাবে আমল করে থাকে এবং পরস্পরে ঐক্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে থাকে।

পূর্বকালে ইয়ামানের শাসকও আলেম হতেন। কিন্তু যখন থেকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকে তাদের ঝোঁক পাশ্চাত্যমুখী। দেশের জনসাধারণ শাসকদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। তাদের সবচে' বড় অভিযোগ হল, তারা দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার করে না। দেশের সম্পদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। সম্ভবতঃ এরই পরিণতিতে ইয়ামান প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, তেল, গ্যাস ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আরব দ্বীপের সর্বাধিক পশ্চাৎপদ দেশ। এর একটি কারণ এও যে, আরব দ্বীপের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানকার জনসংখ্যা অনেক বেশী। তবে প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার ও ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা নগরায়নিক উন্নতির দিক থেকে দেশটিকে অনেক পিছিয়ে রেখেছে।

মোটকথা, আলমে ইসলামের অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানেও জনসাধারণ ও শাসকদের মধ্যে সমঝোতার পরিবর্তে দূরত্বের এক

পারাবার প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। যার ফায়দা পুরোটাই পাচ্ছে ইসলামের দুশমনেরা। দেশের উৎকৃষ্টতম সম্পদ উম্মাতের কল্যাণ ও সফলতায় ব্যবহৃত না হয়ে অন্যদের লক্ষ্য পূরণে কাজে আসছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের পাপের কুফলকে স্বীয় দয়া ও অনুকম্পা দ্বারা বিদূরিত করে ধ্বংসাত্মক এ পরিস্থিতি থেকে যদি মুক্তি দিতেন, তাহলে মুসলিম বিশ্ব আজ সারা বিশ্বের নেতৃত্বের আসনকে অলংকৃত করত।

•

মালয়েশিয়ায় কয়েকদিন

গত কয়েক মাস একাধারে বহির্দেশীয় সফরে ব্যস্ত ছিলাম। কয়েকটি দেশ সফর করার পর অবশেষে এক সপ্তাহ মালয়েশিয়ায় অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ করি। আমি প্রায় পাঁচ বছর পূর্বেও একবার মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলাম। তবে সাম্প্রতিক কালের এ সফরে মাশাআল্লাহ ঐ দেশের উন্নতির যে জোয়ার দেখেছি এবং বিভিন্ন অঙ্গনে তার প্রশংসনীয় পদক্ষেপের যে ধারা দৃষ্টিগোচর হয়েছে, পাঠক সমাজকে তা অবহিত করতে মন চাচ্ছে। তাই এবার পাঠক সমীপে এ দেশটি সম্পর্কে কিছু কথা তুলে ধরছি।

মালয়েশিয়া দক্ষিণ এশিয়ার ঊর্ধ্বমুখী একটি ইসলামী দেশ। পূর্বে এটি 'মালায়া' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ খৃষ্ট শতাব্দীতে একে মুসলিম বিশ্বের সোনালী ভূখণ্ড মনে করা হত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পর এটি প্রথমে পর্তুগীজ পরে ডাচ এবং অবশেষে ইংরেজ উপনিবেশবাদের শিকার হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ থেকে তার ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতা লাভের দশ বছর পর মুক্তি লাভ হয়। ১৩টি রাজ্য বা প্রদেশের সমন্বয়ের এ দেশটি স্বাধীনতা লাভের পর পার্লামেন্ট ভিত্তিক একটি কেন্দ্রীয় সংবিধান তৈরী করে। যার তৃতীয় দফায় একথা পরিষ্কার উক্ত ছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ধর্ম হবে ইসলাম। তবে অন্যান্য ধর্মও শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন তেরটি রাজ্যের প্রত্যেকটির মতাদর্শিক ও সাংবিধানিক পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে সেই রাজ্যের সুলতান নিজে। আর এই তের রাজ্যের সুলতানগণ (যারা উত্তরাধিকার সূত্রে সুলতান হয়ে থাকে) নিজেদের মধ্য থেকে কোন একজনকে পাঁচ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সরকার প্রধান নির্বাচিত করে। নির্বাচিত সেই ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের আইনানুগ প্রধান হয়ে থাকে। তবে বৃটিশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের ন্যায় এ সুলতানগণও নিছক আইনানুগ প্রধান হয়ে থাকে। প্রত্যেক সুলতানের মুসলমান হওয়া

জরুরী। তারা পদ গ্রহণের জন্য শপথ বাক্য পাঠের সময় নিয়মতান্ত্রিক আরবীতে 'ওয়াল্লাহ', 'বিল্লাহ', 'তাল্লাহ' শপথবাক্য বলে অঙ্গিকার করেন যে, তারা দ্বীন ইসলামের হেফাজত করবেন।

তবে রাষ্ট্র পরিচালনার নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী নিজে দিয়ে থাকেন। যিনি সুলতানের পক্ষ থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। তবে শর্ত হল সুলতানের মতে তাকে পার্লামেন্টের আস্থা অর্জন করতে হবে। মালয়েশিয়ায় বহু জাতির বাস রয়েছে। তার মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশের অধিক 'মালয়' বংশের লোক। তার পর দেশের অধিবাসীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ চীনা বংশোদ্ভূত লোকদের। তাদের বেশীর ভাগ অমুসলিম। খোদ মালয় বংশের অধিবাসীরাও বিভিন্ন বংশ ও ভৌগলিক অংশে বিভক্ত। কিন্তু অধিবাসীদের এ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এমন কোন সংঘর্ষ নেই যা দেশের শৃঙ্খলা ও সংহতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাদের কারো অধিকার বঞ্চিত হওয়ারও বিশেষ কোন অভিযোগ নেই, যার কারণে পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে। স্বাধীনতা লাভের পরপরই কিছুকাল এ জাতীয় সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। তবে শেষ পর্যন্ত একটি সুদৃঢ় রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ সমস্ত সমস্যাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে দেশটি দ্রুত উন্নতির সোপান অতিক্রম করছে।

মালয়েশিয়া প্রথমে টেংকু আবদুর রহমানের নেতৃত্ব লাভ করে। তিনি দেশকে উন্নতির রাজপথে এনে খাড়া করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদের নেতৃত্বে সমগ্র জাতি উদ্যম ও একাগ্রতার সাথে একটি উন্নত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কয়েক বছর পূর্বে যখন আমি মালয়েশিয়া গিয়েছিলাম তখন সে দেশের সরকার জনসাধারণকে এই উদ্দীপনাকর লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল যে, আমরা ২০২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ পরিপূর্ণ উন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। এবার যখন পাঁচ বছর পর মালয়েশিয়য়া যাই, তখন প্রকৃত অর্থেই কুয়ালালামপুরের জগত পরিবর্তিত দেখতে পাই। দ্রুতগতিসম্পন্ন উন্নয়নমূলক কাজ প্রত্যেকের সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। এই সময়ের মধ্যে দেশটি শিল্পাঙ্গনে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে। মালয়েশিয়া তার শিল্পজাত দ্রব্য দ্বারা জাপান ও কোরিয়ার মোকাবেলা করছে। শিক্ষিতের হার ৮০ শতাংশেরও অধিক।

জনসাধারণের স্বভাব–প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম–শৃংখলার অনুবর্তী হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। কুয়ালালামপুর শহরকে হংকং ও সিঙ্গাপুর থেকে অধিক সুন্দর ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন বানানো হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন (যা উচ্চতায় শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার থেকেও অধিক) কুয়ালালামপুরেই নির্মিত হচ্ছে। (মালয়েশিয়ার এ টাওয়ার আকাশচুম্বী দু'টি ভবনের সমন্বয়ে গঠিত। ভবনদ্বয়কে সুদৃশ্য একটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। ভবনদ্বয়ের অবকাঠামো তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন তার সাজসজ্জা ও কারুকার্যের কাজ চলছে।) ট্রান্সপোর্ট সমস্যা দূর করার জন্য ভূগর্ভস্থ ট্রেন ব্যবস্থার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে মালয়েশিয়া নিজের দ্বীন ও ধর্মের সঙ্গেও সম্পর্ক শুধু অটুটই রাখেনি বরং তাকে অধিকতর দৃঢ় করার চিন্তা অব্যাহত রেখেছে। যদিও মালয়েশিয়ার প্রায় চল্লিশ শতাংশ অধিবাসী অমুসলিম, মুসলমানদের হার অতি কষ্টে ৬০ শতাংশ হবে। চল্লিশ শতাংশ অমুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে বৃহদাংশ ঐ সমস্ত চীনা বংশোদ্ভূত অধিবাসীদের, যারা দেশীয় ব্যবসা ও শিল্পে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি রাখে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ হচ্ছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে এদিকেও বিরতিহীন অগ্রগামিতা রয়েছে।

এবার আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল সিকিউরিটিজ কমিশন। এই কমিশন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি শাখা প্রতিষ্ঠান। এটি সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক জামানতের তত্ত্বাবধান করে থাকে। সরকার এমন নীতি বাস্তবায়ন করেছে, যার অধীনে সে ক্রমশঃ সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এজন্যই সিকিউরিটিজ কমিশন ইসলামী ক্যাপিটাল মার্কেট শীর্ষক একটি আলোচনা সভা আয়োজন করেছিল। যার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এই ছিল যে, একটি ইসলামী অর্থবাজার প্রতিষ্ঠা করা কিভাবে সম্ভব? তাতে কোন ধরনের দস্তাবেজ চালু করা যেতে পারে? বিশেষতঃ মালয়েশিয়া এ কাজে কী ভূমিকা রাখতে পারে? আলোচনার উদ্বোধন করেন মালয়েশিয়ার ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার আলহাজ আনোয়ার

ইবরাহীম। তিনি শিক্ষানুরাগ ও ধার্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদের পর তিনি দেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (কেউ কেউ তাকে দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীও বলে থাকে)। আরব বিশ্ব থেকে ডঃ ইউসুফ কারজাভী এবং পাকিস্তান থেকে এই লেখককে বিশেষভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াত করা হয়েছিল। সিকিউরিটিজ কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ মুনির আবদুল মাজীদ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে মালয়েশিয়ার সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। তার সারাংশ এই ছিল যে, ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পদযাত্রা আরম্ভ হয় এবং ইসলামী ব্যাংক নামে এমন একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা সুদের পরিবর্তে ফিন্যান্সিং এর ইসলামী পন্থাসমূহের ভিত্তিতে কাজ করছে। একই সাথে একটি আইনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। কমার্শিয়াল ব্যাংকসমূহকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, তারা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য পৃথক শাখা প্রতিষ্ঠা করবে। সুতরাং বর্তমানে দেশের অনেক কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের সাথে সাথে ইসলামী কর্মপন্থা অনুপাতে কর্মসম্পাদনকারী ব্রাঞ্চ বা শাখাসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছে। ঐ সমস্ত ব্যাংকের তত্ত্বাবধানের জন্য আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়া বোর্ডও রয়েছে। তারা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকের লেনদেন ও কায়কারবার পর্যবেক্ষণ করে থাকেন এবং তাদেরকে শরীয়তভিত্তিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

সিকিউরিটিজ কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, প্রথম প্রথম আমাদের এই আশংকা হয় যে, ব্যাংকিং বিষয়টি যেহেতু আধুনিক যুগের সৃষ্টি এবং বেশ জটিল, তাই আমাদের প্রাচীন ফেকাহর কিতাবসমূহে এসব ব্যাপারে যথোপযুক্ত দিকনির্দেশনা লাভ করা দুষ্কর হবে, কিন্তু এদিকে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপের ফলে আমরা দেখতে পাই যে, আলমে ইসলামের শরীয়া স্কলারগণ আধুনিক মাসআলাসমূহকে কুরআন, সুন্নাহ ও ফেকাহের গ্রন্থসমূহের আলোকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে আরম্ভ করেছেন, যার ফলে ইসলামী মূলনীতির উপর গঠিত নতুন গবেষণাসমূহ দ্রুতগতিতে সম্মুখে আসছে। তিনি এ ব্যাপারে আলমে

ইসলামের অনেক আলেম ও গবেষকের লেখনীর কথা উল্লেখ করেন। যাঁরা তার মতে জ্ঞান–গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। তাঁর প্রদত্ত উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা অনুমিত হচ্ছিল যে, এঁরা ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে সমকালীন জ্ঞানী–পণ্ডিতদের লেখনীসমূহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আমার একটি ইংরেজী প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশসমূহ পাঠ করে শোনান। প্রবন্ধটি আমি পাঁচ বছর পূর্বে মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে পেশ করেছিলাম। প্রবন্ধটি মৌলিকভাবে 'সীমিত দায়িত্ব' (Limited Liability) এর বিষয়ের উপর লিখিত ছিল। জানতে পারলাম যে, প্রবন্ধটি এখানকার জ্ঞানীজনদের নিকট সবিশেষ সমাদৃত হয়েছে এবং ব্যাপক পর্যায়ে তা প্রকাশিতও হয়েছে। বর্তমানে মালয় ভাষায় তার অনুবাদও হচ্ছে।

আলোচনার পর আমাদের মেজবানগণ আমাদেরকে মালয়েশিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করান। 'নিগারা ব্যাংক' মালয়েশিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক। এর ডেপুটি গভর্নর ব্যাংকের ঐ সমস্ত প্রচেষ্টার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন, যা তারা দেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রসার ঘটানোর জন্য করছেন। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই আলোচনা করেন যে, বর্তমানে যদিও প্রত্যেকটি ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব শরীয়া বোর্ড রয়েছে, যেগুলো ব্যাংকসমূহকে শরয়ী বিষয়ের দিক নির্দেশনা দান করে থাকে, কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংকের নিজস্ব কোন শরীয়া বোর্ড নেই, যা তাকে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের সাথে লেনদেন সম্পাদনে শরয়ী দিকনির্দেশনা দান করবে। তাই বর্তমানে এমন একটি বোর্ড খোদ সেন্ট্রাল ব্যাংকের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। আর এ উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ব্যাংকের বিধিতে একটি সংশোধনী আনার প্রস্তাব মে মাসে পার্লামেন্টের সম্মুখে পেশ করা হচ্ছে।

সরকারী পর্যায়ে যাকাত সংগ্রহ ও তার বিতরণের জন্যও একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সে প্রতিষ্ঠানটিও দেখতে যাই। প্রতিষ্ঠানের প্রধান বললেন, প্রাইম মিনিষ্টার সেক্রেটারিয়েটে 'মাজলিসুশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ' (ইসলাম বিষয়ক পরিষদ) নামে একটি শাখা রয়েছে। এটি

ঐ সমস্ত ধর্মবিষয়ক প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্ন মর্যাদা রাখে, যা বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায় এবং তাতে সমস্ত ধর্মের ধর্মীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে। 'মাজলিসুশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ'র উদ্দেশ্য বিশেষভাবে ইসলামী নিদর্শনাবলীর প্রয়োগ ও সে সবের প্রসার ঘটানো। এই বিভাগের পক্ষ থেকে যাকাত সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ১৯৯১ তে । এর অধীনে যাকাত উসুলের কাজ বাধ্যতামূলক তো নয়, তবে যে সমস্ত লোক এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাকাত প্রদান করতে চায় তাদেরকে যাকাতের হিসাব নিকাশ ও তা আদায় করার বিষয়ে সুযোগ–সুবিধা প্রদান করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুস্তিকা, পত্রিকার প্রবন্ধ এবং রেডিও–টিভির মাধ্যমে যাকাতের গুরুত্ব জনসাধারণের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়। সময়মত যাকাত আদায় করার প্রয়োজনীয়তা এবং তার উপকারিতা ও ফযীলত সম্পর্কে অবহিত করা হয়। উপরন্তু যারা যাকাত প্রদানের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয় তাদের যাকাতের খাত খোলা হয়। কম্পিউটারের মাধ্যমে তাদের যাকাতের হিসাব রাখা হয় এবং এই সুবিধাও প্রদান করা হয় যে, আগ্রহী ব্যক্তিরা নিজেদের বেতনের কিছু অংশ প্রতিমাসে যাকাত ফাণ্ডে এই প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে পারে। কম্পিউটারের মাধ্যমে তাদের প্রদত্ত অর্থের হিসাব রাখা হয়। বছর শেষে এর সম্পূর্ণ হিসাব পেশ করা হয়। যাদের যাকাতের বছর পূর্ণ হয়ে যায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠান যাকাত প্রদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এমন গাইড বুকও প্রকাশ করা হয়েছে, যার সাহায্যে প্রত্যেক মুসলমান যাকাত–যোগ্য আসবাবের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে। যদিও এমন একটি আইনও বিদ্যমান রয়েছে, যার ভিত্তিতে যে মুসলমান যাকাত প্রদান করবে না তাকে বন্দী করা বা জরিমানার শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। তবে বাস্তবে এমন শাস্তি কাউকে দেওয়া হয় না। কারণ এটি প্রমাণ করা মুশকিল যে, অমুক ব্যক্তি কোথাও তার যাকাত প্রদান করেনি, তাছাড়া বর্তমানে সরকারী লোকেরা উৎসাহদানমূলক ব্যবস্থাসমূহ প্রয়োগ করাকে অধিক সমীচীন মনে করছে।

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে এই কেন্দ্রের মধ্যস্থতায় সারা দেশ থেকে ১৫৫ মিলিয়ন

মালয়েশিয়ান ডলার (রিংগিট) যাকাত উসুল হয়েছে। তার মধ্য থেকে ৩৫ মিলিয়ন উসুল হয়েছে শুধুমাত্র কুয়ালালামপুর থেকে। যাকাত সেন্টার এ অর্থ সংগ্রহ করার পর নিজে তা বিতরণ করে না। বরং ইসলাম বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে প্রতিষ্ঠিত যাকাত ফাণ্ডে জমা করে। ঐ ফাণ্ডের অধীনে প্রত্যেক প্রদেশে যাকাত বিতরণের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। যার মাধ্যমে যাকাতের হকদারদেরকে নগদ অর্থদান ছাড়াও পেশাকর্মের মেশিন ইত্যাদি যোগান দেওয়া হয়।

মালয়েশিয়া সরকারের একটি বিরাট কৃতিত্ব—যার দৃষ্টান্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পাওয়া যায় না—তা হল তার প্রতিষ্ঠিত হজ্জ প্রতিষ্ঠান। যা মালয়েশিয়ার মুসলমানদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসংহতভাবে হজ্জ পালনে উৎকৃষ্টতম সুবিধাদি প্রদান করছে শুধু তাই নয়, বরং সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং হাজীদের কল্যাণে অনুসরণযোগ্য ভূমিকাও এ প্রতিষ্ঠান পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষণীয় অতীত কাহিনী এই—১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি অব মালায়ার একজন অর্থনীতিবিদ ইংকো আজিজের অন্তরে খেয়াল জাগে যে, মালয়েশিয়ার মুসলমানদের হজ্জ করার খুব আগ্রহ। তারা হজ্জ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের রোজগারের বড় একটি অংশ প্রতিবছর বাঁচিয়ে নিজেদের সিন্দুকে সঞ্চয় করে থাকে। হজ্জের উদ্দেশ্যে জমাকৃত ব্যক্তিগত এই সঞ্চয় বছর বছরকাল সিন্দুকে অলসভাবে (Idle) পড়ে থাকে। যেহেতু হজ্জের জন্য অর্থ সঞ্চয়কারীরা ব্যাংকের সুদ পরিহার করে থাকে, তাই তারা এ অর্থ ব্যাংকে জমা করে না। ফলে এভাবে সেই সঞ্চয়ের অর্থনৈতিক কোন উপকার তারাও লাভ করে না এবং তা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগামিতায়ও কোন সাহায্য লাভ হয় না। ইংকো আজিজের অন্তরে এই ইচ্ছা জাগে যে, কোন প্রতিষ্ঠান যদি এ সমস্ত সঞ্চয়কে সমন্বিত করে এগুলোকে এমন ব্যবসায়িক ও কল্যাণকর পরিকল্পনায় ব্যবহার করে, যা শরীয়তের দিক থেকে হালাল, তাহলে একদিকে এই পরিকল্পনার মুনাফা হাজীদের মধ্যে বিতরণ করে তাদেরকে অধিকতর দ্রুত হজ্জ আদায়ের উপযুক্ত করা যেতে পারে।

অপরদিকে ব্যবসায়িক ও উৎপাদনমুখী এ সমস্ত পরিকল্পনা দ্বারা

দেশীয় অর্থনীতির প্রসার ঘটানোও সম্ভব। ইংকো আজিজ এই চিন্তার ভিত্তিতে এমন একটি অর্থ-প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো তৈরী করেন, যা লোকদের হজ্জের উদ্দেশ্যে সঞ্চয়কৃত অর্থসমূহকে সমন্বিত করে সেগুলোকে লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। এ অবকাঠামোটি তিনি একটি ওয়ার্কিং পেপার হিসাবে সরকারের সামনে পেশ করেন। সরকার তার এই প্রস্তাবকে পছন্দ করে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করে—যার নাম ছিল Malayan Pilgrim Saving Corporation। এই প্রতিষ্ঠানটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হজ্জে গমনেচ্ছুকদের থেকে তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থ উসুল করে সেগুলোকে শুধুমাত্র এমন লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করা হবে, যা শরীয়তের দিক থেকে জায়েয এবং হালাল। যখন প্রায় ছয় বছর পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানটি সফলভাবে চলতে থাকে তখন ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে একে হজ্জ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একীভূত করা হয়। বর্তমানে এটি হজ্জ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। যার নাম 'তাবুং হাজী'। তার আকাশচুম্বী ভবন কুয়ালালামপুরের সুদৃশ্যতম ভবনসমূহের মধ্যে গণ্য হয়।

প্রতিষ্ঠানটির কর্মপন্থা এই যে, যে ব্যক্তিই হজ্জের জন্য অর্থ জমা করতে চায় সে তার উদ্বৃত্ত টাকা এ প্রতিষ্ঠানে জমা করতে পারে। সে চাইলে তার বেতন থেকেও তার নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রতিমাসে কেটে প্রতিষ্ঠানে জমা করতে পারে। এই সংস্থায় অর্থ জমা করানোর এই সহজ পন্থাও রয়েছে যে, প্রত্যেকে নিজের নিকটতম ডাকঘরে টাকা জমা দিবে, সেখান থেকে তা সংস্থার একাউন্টে পৌঁছে যাবে। জমাকৃত এসব অর্থ থেকে বৈধ ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়। এর ফলে যে লাভ হয় তা অর্থ জমাকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। লাভের একটি অংশ পুনরায় সদস্যের একাউন্টে জমা হয়ে অধিকতর লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়। একটি অংশ বোনাসরূপে সদস্যকে নগদ প্রদান করা হয়। সদস্য চাইলে এ অর্থ নিজের অন্য কোন প্রয়োজনেও ব্যবহার করতে পারে, আর চাইলে একেও হজ্জ ফাণ্ডে জমা করতে পারে। একজন সদস্যের যখন হজ্জ করতে পারে পরিমাণ অর্থ জমা হয়ে যায়, তখন হজ্জ করানোর সমস্ত ব্যবস্থাপনা 'তাবুং হাজীর' দায়িত্ব হয়ে যায়। এ সংস্থাই

সদস্যের পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। প্রত্যেক সদস্যকে হজ্জের উন্নত প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করে। সদস্যের বাড়ী থেকে মক্কা-মদীনা যাওয়া এবং সেখান থেকে দেশে ফেরা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভ্রমণের উন্নত ব্যবস্থা করে। পবিত্র মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালে থাকা-খাওয়া, সেবা ও চিকিৎসা এবং হাজীদের অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনের দেখাশোনা এই সংস্থারই দায়িত্ব। জেদ্দা বিমানবন্দরে সংস্থার প্রতিনিধিদল হাজীদের অভ্যর্থনা জানায় এবং ভ্রমণের সমস্ত অফিসিয়াল কর্মকাণ্ড নিজেরা সমাধান করে। মিনা, আরাফা ও মুজাদালিফায় অবস্থান এবং হজ্জের কর্মকাণ্ড পালন করার এরাই তত্ত্বাবধান করে। যাতায়াতের জন্য ভাল যানবাহনের ব্যবস্থা করে। মোটকথা, মালয়েশিয়ার হাজীদেরকে সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনায় সফলভাবে হজ্জ করায়।

এ বিষয়টি হজ্জ ও উমরার সময় ছোট-বড় সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, সমগ্র বিশ্ব থেকে আগত নানা বিচিত্রের হাজীদের মধ্যে মালয়েশিয়ার হাজীদেরকে সুশৃংখল ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দেখা যায়। তারা কখনও কাউকে কষ্ট দেয় না। ধাক্কাধাক্কি করে না। কলহ-বিবাদ করতে বা উঁচু স্বরে কথা বলতেও তাদেরকে দেখা যায় না, বরং তারা নেহায়েতই প্রশান্ত ও সুশৃংখল পন্থায় নীরবে নিজেদের এবাদত পালন করে থাকে এবং একইরূপ নিয়ম-শৃংখলার সঙ্গে বিদায় হয়ে থাকে। মালয়েশিয়ান হাজীদের এ বৈশিষ্ট্য তাদের বিনম্র প্রকৃতি ও আভিজাত্যের ফল তো বটেই তবে তাতে 'তাবুং হাজীর' দেওয়া প্রশিক্ষণ এবং তাদের তৈরীকৃত সুব্যবস্থাপনারও বিরাট দখল রয়েছে।

'তাবুং হাজীর' দায়িত্বশীলগণ বলেছেন, আমাদের দেশে হজ্জের কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। এক ব্যক্তি যতবার ইচ্ছা হজ্জ করতে পারে।

'তাবুং হাজী' প্রতিষ্ঠানে হজ্জ গমনেচ্ছুকদের যে অর্থ সঞ্চিত হয় তা কত উৎকৃষ্টতম পন্থায় ব্যবহার করা হয়, তা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এই অর্থ দ্বারা 'তাবুং হাজী' নিম্নোদ্ধৃত সাতটি বড় বড় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছে। যার শতকরা একশ' ভাগই 'তাবুং হাজীর' মালিকানাধীন।

১. প্লান্টেশান কর্পোরেশন (পরিশোধকৃত পুঁজি পাঁচ কোটি ডলার)।

এই প্রতিষ্ঠান চল্লিশ হাজার হেক্টর ভূমিতে পাম ও কোকোর চাষ করেছে এবং পামওয়েলের দু'টি মিল প্রতিষ্ঠা করেছে।

২. সাবাহ্ প্লান্টেশান কর্পোরেশন (আদায়কৃত মূলধন প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন ডলার)। এই প্রতিষ্ঠান নয় হাজার ছয়শ' দুই হেক্টর ভূমিতে পাম ও কোকোর চাষ করেছে।

৩. প্লান্টেশান হোল্ডিং (পরিশোধকৃত মূলধন প্রায় ছাব্বিশ লাখ ডলার)। এই প্রতিষ্ঠান দুই হাজার পাঁচশ'-একত্রিশ হেক্টর ভূমিতে পাম চাষ করেছে।

৪. জেনারেল ট্রেডিং কোম্পানী (পরিশোধকৃত মূলধন দুই মিলিয়ন ডলার)। এই প্রতিষ্ঠান টিকিট এজেন্সী ও সাধারণ ব্যবসা করে থাকে।

৫. কন্সট্রাকশান এণ্ড হাউজিং কোম্পানী (পরিশোধকৃত মূলধন বিশ মিলিয়ন ডলার)। এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্টের কাজ করে থাকে।

৬. প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী (পরিশোধকৃত মূলধন দুই লাখ ডলার)।

৭. প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী (পরিশোধকৃত মূলধন দশ মিলিয়ন ডলার)।

এই সাতটি কোম্পানী (যেগুলোর সর্বমোট পরিশোধকৃত মূলধন প্রায় একশ' নয় মিলিয়ন মালয়েশিয়ান ডলার) সম্পূর্ণটাই একচেটিয়া হজ্জ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা। এর সম্পূর্ণ মুনাফা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সদস্যরা লাভ করে থাকে। এছাড়া দেশের ১৯টি বড় বড় কোম্পানীতে তাবুং হাজীর শেয়ারের অনেক বড় একটি সংখ্যা রয়েছে। তার মধ্য থেকে অনেকগুলো কোম্পানী এমন রয়েছে, যেগুলোর দশ শতাংশেরও অধিক শেয়ার হোল্ডিং তাবুং হাজীর। এগুলোর বোর্ডে তাবুং হাজীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। তাছাড়া হজ্জের সফর সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড এ প্রতিষ্ঠানই ব্যবসার ভিত্তিতে সম্পাদন করে থাকে। সারাদেশে এ প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কারো হজ্জের সফরের ব্যবস্থাপনা করার অনুমতি নেই বিধায় হাজীদের সফরসেবার ভিত্তিতে যে আমদানী হয়ে থাকে তাও প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় সদস্যদের মধ্যেই বন্টন হয়ে থাকে। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠান

জায়গা–জমি ক্রয়–বিক্রয়ের মাধ্যমেও মুনাফা করে থাকে। উপরন্তু ইউনিট ট্রাষ্টের মাধ্যমে অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ার কেনাবেচার দ্বারাও এটি উল্লেখযোগ্য লাভ পেয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ একটি ব্যাংকের চিফ এক্সিকিউটিভ একটি নৈশভোজে আমার নিকট একথা স্বীকার করেন যে, দেশের কোন ব্যাংক বা অর্থ প্রতিষ্ঠানই তাদের সদস্যদের মধ্যে এত অধিক মুনাফা বন্টন করে না, যত মুনাফা বন্টন করে 'তাবুং হাজী'।

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দের সর্বশেষ প্রকাশিত সংখ্যা ও গণনা অনুপাতে সে সময়ের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার। তাবুং হাজীর সমস্ত লাভজনক পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ ছিল (ট্যাক্স বাদে) ২১ কোটি ৪২ লক্ষ ৫২ হাজার মালয়েশিয়ান ডলার। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এই বিশাল পরিকল্পনা শুধু হজ্জকারীদেরকেই নয়, বরং পুরো দেশীয় অর্থনীতিকে কেমন অতুলনীয় লাভ দিয়েছে।

তাবুং হাজীর বিশাল ভবনের অডিটোরিয়ামে যখন একটি রেকর্ডকৃত ভাষণ আমাদেরকে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ বলছিল, তখন আমি ভাবছিলাম যে, হজ্জ প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত এই ফলাফল এমন একটি দেশের, যার অধিবাসী সোয়া কোটির অধিক নয়। অধিক অধিবাসীর মুসলমান দেশসমূহ যেমন পাকিস্তান—যার অধিবাসী তের কোটির কাছাকাছি এবং যেখানকার হজ্জকারীদের সংখ্যা মালয়েশিয়ান হাজীদের থেকে অনেক বেশী—যদি এ জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাহলে শুধু হজ্জ পালন করাই সহজ হবে না, বরং এ পরিকল্পনা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতেও অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারবে। আমি এ কথা মাত্র চিন্তা করছি, এমন সময় আমার কানে রিপোর্ট পেশকারী ভাষণদাতার এই কথা শ্রুত হয়—'আমরা অন্যান্য মুসলিম ভ্রাতৃদেশসমূহকে এ প্রস্তাব করেছি যে, যদি তারা নিজেদের দেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান খাড়া করে তাহলে তাবুং হাজী তার অভিজ্ঞতার আলোকে তাদেরকে সহযোগিতা করে আনন্দবোধ করবে'। তবে এ পরিকল্পনা দ্বারা যথার্থ উপকার লাভের জন্য সর্বপ্রথম নিষ্ঠা, দ্বিতীয়তঃ শ্রম ও অধ্যাবসায় এবং তৃতীয়তঃ আমানত ও দিয়ানত একান্তই প্রয়োজনীয়। আমার অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত দু'আ বের হল যে,

মহান আল্লাহ যদি আমাদের দেশকেও এই মৌলিক তিনটি নেয়ামত দান করতেন তাহলে আমাদের দিন পাল্টে যেত।

তাবুং হাজীর পর আমরা কুয়ালালামপুরের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও যাই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৯০টি দেশের দশ হাজার ছাত্র শিক্ষারত রয়েছে। ৪০টি দেশের ওস্তাদগণ পাঠদান সেবা প্রদান করছেন। প্রচলিত সমস্ত জ্ঞান–বিজ্ঞানের সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞানের শিক্ষাদান ব্যবস্থাও এতে রয়েছে। শিক্ষাদানের সার্বিক পরিবেশে ইসলামী রুচি ও প্রকৃতি সজীব করার প্রয়াস পাওয়া হয়। পরিচালকদের বক্তব্য হল, এখানে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক পরিচর্যার প্রতিও সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির নতুন ক্যাম্পাস তৈরীর জন্য দ্রুত কাজ চলছে। এ ক্যাম্পাসটি তিন হাজার একশ' পঞ্চাশ বর্গকিলোমিটারে বিস্তৃত। এটি নির্মাণে চারশো মিলিয়ন আমেরিকান ডলার ব্যয় হবে। এর হোষ্টেলে পনেরো হাজার ছাত্রের বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। এক হাজার আবাসিক ইউনিট বিবাহিত ছাত্রদের জন্য রাখা হয়েছে। এর লাইব্রেরী দশ লক্ষ গ্রন্থ সমন্বিত। বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে ইসলামী অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র, শিক্ষক ও স্কলারদের সম্মুখে বক্তব্য দানেরও সুযোগ লাভ হয়। বক্তব্য শেষে ছাত্রদের প্রশ্ন দ্বারা তাদের বিদ্যানুরাগিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এটি ছিল এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, যেগুলো মালয়েশিয়ার বর্তমান সফরকালে আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে আপত্তিকর অনেক বিষয়ও নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছি এবং সেগুলো সংশোধনেরও বিরাট সুযোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে মোটের উপর মালয়েশিয়া যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে, তা অনেকটাই আশাব্যাঞ্জক ও মুসলিম বিশ্বের জন্য তৃপ্তিজনক। এদেশ আমাদের থেকে দশ বছর পর স্বাধীনতা লাভ করেছে, কিন্তু তার উন্নতির গতি আমাদের জন্য ঈর্ষণীয়।

এতে সন্দেহ নেই যে, তার অধিবাসী আমাদের তুলনায় অনেক কম এবং উপাদান–উপকরণ অনেক বেশী। এই উন্নতির পিছনে এই দিকটির ভূমিকাকে চোখের আড়াল করা সম্ভব নয় ঠিক, তবে এর চেয়ে বড় কারণ

দেশের রাজনৈতিক দৃঢ়তা, তৎপরতা ও চিন্তাশীল নেতৃত্ব এবং জাতীয় ঐক্য। এখানেও বিভিন্ন জাতির লোকের বাস রয়েছে, এখানেও বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা হয়, এখানেও বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করে থাকে, এখানেও রাজনৈতিক দলসমূহ নিজ নিজ কর্মসূচী নিয়ে বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তাদের মতবিরোধ—চাই তা রাজনৈতিক হোক বা গোত্রীয়, ধর্মীয় হোক বা দলীয়—তা পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতার রূপ লাভ করে না এবং দেশের ব্যাপকতর স্বার্থের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

রাতের সূর্য

পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের একটি ভ্রমণ
নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড

রাত বারোটা বাজে। তখনও দিগন্তে সূর্য বিদ্যমান। দেদীপ্যমান সূর্য পরিবেশকে আলোয় উদ্ভাসিত করে রেখেছে। আমরা উত্তরে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে অবস্থান করছি। সূর্যকে সামনে নিয়েই পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে এশার আযান দিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করলাম।

জীবনের বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী এ অভিজ্ঞতা আমার সাম্প্রতিক কালের নরওয়ে সফরে লাভ হয়। স্মরণীয় এ ভ্রমণ—যাতে আমি নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড ভ্রমণ করি—অনেক নতুন অভিজ্ঞতা এবং নতুন তথ্যসমৃদ্ধ। তাই পাঠককেও এই ভ্রমণের কিছু বৃত্তান্ত অবহিত করতে মন চাইল। এ উদ্দেশ্যেই এ লাইনগুলো পেশ করছি।

ইউরোপের উত্তরে দ্বীপসদৃশ একটি ভূখণ্ড রয়েছে, যাকে Scandinavian Peninsula বলে। প্রাচীন ইতিহাসে একে 'স্ক্যানডিয়া' বলা হত। এ উপদ্বীপটি এক হাজার একশ' পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ। তার মোট আয়তন দুই লক্ষ ঊননব্বই হাজার পাঁচশ' বর্গমাইল। এর কিছু অংশ সুইডেন আর কিছু নরওয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই উপদ্বীপের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেই ইউরোপের উত্তরের তিনটি দেশ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের সমষ্টিকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া Scandinavia বলা হয়। কতিপয় লোক ফিনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড ও ফিরু দ্বীপপুঞ্জকেও ভৌগলিক সাদৃশ্যের কারণে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। কিন্তু নির্ভেজাল ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মধ্যে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ককেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে কিছু দিন ধরে অপর একটি পরিভাষা 'উত্তরের দেশমালা' (Nordic Countries) ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দেশসমূহ ছাড়া ফিনল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এসব দেশের মধ্যে নরওয়ে উত্তরের অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক

উত্তরে। নরওয়ের দক্ষিণ প্রান্ত উত্তরে সাতান্ন ডিগ্রী অক্ষাংশে আর উত্তর প্রান্ত সাতশ' একুশ ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত। বরং সাদ্দুল বার্‌দ দ্বীপপুঞ্জ—যা নরওয়ের ব্যবস্থাধীনে রয়েছে—(যার আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে করব) তার শেষ প্রান্ত একাশি অক্ষাংশে অবস্থিত। অর্থাৎ উত্তর মেরু থেকে মাত্র নয় ডিগ্রী দূরে।

নরওয়ের মোট আয়তন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সাতান্ন বর্গমাইল। এ সম্পূর্ণ অঞ্চলটি অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দয, পাহাড়, সাগর, জলপ্রপাত ও ঝিলসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধশালী। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার বক্তব্য অনুযায়ী নরওয়ের ছোট বড় ঝিলের মোট সংখ্যা এক লক্ষ ষাট হাজার। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ দেশটিকে বহুবিধ উপকরণ দান করেছেন। যার মধ্যে তেল, গ্যাস, লাকড়ি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এত বেশী বিস্তৃত আয়তন আর এত অধিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও এর সর্বমোট অধিবাসী পাঁচ মিলিয়ন (পঞ্চাশ লক্ষ)এর কাছাকাছি। অধিবাসীর ঘনত্ব (Density) প্রতি কিলোমিটারে তেরোজন। তাই যখন নরওয়ে কর্তৃক তার অধিবাসীদেরকে প্রদত্ত সুবিধাদি—যেমন বিনা বেতনে শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, ফ্যামিলি এলাউন্স, বার্ধক্য ও পঙ্গুত্বের পেনশন ইত্যাদির আলোচনা আসে, তখন এর কারণও সহজেই বুঝে আসে। সুতরাং অতি সম্প্রতিই জাতিসংঘের গণনা অনুযায়ী নরওয়েকে উন্নত জীবনযাত্রার দিক থেকে বিশ্বের এক নম্বর দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নরওয়ের মুসলমানদের নিমন্ত্রণে গত বছর (২০০০ সাল) আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে আমি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ভ্রমণ করি। সেটি ছিল নিমন্ত্রণধাঁচের একটি ভ্রমণ। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার মুসলমানদের জন্য ইসলাহী বয়ান করা, তাদের সমস্যাবলী অবগত হওয়া, সেসবের সমাধানের জন্য পরামর্শ দেওয়া এবং তাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করা। সুতরাং নরওয়ের রাজধানী ওসলোতে আমার অনেকগুলো বয়ান হয়। এখানকার বিভিন্ন মসজিদ ছাড়া বড় একটি হলে ৬ই আগষ্ট ২০০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের বড় একটি সমাবেশেও আমার বক্তব্য হয়। তার শিরোনাম ছিল 'অমুসলিম দেশসমূহে বসবাসকারী মুসলমানদের দায়িত্ব।' সাথে সাথে ৮ই আগষ্ট নগরীর বড় একটি সেন্টারে ডাক্তারদের বড় এক

সমাবেশেও বক্তব্য দানের সুযোগ হয়। তাতে মুসলমানগণ ছাড়া স্থানীয় অমুসলিম ডাক্তারগণও বিরাট সংখ্যক উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্যটি ইংরেজীতে হয়েছিল।

এই সমাবেশের ব্যবস্থা মুসলমান ডাক্তারদের অনুরোধে এজন্য করা হয়েছিল, যেন মুসলমানদেরকে হাসপাতালের ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ অবহিত করা হয়। বহুসংখ্যক অমুসলিম ডাক্তারকেও এজন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল যে, তারা যেন মুসলমানদের ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কে অবগত হয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় প্রয়োজন ও কর্তব্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে। সমাবেশের আলোচ্য বিষয় এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও আমি এ সুযোগকে গণীমত মনে করে প্রথমে ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তার মৌলিক আকিদা ও শিক্ষার একটি রূপরেখা তুলে ধরি। তারপর রোগ, রোগী ও তার চিকিৎসা সংক্রান্ত শরীয়তের বিধি–বিধান কিছুটা সবিস্তারে বর্ণনা করি। হলকক্ষ ডাক্তারদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাদের মধ্যে অমুসলিমদের সংখ্যা ছিল বেশী। ওসলো শহরের গভর্নরও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সুধীজনদের প্রশ্নসমূহ দ্বারা অনুমিত হয় যে, তারা পূর্ণ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে এ বক্তব্য শ্রবণ করেন। অমুসলিম ডাক্তারদেরকে মুসলমান রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখায় সচেষ্ট হওয়ার প্রতি আগ্রহী দেখা গেল। সমাবেশ সমাপ্ত হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্নের ধারা চলতে থাকে। উপস্থিত অনেকেই বললেন যে, তাদের বিভিন্ন সন্দেহ–সংশয় দূরীভূত হয়েছে।

কিছুদিন ধরে নরওয়ের স্কুলসমূহে খৃষ্টধর্ম শিক্ষা সকল শিশুর জন্য আবশ্যকীয় করা হয়েছে। মুসলমান শিশুরাও এর ব্যতিক্রম নয়। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য এখানকার মুসলমানগণ মধ্যপন্থী কিছু খৃষ্টান পাদ্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। ৮ই আগষ্ট ২০০০ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানী মুসলমান সিদ্দীকী সাহেবের রেস্তোরাঁয় এ সাক্ষাত হয়। এদিক থেকে আমাদের সাক্ষাতটি উপকারী হয় যে, উপস্থিত সকল পাদ্রী একথা স্বীকার করেন যে, মুসলমানদেরকে খৃষ্টধর্ম শিক্ষা করতে বাধ্য করা একান্তই বাড়াবাড়ি। তারা এ বাধ্যবাধকতাকে রহিত করতে মুসলমানদের

সঙ্গে সহযোগিতা করবেন বলে ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

ওসলোতে মুসলমান শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য একটি মুসলিম স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছিল। আমি পশ্চিমা দেশসমূহের ভ্রমণে এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করার প্রতি সর্বদাই জোর দিয়ে আসছি। এই স্কুলের ব্যবস্থাপকগণ পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমাকে দাওয়াত করেছিলেন। সেখানেও যাই। আমি পাঠ্যক্রম প্রস্তুতিতে সামর্থানুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করি। পাকিস্তান আসার পরও তাদের পক্ষ থেকে পত্রযোগে পরামর্শ গ্রহণের ধারা অব্যাহত থাকে।

ওসলো থেকে একদিনের জন্য আমি ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনেও যাই। এখানে মাওলানা সুলতান ফারুকের পরিচালনাধীন ইসলামিক কালচার সেন্টারের মসজিদে জুমুআর নামাযান্তে দীর্ঘসময় বক্তব্য দান করি। তারপর একদিনের জন্য সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোমেও যাওয়া হয়। সেখানে চৌধুরী মুহাম্মাদ আখলাক সাহেবের ব্যবস্থাধীনে স্থানীয় একটি মসজিদে একটি সাধারণ সভায় বক্তব্য দান ও প্রশ্নোত্তরের আসর হয়।

গতবছর আমার এ ভ্রমণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আমার প্রিয় বন্ধু ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেব করেছিলেন। তিনি ওসলোর মুসলমানদের মধ্যে অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। আমি সর্বদাই তাঁর মধ্যে আবেগ ও বিবেকের উত্তম সংমিশ্রণ দেখতে পেয়েছি। তাঁকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিন্তু রুচিশীল, গম্ভীর কিন্তু তৎপর পেয়েছি। ভ্রমণকালীন প্রোগ্রামসমূহের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাকে ওসলো ও তার উপকণ্ঠের ভ্রমণ করান। নরওয়ের জলবায়ু, গ্রীষ্মকালীন ঋতু এবং এখানকার প্রশান্ত পরিবেশ পাশ্চাত্য জগতের অন্য যে কোন দেশের তুলনায় আমার কাছে অধিক পছন্দ হয়। এখানে অবস্থানকালে আমার স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি ঘটে।

সুতরাং এ বছর আমার কতিপয় চিকিৎসক যখন আমাকে আমার নিয়মতান্ত্রিক কর্মব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে কমপক্ষে দু' সপ্তাহ কোন ভাল আবহাওয়াপূর্ণ জায়গায় কাটানোর জন্য তাকীদ করেন, তখন আমি এর জন্য নরওয়েকে সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করি। আমার বন্ধু ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেব পূর্বেই আমাকে পীড়াপীড়ি করে বলেছিলেন যে, গ্রীষ্মকালে

কিছুদিন যেন আমি সেখানে কাটাই। তাই এ বছর আমি আল্লাহর নামে সংকল্প করি যে, দারুল উলূমের ষান্মাসিক পরীক্ষা চলাকালে দু' সপ্তাহ নরওয়ে ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে অতিবাহিত করব। ১৬ই জুলাই ও পহেলা আগষ্ট আমাকে লণ্ডনে দু'টি সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই সমাবেশদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়টুকু নরওয়েতে অতিবাহিত করার জন্য পেয়ে যাই।

১৬ই আগষ্ট লণ্ডনে ফার্ষ্ট ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার পর আমি ১৭ই আগষ্টের তৃতীয় প্রহরে নরওয়ের রাজধানী ওসলো পৌঁছি। আমার মেজবান বন্ধু ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেব, মাদানী মসজিদের ইমাম ও খতীব জনাব মাওলানা বশীর সাহেব এবং নরওয়েতে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার পরিবারও যেহেতু এ সফরে আমার সঙ্গে ছিলেন তাই ওসলোর উপকণ্ঠের একটি এলাকায় (Mortensrud)—যেখানে বহুসংখ্যক পাকিস্তানী লোকের বসবাস রয়েছে—একটি খালি বাড়ীতে ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেব আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

ঐ দিনের বিকেল ৬টায় মাওলানা বশীর সাহেব মাদানী মসজিদে ওসলোর আলেমদের একটি সমাবেশ আহবান করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, ওসলো শহরে বর্তমানে ১৫/২০টি মসজিদ রয়েছে। তার কিছু পাকিস্তানী ইমামদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে, আর কিছু রয়েছে আরব উলামাদের তত্ত্বাবধানে। মাওলানা বশীর সাহেব এ সময় সমস্ত মসজিদের ইমাম ও খতীবগণকে সমবেত করেছিলেন। তার মধ্যে ইরাকের শায়খ বারযাঞ্জী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমি গত বছরেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। তাঁর মসজিদে আরবীতে আমার বক্তব্যও হয়েছিল। তিনি একজন বিদ্যানুরাগী ও অধ্যয়নপাগল মহান ব্যক্তি। তিনি ছাড়া সোমালিয়ার কিছু ইমাম ও খতীবও এ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল এখানকার ফেকাহ বিষয়ক কিছু সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করা। এ কার্যক্রম প্রায় এক ঘন্টা সময় অব্যাহত থাকে। যে সমস্ত নারী তাদের স্বামীদের জুলুম-নির্যাতনের

শিকার হয়ে বিবাহ ভঙ্গ করাতে চায়, তাদের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনায় আসে। এ ব্যাপারে আমি প্রস্তাব পেশ করি যে, এখানকার মসজিদের ইমামদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক, যারা এসব নারীর অভিযোগ শুনবে। শরীয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, যেসব দেশে মুসলমান বিচারপতি নেই সেখানে মুসলমানদের একটি দল এ জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে বিচারপতির স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করবে। যার বিস্তারিত পদ্ধতি হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)এর 'আলহীলাতুন নাজিযাহ' গ্রন্থে রয়েছে।

আমার এই প্রস্তাবে সবাই একমত হন। আলহামদুলিল্লাহ, ঐ বৈঠকেই একটি কমিটি গঠন করা হয়, যা এ সমস্যার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, বরং মুসলমানদের অন্যান্য সমস্যার ব্যাপারেও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করবে।

আসরের নামায ঐ সময় সেখানে বিকাল সাড়ে সাতটায় হচ্ছিল। সুতরাং সমাবেশান্তে আসর নামায আদায় করা হয়। নামাযের পরও কিছু সময় পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরের ধারা চলতে থাকে। সাড়ে আটটার দিকে আমি সেখান থেকে আমার অবস্থানস্থলে ফিরে আসতে সক্ষম হই। সে সময় সেখানে সূর্যাস্ত হচ্ছিল সাড়ে দশটায়। তাই মাগরিবের সময় হতে তখনও দু' ঘন্টা বাকী ছিল। এ সময়টুকু আমি আমার অবস্থানস্থলে মাআরিফুল কুরআনের অনুবাদের কাজে ব্যয় করি।

ওসলোর রজনী

সাড়ে দশটার সময় সূর্যাস্ত হলে আমরা মাগরিব নামায আদায় করি। কিন্তু ওসলোর অবস্থা এই যে, গ্রীষ্মকালের পুরো মৌসুমে এখানে সূর্যাস্তের রক্তিম আভা সারারাত অস্ত যায় না। বরং প্রায় সারারাত এমন আলো-আঁধারী অবস্থা বিরাজ করে, যেমন আমাদের দেশে মাগরিব নামাযের আধাঘন্টা/পৌনে এক ঘন্টা পর কিংবা সুবহে সাদিক হওয়ার আধাঘন্টা পর হয়ে থাকে। রাত যতটাই হোক না কেন আকাশে পরিষ্কার আলো দেখা যায়। অধিকাংশ সময় দিগন্তের লালিমাও বিলুপ্ত হয় না। এর কারণ এই যে, এখানে রাতের কোন সময়েই সূর্য দিগন্ত থেকে আঠার

ডিগ্রীর নীচে যায় না। বরং উত্তর–পশ্চিমে অস্ত গিয়ে উত্তর–পূর্বে উদিত হয়।

শরীয়তের বিধান মতে এশার সময় আরম্ভ হয় তখন, যখন দিগন্তের সন্ধ্যাকালীন শুভ্রতা কিংবা ন্যূনতম পক্ষে সন্ধ্যাকালীন লালিমা অস্ত যায়। যেহেতু ওসলোতে সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যাকালীন শুভ্রতা ও লালিমা অস্ত যায় না, তাই স্বভাবতই এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এশার পরিচিত ও স্বাভাবিক সময় এখানে হয় না।

নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডে তো এ অবস্থা গ্রীষ্মকালীন পুরো মৌসুমে (৭ই এপ্রিল থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) অব্যাহত থাকে, তবে ইউরোপের আরো কিছু দেশেও গ্রীষ্ম ঋতুতে কিছু সময় এমন আসে, যখন রাতে লালিমা অস্ত যায় না এবং এশার মূল সময় আসে না। যেমন লণ্ডনে ২৫শে মে থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত, এ্যাডেনবরা ও গ্লাসগোতে ৫ই মে থেকে ১৭ই আগষ্ট পর্যন্ত এবং প্যারিসে ১১ই জুন থেকে ১লা জুলাই পর্যন্ত সান্ধ্যলালিমা অস্ত যায় না।

প্রশ্ন হল, এ সমস্ত জায়গায় এশা ও ফজরের নামায কখন পড়া হবে? এশার যথার্থ সময় তো এজন্য আসে না যে, সান্ধ্যলালিমা সারারাতই রয়ে যায়। ফজর নামাযের মাসআলাও এজন্য ভাববার বিষয় যে, ফজরের সময় আরম্ভ হয় সুবহে সাদিক উদয় হলে। আর সঠিক অর্থে সুবহে সাদিক উদয় হয়েছে তখন বলা হবে, যখন তার পূর্বে পূর্ণ অন্ধকার আচ্ছন্ন করবে। কিন্তু এখানে তো পূর্ণ অন্ধকার সারা রাতের কখনই হয় না, তাই সুবহে সাদিক কখন আরম্ভ হল সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও জটিল ব্যাপার।

এমন এক সময় ছিল, যখন এ সমস্ত এলাকায় মুসলমানদের বসবাস ছিল না। তাই এ সমস্যার বাস্তবভিত্তিক কোন গুরুত্বও ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের অধিবাস উত্তরে আটচল্লিশ অক্ষাংশের সম্মুখে যতই অগ্রসর হতে থাকে, এ প্রশ্ন ফকীহদের সামনে ততই জোরালোভাবে আসতে থাকে এবং এ ব্যাপারে উম্মাতের আলেমগণ বিস্তারিত আলোচনাও করেন।

‘বুলগার’-পরিচিতি

আমার জানা মতে এ মাসআলাটি সর্বপ্রথম আব্বাসী খেলাফতকালে উত্তরের ‘বুলগার’ শহরে দেখা দেয়। শহরটি ৫৫ ডিগ্রী অক্ষাংশ ও ৬৬ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ‘মুক্তাদির বিল্লাহে’র শাসনকালে ‘বুলার’ নামক একজন মুসলমান বুযুর্গ ঐ শহরে পৌঁছে দেখতে পান যে, শহরের রাজা ও রানী উভয়ে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। জীবনের ব্যাপারে তারা নিরাশ। ‘বুলার’ তাদেরকে বললেন, আমি আপনাদের চিকিৎসা করলে আপনারা কি আমার ধর্ম (ইসলাম) কবুল করবেন? তারা সম্মতি জানায়। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তাঁর চিকিৎসায় রাজা ও রানী উভয়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন। তখন বুলারের হাতে তাঁরা মুসলমান হন। তাঁরা মুসলমান হওয়ার ফলে শহরের সমস্ত মানুষ ইসলাম কবুল করেন। তাঁরা মুকতাদির বিল্লাহর নিকট পয়গাম পাঠান যে, আমাদের নিকট এমন কোন লোক পাঠিয়ে দিন, যিনি আমাদেরকে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা দিতে সক্ষম।

বুলগারের অদূরবর্তী ‘খজর’ এলাকার রাজা ছিল অমুসলিম। সে বুলগারের রাজা ও তার অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেয়ে নির্ভীক এক সেনাদল নিয়ে বুলগারের উপর আক্রমণ করে। বুলার বুলগারের লোকদেরকে বলেন যে, ‘তোমরা ভয় করো না। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা কর।’ এভাবে উভয় দলের মধ্যে লড়াই হয়। খজরের বাদশাহ পরাস্ত হয়। পরবর্তীতে সে বুলগারের শাসকের সঙ্গে সন্ধি করে। তখন সে বলে যে, যুদ্ধ চলাকালে আমি আপনাদের বাহিনীতে লালরঙ্গের অশ্বে আরোহিত অস্বাভাবিক বড় কিছু লোক দেখতে পাই। তারা আমার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করছিল। বুলার বললেন, ‘এঁরা আল্লাহর প্রেরিত বাহিনী।’ এ সম্পূর্ণ শহরটি যেহেতু বুলারের দাওয়াতে মুসলমান হয়েছিল তাই এই শহরের নামও ‘বুলার’ রাখা হয়। যা কালক্রমে ‘বুলগার’ হয়ে যায়। [১]

---

১. এ ঘটনাটি আল্লামা কাযবিনী (রহঃ) আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ (পৃঃ ৬১২-৬১৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বুলগারেরই অধিবাসী মাহমুদ আর রামযী ১২৪৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত এর বিস্তারিত ইতিহাস লিখেছেন। যা ১৩২৫ হিজরীতে ‘তালফিকুল আখবার ওয়া তালকিহুল আসার’ নামে ছেপে বের হয়েছে।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক কালাকসান্দী (রহঃ) বুলগারের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, 'বুলগারের অধিকাংশ অধিবাসী হানাফী মাযহাবের অনুসারী। সেখানে তীব্র শীতের কারণে কোন প্রকার ফল বা ফলবৃক্ষ হয় না। .... সুলতান ইমাদুদ্দীন হামভী বলেন যে, বুলগারের কতিপয় অধিবাসী আমাকে বলেছেন যে, গ্রীষ্মের শুরুতে সেখানে সান্ধ্য–লালিমা অস্ত যায় না। সেখানকার রাত খুব ছোট হয়। ..... কারণ ৪৮.৫ ডিগ্রি অক্ষাংশ ও তারও সম্মুখের অঞ্চলসমূহে গ্রীষ্মের শুরুতে সান্ধ্যলালিমা অস্তমিত হয় না। (সুবহুল আ'শী, পৃঃ ৪৬২০, খণ্ড–৪)

স্মর্তব্য যে, এ শহরটি এখনও এ নামেই পরিচিত। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী তাতারীস্থানের কাজান শহর থেকে ২৪৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী শায়খ নাসির আল উবুদী এ দেশ সফর করেন। তাঁর সফরনামা 'বিলাদুত তাতার ওয়াল বুলগার' নামে প্রকাশিতও হয়েছে। তিনি বলেন যে, এখনও সরকারী কাগজপত্রে এ শহরকে 'বুলগারই' বলা হয়। এখানে বড় বড় আলিমের জন্ম হয়েছে।

সারকথা এই যে, বুলগারে ইসলাম বিস্তারের ফলে উম্মাহর ফকীহদের সম্মুখে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যে সমস্ত অঞ্চলে সারা রাতে সান্ধ্য লালিমা অস্ত যায় না, সেখানে এশা ও ফজর নামাযের বিধান কী? একদল ফকীহের অবস্থান ছিল এই মতের উপর যে, নামায ফরয হওয়ার সম্পর্ক তার সময়ের সাথে। বিধায় যে জায়গায় বিশেষ কোন নামাযের সময় হয় না সেখানে ঐ নামাযও ফরয হবে না। সুতরাং তাদের বক্তব্য হল, এ সমস্ত অঞ্চলে যেহেতু সান্ধ্যলালিমা অস্ত যায় না তাই এশার নামায সেখানে ফরযই হয় না।

কিন্তু ফোকাহায়ে কেরামের বড় একটি দলের বক্তব্য এই যে, সান্ধ্যলালিমা অস্তমিত না হওয়ার কারণে এশার নামায বাদ পড়বে না। বরং ঐ সমস্ত অঞ্চলের লোকদেরকে সময় হিসেব করে এশা ও ফজর

১. এ বক্তব্য শামছুল আইম্মা হালুয়ানী (রহঃ) ও বাকায়ী (রহঃ)এর দিকে সম্পৃক্ত। আল্লামা শরনবুলালী (রহঃ)ও এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (রদ্দুল মুহতার, পৃঃ ৩৬২, খণ্ড–১)

নামায আদায় করতে হবে। (মুগনীউল মুহতাজ, পৃঃ ১২৩, খণ্ড ১)

শাফেয়ী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম ও হানাফী মাযহাবের গবেষক আলেমগণও এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল বোরহানুল কাবীর, মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম, আল্লামা ইবনু আমীর আলাহাজ্জ ও আল্লামা কাসেম বিন কতলুবাগা (রহঃ) প্রমুখ। আল্লামা ইবনে হুমাম (রহঃ) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে অত্যন্ত জোরালোভাবে একথার সমর্থন করেছেন। মালেকী মাযহাবের আলেমদের মধ্য থেকে আল্লামা কারাফী (রহঃ)ও এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

(আস সাবী আলাদ দারদির পৃঃ ২২৫, খণ্ড ১)

পরবর্তীকালের হানাফী আলেমদের মধ্যে আল্লামা হারুন বিন বাহাউদ্দীন মারজানী (রহঃ) (মৃত্যু ঃ ১৩০৬ হিজরী) নামে এক বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন। 'তাওযীহ' গ্রন্থের উপর তাঁর টিকা সুপ্রসিদ্ধ। তিনি এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা রচনা করেছেন, যার নাম 'নাযুরাতুল হাক্কী ফি ফারযিয়াতিল ইশায়ি ওয়া ইল্লাম ইয়াগিবিশ শুফুক'। এই পুস্তিকার হস্তলিখিত একটি কপি 'পীর ঝাণ্ডুর' গ্রন্থাগারে রয়েছে। সেখান থেকে ফটোকপি করে এক বন্ধু আমার নিকট একটি কপি পাঠিয়েছিলেন। এই পুস্তিকায় তিনি জোরালো ভাবে ঐ সমস্ত লোকের কথাকে রদ করেছেন, যারা বলে যে, এ সমস্ত অঞ্চলে এশার নামায ফরযই হয় না। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর দৃঢ় প্রমাণমালা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, তাদের উপর এশার নামায ফরয। তারা সময়ের হিসাব করে এ নামায আদায় করবে। আমি আমার রচিত 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে (পৃঃ ৩৭৬–৩৭৮) এ পুস্তিকার নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করেছি এবং প্রমাণ করেছি যে, এ মতই সঠিক এবং অবশ্য পালনীয়। এর সমর্থন একটি হাদীস দ্বারাও হয়ে থাকে, যা আমি ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তুলে ধরব।

যাই হোক, সঠিক কথা এটিই যে, এশা ও ফজর নামায ঐ সমস্ত অঞ্চলেও ফরয। তবে সেগুলো আদায় করার জন্য হিসেব করে সময় নির্ধারণ করতে হবে। হিসাব করে সময় নির্ধারণের বিভিন্ন পন্থা ফকীহগণ বর্ণনা করেছেন।

একটি পন্থা এই যে, ঐ সমস্ত অঞ্চলের নিকটবর্তী যে শহরে সান্ধ্যলালিমা অস্ত যায়, সেখানে যখন এশার ওয়াক্ত হবে, তখন এ সমস্ত অঞ্চলেও এশার নামায পড়বে। আর সেখানে যখন ফজরের সময় হবে, তখন এখানেও ফজরের নামায আদায় করবে।

দ্বিতীয় পন্থা এই যে, ঐ সমস্ত অঞ্চলে যেদিন শেষবার সান্ধ্যলালিমা অস্তমিত হয়েছে, সেদিন এশার ওয়াক্ত যেটি ছিল ঐ ওয়াক্তই এমন মৌসুমেও এশার ওয়াক্ত মনে করবে, যখন সান্ধ্যলালিমা অস্ত যায় না। একইভাবে সেদিন ফজরের যে সময় ছিল, ঐ সময়কেই ঐ মৌসুমেও ফজরের ওয়াক্ত মনে করবে।

তৃতীয় পন্থা এই যে, ঐ সমস্ত অঞ্চলে সান্ধ্যলালিমা সারারাত বিরাজ করলেও তার দিক পরিবর্তিত হতে থাকে। অর্থাৎ রাতের শুরুভাগে সান্ধ্যলালিমা অস্তাচলে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তা উত্তরদিকে স্থানান্তরিত হতে থাকে। অবশেষে তা উদয়াচলে পৌঁছে যায়। তাই কতিপয় আলেম এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সান্ধ্যলালিমা পশ্চিমদিকে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত মনে করা হবে। আর যখন তা পূর্ব দিকে চলে যাবে তখন থেকে ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়েছে মনে করা হবে। এর সহজ পন্থা এই যে, সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে নিয়ে পুনরায় উদিত হওয়া পর্যন্তের সময়কে দু' ভাগে ভাগ করবে। প্রথমাংশ মাগরিব ও এশার সম্মিলিত অংশ হবে। দ্বিতীয় অংশ হবে ফজরের। (নাযুরাতুল হক, পৃঃ ৮৬)

যখন থেকে মুসলমানগণ ঐ সমস্ত অঞ্চলে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছে, তখন থেকে এই তিন পদ্ধতির যে কোন পদ্ধতির উপর আমল করা হচ্ছে। বৃটেনের কিছু এলাকায় প্রথম পন্থা আর কিছু এলাকায় তৃতীয় পন্থার উপর আমল করা হয়। ওসলোর বেশীর ভাগ মসজিদে এশার নামায মাগরিবের সোয়া ঘন্টা পর আর ফজর নামায সূর্যোদয় থেকে এক ঘন্টা বা আধাঘন্টা পূর্বে হয়ে আসছে। যেদিন আমি ওসলো পৌঁছি সেদিন আমিও ঐ তরতীব মতই নামায আদায় করি। কিন্তু এই পন্থায় এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময় এত কম হয়ে থাকে যে, এর মাঝে ঘুমানো এবং তারপর ফজরের জন্য ওঠা অনেক লোকের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এরও সুযোগ রয়েছে যে, তৃতীয় পন্থা অনুপাতে সূর্যাস্ত

ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ের অর্ধেক অতিবাহিত হলে ফজর নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়বে। ওসলোতে রাত দেড়টার দিকে সে হিসেবে ফজরের সময় হচ্ছিল। সুতরাং পরবর্তীতে এই পন্থার উপর আমল করে অনেকবারই আমরাও ফজর নামায দুইটার দিকে ঐ সময় আদায় করি, যখন সান্ধ্যলালিমার আলো উদয়াচলে প্রকাশ পেয়েছে।

ওসলোতে অবস্থান

১৮ থেকে ২১শে আগষ্ট পর্যন্ত আমরা ওসলোতেই অবস্থান করি। এ ঋতুতে এখানকার আবহাওয়া আমার নিকট খুবই মনোমুগ্ধকর ও আনন্দকর মনে হয়। বিশেষ করে রাতের বেলায়। সন্ধ্যার ন্যায় আলো–আঁধারী পরিবেশ, আকাশে বিস্তৃত শুভ্রতা ও তরতাজা বায়ুর দোলা এবং তারফলে সুউচ্চ 'চিড়' বৃক্ষের পত্ররাজির সুললিত ঝাপ্টাধ্বনি বড়ই পুলকোদ্দীপক মনে হয়। আমাদের থাকার ব্যবস্থা যে বাড়ীতে করা হয়েছিল, তা ছিল একটি টিলার উপর। তার বারান্দা থেকে সম্মুখস্থ সবুজ–শ্যামল উপত্যকাসমূহের নীচে একটি উপসাগর দৃষ্টিগোচর হত। আর তার পশ্চাতে সবুজে ঢাকা পাহাড় গোচরীভূত হত। রাতের বেলা যখন বেশীর ভাগ মানুষ ঘুমিয়ে পড়ত আর আমাকে নামাযের প্রতীক্ষায় জাগতে হত, তখন নীরব–নিঝুম–প্রশান্ত এই পরিবেশে পদচারণা অপূর্ব উপভোগের সঞ্চার করত।

ওসলোর তিনদিনের এই অবস্থানকালে আমাদের মেজবান ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেব শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানও ঘুরে দেখান। তার মধ্য থেকে ড্রামেন (Drammen) নামে প্রসিদ্ধ জায়গাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি ওসলো শহর থেকে প্রায় ৫০/৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছোট একটি শহর। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর অসাধারণ সৌন্দর্যে সজ্জিত করেছেন এ শহরটিকে। শহরটি মুখোমুখী কয়েকটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। যার মধ্য দিয়ে কলকল রবে একটি নদী প্রবাহিত। কিছুদূর পরপর নদীর উপর সেতু তৈরী করে শহরের উভয় অংশকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই পাহাড়দ্বয়ের পেট বিদীর্ণ করে মাঝখান দিয়ে স্তম্ভাকৃতির একটি সুড়ঙ্গ তৈরী করা হয়েছে। যা

পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সিঁড়ির আকারে উপরে উঠে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত চলে গেছে। এই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করার পর গাড়ীকে কোন জায়গায় মোড় নিতে হয় না। বরং ষ্টিয়ারিং একটু বাঁকা করে রাখা হলে গাড়ী সুড়ঙ্গের সাথে সাথে নিজেই মোড় নিতে থাকে এবং অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসে। পাহাড়ের উপর পৌঁছার পর বেশ দীর্ঘ ও প্রশস্ত একটি সমতল ভূমি রয়েছে, যার প্রান্ত থেকে শহর, নদী, পাহাড়, পুল, ফোয়ারা ও বন–বনানীর এমন এক মনকাড়া দৃশ্য সম্মুখে আসে, যা দেখে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে—

تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ'।

ছোট এ শহরেও মুসলমানের বাস রয়েছে। এখানে তারা দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। ওসলোর শহরতলী এলাকা এ জাতীয় অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্যসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। এটি পাহাড়ী এলাকা, যার উপর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সুউচ্চ 'চিড়' বৃক্ষ ছায়াপাত করে আছে। এখানকার সবুজ–শ্যামলিমার অবস্থা এই যে, বসতিহীন অঞ্চলসমূহে এক গজ জায়গাও শুষ্ক দেখা যায় না। উপরন্তু, পাহাড়ী নদীসমূহ জলপ্রপাতের ন্যায় রূপ ধারণ করে এবং উপসাগরসমূহ পাহাড়সমূহের মাঝখানে নিজেদের জায়গা করে নিয়ে এখানকার সৌন্দর্যকে চতুর্গুণ বৃদ্ধি করেছে। ওসলোর তিনদিনের এই অবস্থানকালে ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেবের উসিলায় আমরা প্রাকৃতিক এই অপূর্ব দৃশ্যাবলীকে খুব করে উপভোগ করি।

ট্রমসোতে

২১শে আগষ্ট বিকাল ৬টায় আমরা বিমানযোগে নরওয়ের উত্তরের শহর ট্রমসোর (Tromso) উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। প্রায় দু' ঘন্টা ওড়ার পর বিমান ট্রমসো বিমানবন্দরে অবতরণ করে। শহরটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণেও একটি দর্শনীয় স্থান। কিন্তু আমাদের জন্য এর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এটি স্ক্যানডিনাভিয়ার এমন বড় শহরসমূহের অন্যতম, যেখানে মে থেকে আরম্ভ করে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সূর্য মোটেও অস্ত যায় না। বরং প্রায় তিন মাস পর্যন্ত শুধুই দিন থাকে। আর

শীতকালে তিন মাস পর্যন্ত সূর্য উদয় হয় না। কেবলই রাত থাকে। যে তারিখে (২১শে জুলাই) আমরা সেখানে পৌঁছি, সেটি ছিল শহরে সূর্য অস্ত না যাওয়ার সম্ভবত শেষ দিন। আমরা বিকাল আটটার দিকে সেখানকার বিমানবন্দরে অবতরণ করি। দিনের আলোয় তখন তৃতীয় প্রহর বলে মনে হচ্ছিল। আমরা আসর নামায সেখানে পৌঁছে নয়টার দিকে পড়ি। খানা খাওয়ার পর কিছু সময় বিশ্রাম করে যখন (রাত) সাড়ে এগারোটার দিকে হোটেল থেকে বের হই তখন সেখানকার পরিবেশ এমন আলোকিত ছিল, যেমন আমাদের দেশে আসরের পর হয়।

ট্রমসো শহরের পূর্ব দিকে একটি পর্বতমালা রয়েছে, আরেকটি পর্বতমালা রয়েছে তার পশ্চিমে। এতদুভয়ের মাঝে সুদীর্ঘ একটি দ্বীপ রয়েছে, যার চতুর্দিকে উপসাগরের পানি ছড়িয়ে আছে। ট্রমসো শহরের অধিকাংশ জনবসতি দীর্ঘ এই দ্বীপের মাঝে অবস্থিত। তবে কিছু বসতি পূর্ব দিকের পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। দ্বীপকে পূর্ব দিকের পাহাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য মেহরাব সদৃশ সুদৃশ্য এক সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতু পার হয়ে পূর্ব দিকের পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছলে সেখান থেকে পশ্চিমের দিগন্ত সুস্পষ্ট দেখা যায়। রাত বারোটায় মানুষ সেখানে মধ্যরাতের সূর্য (Midnight Sun) দেখতে যায়। আমরাও একই উদ্দেশ্যে পূর্বের সেই পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছি। একটি ক্যাবলকারযোগে পাহাড়ের চূড়ায় যখন পৌঁছি, তখন রাত বারোটা বাজছিল। এই চূড়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে সমগ্র ট্রমসো শহরের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ের নীচেই সমুদ্র। পুলের ওপারে সুদূর বিস্তৃত শহর। তার পশ্চাতে আবার সমুদ্র–জল। তারপর পশ্চিমের পাহাড়সারি। পাহাড়–সারির উপর রাত বারোটায়ও সূর্য আলো বিকিরণ করছিল। সেদিন পশ্চিম দিগন্ত কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল বিধায় সূর্য দেখা যাচ্ছিল না। তবে তার থেকে উৎসরিত কিরণমালা মেঘের প্রান্তকে সোনালী বানিয়েছিল। তার আলোতে পুরো পরিবেশ তেমনই আলোকিত ছিল, যেমন আলোকিত থাকে সূর্যোদয়ের পর ভোরবেলা। রাত বারোটায় সূর্য পশ্চিম দিগন্তে যতটুকু নীচে এসেছিল, এটি ছিল তার সর্বনিম্ন বিন্দু। বারোটার পর সূর্য অস্ত না গিয়ে উত্তর দিকে ঘুরে পুনরায় উপরে উঠতে আরম্ভ করে।

প্রকৃত অবস্থা এই যে, ট্রমসো উত্তরে প্রায় সত্তর ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত। এটি উত্তর মেরুর নিকটবর্তী হওয়ার ফলে এখানে সূর্যের পরিভ্রমণ তীর্যক হয়ে থাকে। সুতরাং সূর্য কখনই মাথার উপর আসে না। বরং দিগন্তের প্রান্ত ধরে এমনভাবে অতিক্রম করে যে, রাত বারোটার পর তা উত্তর দিকে গিয়ে উপরে উঠতে থাকে। উত্তর থেকে পূর্ব দিকে পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক উঁচু হয়ে যায়। কিন্তু দুপুরে পূর্ব দিকে তার সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছে দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে গিয়ে নীচে নামতে আরম্ভ করে। অবশেষে রাত বারটায় পশ্চিমে পৌঁছতে পৌঁছতে একবারে নীচে চলে আসে। কিন্তু দিগন্তের নীচে অস্তমিত না হয়ে পুনরায় উত্তর দিকে পরিভ্রমণ আরম্ভ করে। তিন মাস পর্যন্ত এখানে তার পরিভ্রমণ এভাবেই চলতে থাকে, যার ফলে এ অঞ্চল তিন মাস পর্যন্ত রাতের অন্ধকার দেখতে পায় না। রাত বারোটায় দিনের আলো খুব বেশী হলে এতটুকু নিস্তেজ হয়ে আসে, আমাদের দেশে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে কিংবা সূর্যোদয়ের কিছু পরে যতটুকু হয়ে থাকে। বিধায় এই তিন মাস এখানে রাতদিন নির্ধারণ আলো ও অন্ধকারের ভিত্তিতে নয় বরং ঘড়ির ঘন্টার হিসেবে হয়ে থাকে। তাই যে সময়কে আমি রাতের বারোটা বলছি তার অর্থ এই নয় যে, সাধারণ নিয়মমাফিক এখন এখানে রাতের অন্ধকার বিরাজ করছে। বরং এর উদ্দেশ্য হল এখন ঘড়ির সময় অনুপাতে রাত বারোটা বেজে থাকে। যদিও দিনের আলো এ সময়েও বিদ্যমান। দূরবর্তী জিনিস এখন তেমনই দৃষ্টিগোচর হয় যেমন আমাদের দেশে মাগরিবের কিছু পূর্বে দৃষ্টিগোচর হয়।

আমরা যখন ট্রমসোর পূর্বদিকের পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছি, তখন পারিভাষিক অর্থে রাতের বারোটা বেজেছে। এ সময় সূর্য পশ্চিম দিগন্তে তার সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছেছে। কিন্তু বারোটা বাজার পর তা উত্তর দিকে ঝুঁকে গিয়ে পুনরায় উপরে উঠতে আরম্ভ করে। মধ্যরাতে সূর্যের এই বিস্ময়কর কাণ্ড এবং তার বিকীর্ণ আলোতে অপরূপ এই শহরের চতুর্পার্শ্বের এই দৃশ্য এতই মনোহরী ছিল যে, এই পাহাড়ের তীরে যে পর্যবেক্ষন স্থান (View Point) নির্মিত হয়েছে সেখান থেকে সরে আসতে মন চাচ্ছিল না। কিন্তু তীব্র শীতের তুষার বায়ু অল্পকাল পর আমাদেরকে

সেখান থেকে সরে এসে তৎসংলগ্ন নির্মিত রেস্তোরাঁভ্যন্তরে উপবেশন করে কাঁচ–প্রাচীরের মধ্য দিয়ে সূর্যের এই গতিবিধি দেখতে বাধ্য করে। রেস্তোরাঁর ভিতরেও সূর্যের বিস্তৃত আলো পৌঁছুচ্ছিল। কিন্তু যেহেতু পারিভাষিক অর্থে তখন রাতের সাড়ে বারোটা বেজেছিল তাই রেস্তোঁরার মালিক লৌকিকভাবে টেবিলে টেবিলে প্রদীপ জ্বালিয়েছিল। কিন্তু তা সূর্যের আলোর সম্মুখে প্রদীপ বৈ আর কিছু ছিল না।

রাত একটার সময় আমরা সেই পাহাড় চূড়া থেকে অবতরণ করি। যখন আমরা পুনরায় হোটেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি, তখন সূর্য উপরে উঠে গিয়েছিল। সাড়ে এগারোটার সময় আমরা এখানে আসার কালে যেমন আলো দেখেছিলাম এখন তার চে' অধিক আলো বিরাজ করছিল। এখানে আমরা ওসলোর হিসেবে নামায আদায় করছিলাম বিধায় ওসলোর হিসাব মতে ফজরের ওয়াক্ত হতে প্রায় আধা ঘন্টা সময় বাকী ছিল। আমি এই আধাঘন্টা সময়ে দ্রুত পায়ে হাঁটার অভ্যাসটি পুরো করি। আমাদের হোটেলটি সমুদ্র থেকে আসা উপসাগরের একটি তীরে অবস্থিত ছিল। তৎসংলগ্ন একটি বন্দর ছিল। সমুদ্রের তীর ধরে আমি হাঁটতে থাকি। সমুদ্রের মাঝে অদ্ভূদ ধরনের কিছু মাছ খেলা করছিল। কিছুক্ষণ পর পর সেগুলো লাফিয়ে সমুদ্রের উপরে উঠে আসছিল। আবার কয়েক মুহূর্তেই সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিয়ে সমুদ্রের বুকে পানির সুদৃশ্য এক বৃত্ত তৈরী করছিল। সমুদ্র বুকে তাদের সুদূর বিস্তৃত উচ্ছলতার ধ্বনি এবং তাদের বানানো বৃত্তসমূহ মাছের এক প্যারেডের দৃশ্য তুলে ধরছিল। বহু বছর পূর্বে অনেকটা এমনই একটি দৃশ্য আমি উমরার এক সামুদ্রিক সফরে ভোরবেলায় আরব সাগরেও দেখেছিলাম। হাজার হাজার মাছ একই মুহূর্তে লাফিয়ে সমুদ্রের উপরে উঠে আসত এবং পরমুহূর্তেই একযোগে সমুদ্রতলে চলে যেত। তখন অভিজ্ঞ লোকেরা বলেছিল, সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের কিরণ লাভের জন্য মাছ এমনটি করে থাকে। কিন্তু এটি সামুদ্রিক এই জীবের পক্ষ থেকে ভোরবেলার এবাদতের একটি আঙ্গিক হওয়া অসম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআন বলেছে—

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

অর্থ ঃ 'এবং প্রতিটি বস্তুই তার প্রশস্তি সহকারে মহিমা ঘোষণা করে। কিন্তু তোমরা তাদের সে মহিমা ঘোষণা অনুধাবন করতে পার না।'

দু'টার দিকে আমরা ফজর নামায জামায়াতের সাথে আদায় করি। তারপর ঘুমানোর জন্য নিজ নিজ কক্ষে চলে যাই। কক্ষের জানালা সমুদ্রমুখী উন্মুক্ত ছিল। সেখান দিয়ে সূর্যের আলো কক্ষমাঝে এমনভাবে ছড়িয়েছিল, যেমন সকাল সাতটা–আটটার সময় হয়ে থাকে। প্রতি মুহূর্তে সে আলো বেড়ে চলছিল। তাই ঘুমানোর জন্য কামরার মধ্যে কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করতে জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দেই। পর্দা হালকা রঙ্গের ছিল বিধায় তারপরেও রাতের মত অন্ধকার হল না। দীর্ঘ বিশ ঘন্টা জেগে থাকার পর শরীর ক্লান্তিতে যদি অবশাদগ্রস্ত না হত তাহলে ঘুম আসা বড়ই কঠিন হত। এ মুহূর্তে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি স্মরণ হল ঃ

اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ

এ সময় বুঝতে পারলাম রাতের অন্ধকারও আল্লাহ তাআলার কত বড় নেয়ামত, আমরা নিত্যদিন যা লাভ করে থাকি। কিন্তু আমরা এ নেয়ামতের কথা বুঝতেও পারি না। শোকরও আদায় করি না। যে অঞ্চলে আমরা এখন অবস্থান করছিলাম তাতো সারা দুনিয়ার হিসাবে একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্থান। সেখানে মানুষের বসবাসও খুব কম। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা দিন ও রাতে নিদ্রা ও জাগৃতির এমন ব্যবস্থাপনা তেরী করে দিয়েছেন যে, ঘুমানোর সময় হলেই পরিবেশের উপর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়। সমস্ত মানুষকে একই সময়ে নিদ্রার দিকে ধাবিত করা হয়। আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) বলতেন ঃ 'সারা পৃথিবীর মানুষ কি আন্তর্জাতিক কোন কনফারেন্স ডেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, সমস্ত মানুষ রাতের বেলা ঘুমাবে? এটি কি সম্ভব ছিল না যে, এক ব্যক্তি ঘুমুতে চাচ্ছে আর অপর ব্যক্তি তখন ঘুম শেষ করে এমন কাজ করতে চাচ্ছে যার আওয়াজে পূর্বের ব্যক্তির ঘুমানো অসম্ভব হচ্ছে। তিনি কে,

যিনি এক ভূখণ্ডের সমস্ত মানুষকে একই সময়ে ঘুমানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন?

تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ।'

যাই হোক কামরার মধ্যে কৃত্রিম রাত সৃষ্টি করে আমরা ঘুমালাম। ফজর নামায পড়ে শুয়েছিলাম বিধায় সকাল আটটা পর্যন্ত ঘুমাতে কোন সমস্যা ছিল না। এভাবে দু'টা পর্যন্ত জাগা সত্ত্বেও ছয় ঘন্টার ঘুম পুরো হল। আমাদের মেজবান এবং এ সফরে আমাদের পথপ্রদর্শক ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেব রসায়নে পি.এইচ.ডি,। তিনি ওসলোর এমন একটি প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতম অফিসার, যা বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর গুণগত-মান যাচাই করে থাকে। এ কাজের জন্য তাঁকে নরওয়েতেই শুধু নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশের ল্যাবরেটরীসমূহের যাচাইয়ের জন্য এবং সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানের জন্য খুব বেশী ভ্রমণ করতে হয়। একই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিবছর কয়েকবার ট্রমসো এসে থাকেন। এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তিনি বললেন যে, ট্রমসোতে একটি জাদুঘর রয়েছে, যা উত্তর মেরু ও তার আশেপাশের অঞ্চলসমূহের বিরল বিস্ময়কর বস্তুসমূহের জাদুঘর। এটি 'পোলার মিউজিয়াম' (Polar Museum) অর্থাৎ 'উত্তর মেরুর জাদুঘর' নামে প্রসিদ্ধ এবং একটি দর্শনীয় স্থান।

এই জাদুঘর আমাদের অবস্থান কেন্দ্র থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না। তাই আমরা পায়ে হেঁটে জাদুঘরে যাই। আমাকে বলা হয়েছিল যে, ট্রমসোতে মুসলমান অধিবাসীও রয়েছে। আমার মনের বাসনা ছিল, এখানকার কোন মুসলমানের সঙ্গে যদি সাক্ষাত হতো! তাহলে তার থেকে এখানকার মুসলমানদের ব্যাপারে কিছু তথ্য জানতে পারতাম যে, তারা এখানে কিভাবে বসবাস করে? কোন মসজিদ আছে কিনা? অস্বাভাবিক দিনগুলোতে তারা কিভাবে নামায পড়ে? ইত্যাদি। ইচ্ছা করেছিলাম, জাদুঘর দেখার পর কোন মুসলমানের মাধ্যমে মসজিদের খবর নিব। কিন্তু জাদুঘরে যাওয়ার পথে যখন আমরা উভয়দিকে দোকানবিশিষ্ট একটি সড়কের উপর দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন

একটি মুদির দোকানের দরজায় ঝুলানো বোর্ডে কিছু আরবী শব্দ লিখিত বলে মনে হল। আমি ঐ বোর্ডটি দেখছিমাত্র, এমন সময় ভিতর থেকে দোকানদার 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলল। আমি সজাগ হয়ে লক্ষ্য করি—'এ ভূখণ্ডে আবার সালাম এল কোত্থেকে?' তখন দোকানের কাউন্টারে একটি আরব তরুণকে দণ্ডায়মান দেখতে পাই। সে আলজেরিয়ার লোক। আমরা নিঃসংকোচে দোকানে প্রবেশ করি। সে বলল, এখানে অনেক মুসলমান অধিবাসী রয়েছে। তাদের বেশীর ভাগ সোমালিয়ার আরব মুসলমান। অন্যান্য দেশের লোকও রয়েছে। সেই বলল যে, ট্রমসোতে একটি মসজিদও রয়েছে। যে সময় এখানে অবিরাম দিন বা রাত চলতে থাকে তখন ওসলোর নামাযের সময় অনুপাতে এখানে নামায পড়া হয়। সম্প্রতিকালে একটি তাবলীগ জামাতও এখানে এসে গেছে। এই মুসলমানটির সঙ্গে মিলিত হয়ে আত্মিক পুলক লাভ করি।

উত্তরমেরুর জাদুঘর

তারপর আমরা 'পোলার মিউজিয়ামে' প্রবেশ করি। মিউজিয়ামটির প্রেক্ষাপট এই যে, পঞ্চদশ ও ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীতে উত্তর মেরুর দিকে বৈজ্ঞানিক ও ভৌগলিক গবেষণা ও পর্যটনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত অভিযান চালানো হয়, ট্রমসো শহর ছিল এ সমস্ত অভিযানের সূচনা বিন্দু। অর্থাৎ এ সমস্ত অভিযান ট্রমসোর বন্দর কেন্দ্র হতে যাত্রা করত। এখান থেকেই এ উদ্দেশ্যে জাহাজ ক্রয় করা হত বা ভাড়া নেওয়া হত। এ লক্ষ্যে শ্রমিক ও কর্মচারীও এখান থেকেই সংগ্রহ করা হত। স্বভাবতই যখন এ সমস্ত অভিযান উত্তর মেরু ভ্রমণ করে প্রত্যাবর্তন করত তখন সর্বপ্রথম ট্রমসোর বন্দর কেন্দ্রেই এসে অবতরণ করত। তাই এ সমস্ত অভিযানের ফলাফল সর্বপ্রথম এ শহরেই এসে পৌছত। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত কাষ্টমের একটি গুদাম ঘরকে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে এ সমস্ত অভিযানের প্রাপ্ত ফলাফলের জাদুঘর বানানো হয়, যা এ সমস্ত অভিযানের স্মারক এবং সে সময়ের সংগৃহিত বিস্ময়কর বস্তুসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। উত্তর মেরুর নিকটবর্তী দ্বীপ 'স্ভালবার্ড (Svalbard) পর্যন্ত পৌছার জন্য উত্তরের বরফ সাগর

অতিক্রম করতে হয়। এটি বরফের ন্যায় জমাট একটি সাগর। এর মধ্যে কিছু অতি ভয়ংকর হিংস্রপ্রাণী—যেমন তুষার ভল্লুক পাওয়া যায়, যা মানুষকে জীবিত ছাড়ে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে বুদ্ধি নামক এমন এক নেয়ামত দান করেছেন, যাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ নিজের থেকে বহুগুণ শক্তিশালী প্রাণীকে বশে আনতে পারে। সুতরাং উত্তর মেরুর দিকে প্রেরিত অভিযানসমূহের সদস্যরা তুষার ভল্লুক শিকার করার পদ্ধতিও আবিস্কার করে। এই পোলার মিউজিয়ামে এক ব্যক্তির স্মারকসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। তার নাম হেনরী রুডি (Henry Rudy)। তাকে 'তুষার ভল্লুকের সম্রাট' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তার সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল তুষার ভল্লুক শিকার করা। সে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তের মধ্যবর্তী সময়ে ৭১৩টি তুষার ভল্লুক শিকার করেছিল।

আমি এ জাতীয় মানবাভিযানের কৃতিত্ব থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করি যে, মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের সাহস ও সংকল্পকে অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছেন। মানব–সাহস এমন একটি রাবার, যাকে মানুষ যত ইচ্ছা লম্বা করতে পারে। উত্তরমেরু ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের ভ্রমণ একটি চরম দুস্কর ব্যাপার। প্রথমতঃ সেখানকার শীত এত তীব্র যে, সমুদ্র পর্যন্ত জমাট হয়ে যায়। এর সামান্য অনুমান এ থেকে করা যেতে পারে যে, ট্রমসো ও নর্থকেইপে (আমাদের অবস্থানকালে) এই গ্রীষ্ম ঋতুতেও তাপমাত্রা হিমাংকের নিকট অবস্থান করছে। অথচ এ অঞ্চল মূল উত্তরমেরু থেকে প্রায় ত্রিশ ডিগ্রী আগে। তাহলে খোদ মেরু অঞ্চলে বা স্ভালবার্ড (Svalbard) দ্বীপে শীত কত বেশী হবে? উপরন্তু যেই তুষার ভল্লুককে বিশ্বের ভয়ংকরতম হিংস্র প্রাণীর মধ্যে গণ্য করা হয়, উষ্ণ এলাকার অধিবাসী একজন মানুষের পক্ষে তার সঙ্গে লড়া মৃত্যুর সঙ্গে লড়ারই নামান্তর। কিন্তু যখন মানুষ সংকল্প করেছে এবং এজন্য সাহসে কোমর বেঁধেছে, তখন আল্লাহ তাআলা তার সাহসকে এমন শক্তি দিয়েছেন যে, একজন মানুষ ধ্বংসাত্মক এই শীতের মধ্যে এমন এক বিরান অঞ্চলে সাত শতাধিক ভয়ংকর ভল্লুক শিকার করতে সফল হয়েছে। অথচ ভল্লুক শিকার করা এমন কোন উচ্চতর লক্ষ্য নয়, যার জন্য প্রাণকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে হবে। এর ফল তো শুধুমাত্র এতটুকু

যে, এই ব্যক্তির নাম শুধুমাত্র ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে উজ্জ্বল হয়েছে, যারা ট্রমসোর পোলার মিউজিয়ামে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখেছে এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য তার সাহস ও বীরত্বকে ধন্যবাদ দিয়েছে। ব্যাস এতটুকুই। এর অধিক তার আর কোন প্রাপ্তি নেই।

এখানে শিক্ষা গ্রহণের বিষয় এই যে, মানবের এই সাহস ও সংকল্প—যার মধ্যে এত অদৃশ্য শক্তি সুপ্ত রয়েছে—তা যদি উচ্চতর কোন লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা কত অলৌকিক ব্যাপারই না দেখাতে পারে। মানুষ বলে থাকে যে, আমাদের দ্বারা শরীয়তের ফরয ও ওয়াজিব কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, কিংবা গোনাহ থেকে বাঁচা আমাদের জন্য কঠিন। কিন্তু সেই মানবীয় সাহস, যা সীসাকে মোম বানিয়েছে, যা তুষার ও অগ্নির সঙ্গে লড়াই করেছে, যা সমুদ্র চিরে ও পাহাড় বিদীর্ণ করে ইচ্ছামত পথ তৈরী করেছে, যা বনের হিংস্র প্রাণী ও তুষার ভল্লুককে বশ করেছে সেই মানবীয় সাহস কি তার স্রষ্টা ও মনিবের আনুগত্যের উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনে এতই দুর্বল যে, তার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায, একমাসের রোযা আর কিছু মন্দ চরিত্রকে পরিহার করা অসম্ভব? তাই যখন বুযুর্গগণ বলেন যে, সাহস প্রয়োগ করে ফরয কাজগুলো সম্পাদন করো, আর পাপ কাজ থেকে বিরত থাকো, তখন তাঁরা মানুষের ঐ গোপন শক্তির দিকেই ইঙ্গিত করেন, যা দৃঢ় সংকল্প, প্রশিক্ষণ ও অবিচলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হলে অফুরন্ত সম্ভাবনার (Potentials) দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে এবং মানুষ তার মাধ্যমে জটিল থেকে জটিলতর কাজকে সহজ করতে পারে।

এই জাদুঘরেই উত্তরের জমাট সাগরে প্রাপ্ত জলজপ্রাণীর নমুনাসমূহও কাঁচের শোকেসে সংরক্ষিত রয়েছে। তার মধ্যে বিরল ও বিস্ময়কর আকৃতির মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী, সীল ইত্যাদি রয়েছে। তুষার শৃগাল ও উত্তরাঞ্চলের ১২ শিংবিশিষ্ট হরিণ ইত্যাদির নমুনাও প্রদর্শনের জন্য এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। সমুদ্রের বিশেষ করে উত্তর সাগরের বিভিন্ন ঋতুর পরিস্থিতিও দেখানো হয়েছে। এক জায়গায় এটিও দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে সমুদ্রগর্ভে ঘুর্ণন সৃষ্টি হয়। তার ফল কি হয়। এক জায়গায় দেখানো হয়েছে যে, উত্তর সমুদ্রের একটি অংশ তার মূল

তাপমাত্রার দিক থেকে তো ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যাওয়ার মত, কিন্তু সমুদ্রের উপরভাগের তল দিয়ে গরম পানির এমন একটি স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, যা আমেরিকার কোন সাগর থেকে প্রবাহিত এই অঞ্চলে আসছে। গরম পানির এই স্রোতের ফলে সমুদ্রের উপরিভাগ জমাট বাঁধা থেকে রক্ষা পায়, যার ফলে এখান দিয়ে জাহাজ চালানো সম্ভব হয়।

تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ।'

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, স্ভালবার্ড (Svalbard), যা ট্রমসো থেকে ৯৩০ কিলোমিটার দূরে, প্রায় ৮১ ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত। অর্থাৎ মূল উত্তরমেরু থেকে মাত্র নয় ডিগ্রী দূরে অবস্থিত। এ দ্বীপটি সম্পূর্ণরূপে জনবসতিশূন্য, তবে দ্বীপের দক্ষিণের যে সমস্ত অঞ্চল বাহাত্তর ডিগ্রী অক্ষাংশের নিকটবর্তী সেখানে কিছু বসতি রয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা উত্তরমেরুর অবস্থা যাচাইয়ের জন্য এখানে একটি ষ্টেশনও বানিয়েছে। সেখানে গবেষণার টিম যেয়ে থাকে। কারণ, উত্তরমেরুর নিকটবর্তীতম স্থলভাগ এটিই। প্রশাসনিক দিক থেকে এই দ্বীপ নরওয়ে সরকারের অধীনে। তবে একটি চুক্তির অধীনে নরওয়ে ও রাশিয়া উভয়ে এখানকার খনি খনন করে কয়লা উত্তোলন করে থাকে। ট্রমসোর পোলার মিউজিয়ামে এই দ্বীপটি ভ্রমণ করানোরও বড় চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে এ দ্বীপের দৈর্ঘে-প্রস্থে ভ্রমণ করে তার দৃশ্যাবলীর একটি ভিডিও ফিল্ম তৈরী করেছে। এই জাদুঘরের একটি হলকক্ষে এ সমস্ত দৃশ্য দেখানোর জন্য একটি পেনারমিক স্ক্রীন তৈরী করা হয়েছে। এটি হলকক্ষের সম্মুখস্থ প্রাচীরকে বেষ্টন করে রেখেছে। এই ফিল্ম যখন ঐ স্ক্রীনের উপর Three Dimensional ছবিরূপে দেখানো হয়, তখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, সে নিজেই হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ঐ দ্বীপ ভ্রমণ করছে। যেহেতু দ্বীপটি সম্পূর্ণটাই জনবসতিশূন্য, তাই সেখানে কোন মানুষের অস্তিত্ব কল্পনার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু দ্বীপের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী—পাহাড়, তুষার স্তূপ (Glaciers) জমাট সমুদ্রের উপসাগর, কোথাও কোথাও প্রবাহিত জলপ্রপাত আরো নাজানি মহান আল্লাহর শিল্পকর্মের কত বিস্ময়কর রাজকর্মসমূহ—এমনভাবে চোখের সামনে

ধরা দেয় যে, অন্তর্দৃষ্টি থাকলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবে—

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

'হে প্রভু! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি।'

নর্থ কেইপের সমুদ্র ভ্রমণ

জাদুঘর দেখে শেষ করতে করতে দু'টা বেজে গিয়েছিল। আমাদেরকে তিনটার পর আরো সম্মুখস্থ নর্থ ক্যাপ (North Cape) যাওয়ার জন্য সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করতে হবে। তাই আমরা যোহর নামায ও দুপুরের আহার শেষ করে বন্দরের দিকে যাই। বন্দরটি হোটেলের খুব নিকটেই ছিল। এখান থেকে ভেস্টেরালিন (Vesteralin) নামের একটি জলজাহাজে আরোহণ করি। এটি মাঝারি ধরনের একটি ছ' তলা বিশিষ্ট জাহাজ। এর মধ্যে যাত্রীদের আরাম-আয়েশ ও সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। বিকাল পাঁচটায় জাহাজ ট্রমসো বন্দর থেকে ক্রমশ চলতে আরম্ভ করে। অল্পক্ষণের মধ্যে ট্রমসোর উপসাগর হতে বের হয়ে বড় সমুদ্রে প্রবেশ করে। যে সাগরের মধ্য দিয়ে আমরা ভ্রমণ করছি সেটি মূলতঃ আটলান্টিক মহাসাগর থেকে উত্তর দিকে এসেছে। গোড়ার দিকে একে উত্তর সাগর (North Sea) বলা হয়। নরওয়ের সীমান্তে প্রবেশ করে এর নাম হয়েছে নরওয়ে সাগর (Norwegian Sea)। এ সাগরটিকেই উত্তরে ৬৬ ডিগ্রী অক্ষাংশে পৌঁছে তুষার অঞ্চলে (Arctic Zone) [১] প্রবেশ

---

১. ভূগোলের পরিভাষায় আর্কটিক সার্কেল (Arctic Circle) পৃথিবীর ঐ অংশকে বলে, যা উত্তরে ৬৬ ডিগ্রী ৩৩ মিনিট অক্ষাংশ থেকে ৯০ ডিগ্রী (উত্তর মেরু) পর্যন্ত বিস্তৃত। এটিই সেই অঞ্চল, যেখানে বছরের কিছু দিন এমন আসে, যখন গ্রীষ্মকালে সূর্যাস্ত হয় না আর শীতকালে সূর্যোদয় হয় না। ৬৬ ডিগ্রী ৩০ মিনিট থেকে দ্রাঘিমাংশ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে গ্রীষ্মে দিন আর শীতে রাত ততই দীর্ঘ হতে থাকে। এমনকি ৯০ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ (উত্তরমেরু)তে পৌঁছে ছয় মাস থাকে দিন আর ছয় মাস থাকে রাত। দক্ষিণে এরই বিপরীতে ৬৬ ডিগ্রী থেকে ৯০ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ পর্যন্তর অঞ্চলকে দক্ষিণ মেরু বৃত্ত (Antarctic Circle) বলা হয়। সেখানেও রাত দিনের এই অবস্থা বিরাজ করে। তবে সেখানে কোন বসতি অঞ্চল এই বৃত্তের মধ্যে পড়ে না।

করলে আর্কটিক মহাসাগর (Arctic Ocean) বলা হয়।

ট্রমসো যেহেতু জমাট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, তাই এখান থেকে উত্তরমেরু পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাগরকে 'আর্কটিক মহাসাগরই' বলা হয়। এ অঞ্চলটি ছোট ছোট সুদৃশ্য দ্বীপে ভরা। সুতরাং কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত এই সামুদ্রিক ভ্রমণে জাহাজের ডানে-বামে সবুজ শ্যামল পাহাড় আর তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী এবং উপর থেকে পতিত জলপ্রপাত বড় হৃদয়কাড়া দৃশ্য তুলে ধরছিল। আমরা আসর নামায ওসলোর সময়মত প্রায় আটটার সময় জাহাজের ডেকের উপর আযান দিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করি। জাহাজের ষষ্ঠতলায় সীসা ঘেরা একটি হলকক্ষ রয়েছে। তাতে যাত্রীদের বসার জন্য চেয়ার ও টেবিল বসানো আছে। আসর নামাযের পর আমরা ঐ হলকক্ষে বসে উভয়দিকের স্বচ্ছ কাঁচ ভেদ করে সমুদ্রের প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করতে থাকি। সূর্য তো অস্তই যাবে না, তাই যখন রাত সাড়ে দশটা বাজল, তখন আমরা ওসলোর সময় মত মাগরিবের নামায আদায় করি। এ সময় সূর্য বেশ উঁচুতে ছিল। তবে মেঘ ঢাকা ছিল। তার বিক্ষিপ্ত কিরণমালা মেঘের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। ডেকের উপর ছিল তীব্র শীত। তুষার বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। তাই আমরা সীসাঘেরা লাউঞ্জ থেকে এ দৃশ্য উপভোগ করতে থাকি। যখন রাত বারোটা বাজল, তখন সূর্য দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু তখন মেঘ আরো গাঢ় হয়েছিল। জাহাজ ছোট ছোট উপসাগর থেকে বের হয়ে এসে আর্কটিক মহাসাগরের খোলা অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে জাহাজ দুলছিল। তবে গাঢ় মেঘ থাকা সত্ত্বেও পুরো পরিবেশে সূর্যের এতটুকু আলো বিরাজ করছিল—আমাদের অঞ্চলে মাগরিবের একটু পূর্বে যতটুকু থাকে। নিয়মমাফিক ১২টার পর সূর্য উত্তর দিকে চলে গিয়ে আবার উপরে উঠতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ আলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমরা ফজর নামাযের অপেক্ষায় ছিলাম, যা আমাদেরকে ওসলোর হিসাব মতে পড়তে হবে। তাই আমরা দু'টা পর্যন্ত জেগে থাকি। এ সময়ের মধ্যে সমুদ্রবক্ষে বিস্তৃত সূর্যালোক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আকাশে মেঘ না থাকলে নিশ্চয়ই রোদ দেখা যেত।

ঠিক দু'টার সময় জাহাজ উন্মুক্ত সাগর থেকে দু'টি দ্বীপের মধ্যবর্তী

উপসাগরে প্রবেশ করে। দেখতে দেখতেই জাহাজ ছোট একটি বন্দর কেন্দ্রে নোঙর ফেলে। এটি ছোট একটি শহর। নরওয়ের ভাষায় যার নাম Oksfjord লেখা ছিল। এর সঠিক উচ্চারণ আমি করতে পারিনি। এটি জেলেদের বসতি। যা তিন দিক থেকে পাহাড় ও একদিক থেকে সমুদ্রবেষ্টিত। রাত দু'টা বাজছিল কিন্তু দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সূর্যের আলো বিস্তৃত ছিল। জাহাজ এখানে মাত্র পনের মিনিট দাঁড়ায়। তারপর পুনরায় আর্কটিক মহাসাগরের দিকে রওয়ানা করে। আমরা ফজর নামায পড়ে আমাদের কেবিনে চলে আসি। কেবিনের জানালা দিয়ে সমুদ্র ও তার পশ্চাতের সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। দিনের আলো জানালা দিয়ে কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করছিল। কিন্তু ঘুমাতে হবে বিধায় জানালায় যতদূর সম্ভব পর্দা দিয়ে কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টির চেষ্টা করি। সারাদিনের ক্লান্তির কারণে তাড়াতাড়িই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন প্রায় সাতটা বেজে গেছে। জাহাজ উন্মুক্ত সাগরবক্ষে ঘন্টাপ্রতি ১৮ সামুদ্রিক মাইল গতিতে ধেয়ে চলছিল। আরো তিন ঘন্টা পরিমাণ সফর করার পর দিগন্তে আমাদের গন্তব্য দেখা যেতে থাকে। এটি ছিল উত্তরে পৃথিবীর শেষ আবাদ শহর হোনিন্সভোগ (Honninsvog)।

হোনিন্সভোগে 'মূল ছায়া'

দিনের এগারোটার কাছাকাছি আমরা ঐ শহরের বন্দরে যখন অবতরণ করি, তখন আকাশ একেবারে পরিষ্কার ছিল। চতুর্দিকে খুব রোদ ছড়িয়েছিল। আমরা গত দু'দিন ধরে দিনের আলোতেই রয়েছি। রাতের অন্ধকার দেখেছি প্রায় বাহাত্তর ঘন্টা হয়ে চলছে। এ পুরো সময়টিতে আকাশ বেশীর ভাগ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু হোনিন্সভোগে যেহেতু ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে ছিল তাই এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল যে, সূর্য মধ্যাহ্ন রেখা দিয়ে অতিক্রমকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে অধিক হয়। আমাদের স্বাভাবিক অঞ্চলসমূহে সূর্য যখন মধ্যাহ্ন রেখায় পৌঁছে, তখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া খুব ছোট হয়ে যায়। এই ছায়াকে ফকীহদের পরিভাষায় 'ছায়ায়ে আসলি' বা 'মূল ছায়া' বলে। যে

ভূখণ্ডে দ্রাঘিমাংশ যত কম হবে তার মূল ছায়া তত ছোট হবে। এমনকি যে সমস্ত দেশ বিষুবরেখার নীচে অর্থাৎ শূন্য দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত, সেখানে এ ছায়া মোটেও থাকে না। এ কারণেই আমাদের ফকীহগণ বলেছেন যে, আসরের সময় তখন শুরু হয়, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার থেকে দ্বিগুণ হয়ে যায়, তবে এই দ্বিগুণ হওয়া মূল ছায়ার অতিরিক্ত হতে হবে। কিছু বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোক ফকীহদের এই কথার উপর আপত্তি উঠিয়েছেন যে, হাদীসে ছায়া একগুণ বা দ্বিগুণ হওয়া তো উল্লেখ আছে, কিন্তু 'মূল ছায়া' বাদ যাওয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ফকীহগণ নিজেদের পক্ষ থেকে এটি সংযোজন করেছেন। কিন্তু এখানে এসে ঐ সমস্ত ফকীহের কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কারণ 'মূল ছায়া' বাদ দেওয়া না হলে ঠিক মধ্যাহ্নেই ছায়া একগুণের অধিক হয়ে যায়। কাজেই ফকীহদের একথা সাধারণ জ্ঞান (Common sense)এর কথা, যার জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। এটি ভিন্ন কথা যে, একটি হাদীসেও এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

'হোনিন্সভোগ' ছোট একটি উপকূলীয় শহর। এরপর উত্তরমেরু পর্যন্ত অন্য কোন বসতি নেই। তাই এটি এদিকে পৃথিবীর শেষ শহর। এখানে কিছু সময় বিশ্রাম করার পর আমি কয়েক ঘন্টা সময় আমার মা'আরিফুল কুরআনের কাজে লিপ্ত থাকি। তারপর বিকাল ছয়টার দিকে আমি পদচারণার জন্য সমুদ্র তীরে বের হলে পথে কয়েকজন সোমালিয়ান মুসলমানের সাক্ষাত পেয়ে যাই। তারা বললেন যে, ছোট এই শহরেও সাত আট জন সোমালিয়ান এবং চার পাঁচজন ইরাকী মুসলমান থাকে। কোন মসজিদ তো নেই, তবে কোন ঘরে কখনও কখনও তারা জামাআতের সাথে নামায পড়ে থাকে। আমি তার কাছে এ ব্যাপারে কিছু কথা নিবেদন করলাম। আল্লাহ করুন যেন তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং পৃথিবীর এ শেষ প্রান্তেও আল্লাহর নাম স্বতন্ত্রভাবে উঁচু হতে থাকে।

সমুদ্রতীর সংলগ্ন পর্যটন কেন্দ্রিক স্মারকসমূহের একটি দোকান রয়েছে। সেই দোকানে তুষার এলাকার (Arctic Region) প্রসিদ্ধ তুষার ভল্লুকের একটি প্রকৃত কংকাল সংরক্ষিত আছে। অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি

তুষার ভল্লুক শিকার করে তার নাড়িভূড়ি বের করে চামড়াটি এভাবে সাজিয়ে রেখেছে যে, তাকে সম্পূর্ণ জীবিত ভল্লুক মনে হয়। আমি তার শ্বেতশুভ্র পশম হাত দ্বারা স্পর্শ করি। তা এতই মোলায়েম ও মসৃণ ছিল যে, তার উপর বারবার হাত ফিরাতে মন চাচ্ছিল। সুন্দর ও মোলায়েম এই পশমের নীচে রয়েছে তার মোটা চামড়া। আল্লাহ তাআলার অপার মহিমা ও নিপুণ কর্ম কুশলতার কারিশমা যে, তিনি এমন একটি ভয়ংকর হিংস্র প্রাণীকে এত সুন্দর ও এত মোলায়েম পোশাক দান করেছেন। একে দেখে আমার চিন্তা এদিকে ধাবিত হল যে, এটি গোনাহের স্বাদ ও রঙ্গের একটি বাস্তব নমুনা। তার উপরদিকে স্বাদ ও সৌন্দর্য বিরাজ করে ঠিকই কিন্তু পরিণতির দিক থেকে তা ভয়ংকর হিংস্র প্রাণীর চেয়ে কম নয়। যা মানবের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। হাঁ, তবে যদি কেউ এই হিংস্র প্রাণীকে শিকার করে তার মধ্য থেকে পাপের উপাদান বের করে ফেলে তাহলে সে এর স্বাদ ও সৌন্দর্যকে ইহকালেও উপভোগ করতে পারে।

এ দোকানেই এ অঞ্চলে সূর্যের পরিভ্রমণের দৃশ্য সম্বলিত একটি ছবিও পাই। সেই ছবিতে জনৈক ব্যক্তি রাত ৮টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত প্রত্যেক ঘন্টায় সূর্যের বিভিন্ন অবস্থানের চিত্র ধারণ করে সব কয়টি চিত্রকে একত্রিত করেছে। এই চিত্র দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাত ৮টার পর ১২টা পর্যন্ত সূর্য কিভাবে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে নামতে থাকে এবং বারোটার সময় দিগন্তের একেবারে নিকটে পৌঁছে তা পুনরায় উত্তর দিকে উপরে উঠতে থাকে। অবশেষে রাত চারটায় তা উত্তরে এতটুকু উপরে উঠে যায়, আটটার সময় দক্ষিণে যতটুকু উপরে ছিল। এর সব কয়টি চিত্রকে মেলালে একটি সোনালী কণ্ঠহারের দৃশ্য দেখা যায়। এবং বোঝা যায় যে, দক্ষিণ ও উত্তরে তার উচ্চতায় কোথাও পশম বরাবর তফাৎও সৃষ্টি হয় না।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

‘অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ।’

সূর্য তো ডুববে না, তাই আমরা মাগরিব নামায সাড়ে দশটা বাজলে এমন অবস্থায় আদায় করি, যখন সম্মুখে উজ্জ্বল রোদ বিস্তৃত ছিল।

হোনিন্সভোগ শহর থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে সেই প্রসিদ্ধ জায়গাটি, যা নর্থ কেইপ (North Cape) নামে প্রসিদ্ধ। এটি কোন জনবসতি নয়, বরং উত্তরে পৃথিবীর স্থলভাগের শেষ প্রান্ত, যার পর উত্তর মেরু পর্যন্ত এই সমুদ্র ছাড়া অন্য কিছু নেই। যা আরো সম্মুখে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে গেছে, এবং তাকে আর্কটিক মহাসাগর বলা হয়। আমরা চাচ্ছিলাম যে, পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে আমরা মধ্যরাতে (রাত ১২টা) পৌঁছি এবং এশার নামায সেখানেই আদায় করি। সুতরাং রাত এগারোটার দিকে আমরা একটি কোচে আরোহণ করে নর্থকেইপের দিকে রওয়ানা হই। শহর থেকে বের হওয়ার পর পাহাড়, উপত্যকা ও উপসাগরের এক সুদৃশ্য ধারা আরম্ভ হয়, বিশেষ যে বিষয়টি আমি লক্ষ্য করি তা এই যে, কয়েক বছর পূর্বে আমি দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত (South Cape) পর্যন্ত গিয়েছিলাম, যাকে দক্ষিণে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত বলা উচিত। সেখানকার ভূমির উঁচু নীচু এবং সাধারণ দৃশ্যাবলীও এই উত্তর প্রান্তের সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। পার্থক্য এই যে, এখানকার পাহাড়সমূহের উপর জায়গায় জায়গায় বরফ জমাট বাঁধা দেখা যাচ্ছিল, আর শীত ছিল হিমাংকের কাছাকাছি। কিন্তু সাউথ কেইপের দ্রাঘিমাংশ যেহেতু এত অধিক নয় (তা প্রায় ৪৫ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত), তাই সেখানে শীত ও তুষারের এই দৃশ্য চোখে পড়ে না। কিন্তু উভয় স্থানের জমিনের সাধারণ দৃশ্য পরস্পরের সঙ্গে সবিশেষ সাযুজ্যপূর্ণ। মহাজগতের যেই স্রষ্টা এ পৃথিবী ও তার বিভিন্ন অঞ্চল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এর সৃষ্টিরহস্য সম্যক অবগত। ক্ষুদ্র মানবের এ সমস্ত বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে অভিভূত হওয়া ছাড়া আর কী করার আছে?

নর্থকেইপ

পৌনে বারোটার দিকে আমরা নর্থকেইপে অবতরণ করি। এটি একাত্তর ডিগ্রী ১০ মিনিট ২১ সেকেণ্ডের দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত একটি উঁচুভূমির তীর। যাকে দেখলে আর্কটিক মহাসাগরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখছে বলে মনে হয়। এই প্রান্ত উত্তরে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত। এরপর উত্তরমেরু পর্যন্ত এদিকে আর কোন স্থলভাগ নেই। আমরা এখানে পৌঁছে

দেখি, সারা পৃথিবী থেকে আগত পর্যটকদের ভীড়। তারা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে 'মধ্যরাতের সূর্য' দেখার জন্য এখানে সমবেত হয়েছে। শীত এত তীব্র ও তুষার বায়ু এত ধারালো যে, দেহে ধারণকৃত সমস্ত কাপড় অপ্রতুল মনে হচ্ছিল। অনুমান করা যায় যে, গ্রীষ্মঋতুতে (যখন কিনা মাসকে মাস ধরে এখানে রাত দেখা দেয়নি এবং দিগন্তে সদা সূর্য বিদ্যমান) শীতের এই অবস্থা, তাহলে শীত মৌসুমে যখন মাসকে মাস সূর্যের চেহারা দেখা যায় না তখন এখানে কী পরিমাণ শীত পড়ে? এই টিলায় দাঁড়িয়ে কিছু সময় সম্মুখস্থ সাগর ও সূর্য কিরণের দৃশ্য দেখার পর আর অধিক সময় খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হল না। তাই আমরা নিকটবর্তী নির্মিত সীসাঘেরা একটি হলরুমে প্রবেশ করি। যখন রাত সোয়া বারোটা, তখন পুনরায় বের হয়ে নর্থ কেইপের শেষ প্রান্তে বানানো একটি চত্বরের উপর চলে যাই। সূর্য তার শেষ বিন্দুতে পৌঁছে পুনরায় উঁচু হতে আরম্ভ করেছে। এ সময় দিগন্তে কিছুটা মিহিন মেঘ চলে আসে। কিন্তু সূর্যরশ্মি মেঘপ্রান্ত ভেদ করে আকাশের দিকে উঠে এসেছিল এবং পরিবেশকে আলোকিত করে রেখেছিল। সেই চত্বরে দাঁড়িয়ে আমরা উচ্চ স্বরে আযান দেই। তারপর জামাআতের সাথে এশার নামায আদায় করি।

রাত একটার সময় আমরা এখান থেকে যখন শহরের দিকে ফিরছিলাম, তখন সূর্যালোক পূর্বাধিক তীব্র হয়েছিল। পথিমধ্যে জায়গায় জায়গায় উত্তরমেরুর ১২ শিং বিশিষ্ট হরিণ (Reindeers) বিচরণ করতে দেখতে পাই। মনোমুগ্ধকর এ সমস্ত দৃশ্য উপভোগ করে রাত প্রায় দু'টায় আমরা পুনরায় অবস্থানস্থলে পৌঁছি। এটি ছিল আমাদের তৃতীয় রাত—যাতে সূর্যাস্ত হয়নি। রাত দু'টার পর ফজর নামায পড়ে ঘুমানোর জন্য আমাদেরকে কক্ষের মধ্যে কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করতে হয়।

এ সমস্ত স্থানে নামাযের বিধান

সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এখানেই আমি এ প্রশ্নের উত্তর দেবো যে, এ ধরনের জায়গায়—যেখানে কয়েক মাস পর্যন্ত সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয় হয় না সেখানে—নামায পড়ার পদ্ধতি কী?

এ অবস্থার মূল প্রেক্ষাপট এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে এ প্রশ্ন তো কখনো দেখা দেয়নি যে, যে সমস্ত ভূখণ্ডে দিনই দিন বা রাতই রাত থাকে, সেখানে কিভাবে নামায পড়া হবে, তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপর একটি ঘটনার অধীনে এ ব্যাপারে একটি মৌলিক দিকনির্দেশনা দান করেছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত নাওয়াস বিন সামাআন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে এরশাদ করলেন ঃ সে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন থাকবে। ঐ চল্লিশ দিনের মধ্য থেকে ১ দিন এক বছরের সমান, ১ দিন এক মাসের সমান এবং ১ দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের সাধারণ দিনসমূহের মতই হবে। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন যে, যেদিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিন কি আমাদের জন্য শুধুমাত্র একদিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ

"لا ، اقدروا له قدره"

অর্থ ঃ 'না, এর জন্য তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করবে।'

আমি পূর্বে লিখেছি যে, 'বোলগারের' ন্যায় অঞ্চলসমূহ, যেখানে এশার সময় হয় না, সেখানে প্রধান উক্তি বা শ্রেষ্ঠমতের ভিত্তিতে এশার নামায হিসাব করে পড়ার যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার ভিত্তি এ হাদীসটিই।

প্রাচীনকালের ফকীহদের যুগে মুসলমানদের বসতি এমন অঞ্চলসমূহ পর্যন্তই পৌঁছেছিল, যেখানে সান্ধ্যলালিমা অস্ত যায় না। তবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দিনরাত উভয়টিই আসে। কিন্তু উভয়মেরুর নিকটবর্তীর ঐ সমস্ত অঞ্চল, যেথানে চব্বিশ ঘন্টায় দিবস–রজনীর পরিভ্রমণ পূর্ণ হয় না, সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপন সে যুগে আরম্ভ হয়েছিল না। তাই এ সমস্ত অঞ্চলের বিধান সম্পর্কে প্রাচীন কালের ফকীহগণ আলোচনা করেননি। কিন্তু যখন থেকে ঐ সমস্ত অঞ্চলেও মুসলমানগণ পৌঁছেছে, তখন থেকে সমকালীন ফকীহগণ ঐ সমস্ত অঞ্চলের বিধান

সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ঐটিই, যা 'বোলগারের' ব্যাপারে দেখা দেয়। অর্থাৎ নামাযের সময়ের প্রসিদ্ধ চিহ্ন না পাওয়ার অবস্থায় নামায ফরয হয় কি হয় না? যারা বোলগারের ন্যায় শহরে এশার নামায ফরয মানেন না তাদের বক্তব্য হল, যে সমস্ত অঞ্চলে কয়েক মাস পর্যন্ত দিন থাকে সে সমস্ত অঞ্চলে এ পুরো সময়টিতে কেবলমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয হবে। কিন্তু আমি পূর্বে নিবেদন করেছি যে, দলীল প্রমাণের দিক থেকে এ উক্তিটি দুর্বল ও নিম্নমানের। দাজ্জাল বিষয়ে উপরে যে হাদীস লেখা হয়েছে, তা থেকে এ মূলনীতিটি সুস্পষ্ট বের হয়ে আসে যে, যখন দিন এত দীর্ঘ হবে যে, চব্বিশ ঘন্টায় রাতদিনের পরিভ্রমণ পূর্ণ হবে না, তখন নামাযের সময়ের প্রসিদ্ধ চিহ্ন বা নিদর্শনগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং এমন ক্ষেত্রে হিসেব করে নামায আদায় করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, এ সমস্ত অঞ্চলে নামাযের সময় হিসেব করার পন্থা কী হবে? এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রস্তাবই পেশ করা হয়েছে, তবে এ সবের মধ্যে সর্বাধিক প্রবল, উৎকৃষ্ট ও আমলযোগ্য প্রস্তাব এই যে, ঐ সমস্ত অঞ্চলের নিকটবর্তী যে অঞ্চলে চব্বিশ ঘন্টায় দিন রাত পূর্ণ হয়, সেখানে যে নামাযের যে সময় হবে ঐ সমস্ত অঞ্চলেও ঐ সময় ঐ নামায পড়া হবে। যেমন নিকটবর্তীতম স্বাভাবিক অঞ্চলে মাগরিব নামায যদি নয়টায় হয় আর এশার নামায হয় সাড়ে দশটায় তাহলে এখানেও মাগরিব ও এশা পালাক্রমে নয়টা ও সাড়ে দশটায় পড়বে। যদিও সে সময় সূর্য দিগন্তে বিদ্যমান থাকে।

এই প্রস্তাবের উপর আমল করারও দু'টি পন্থা সম্ভব। একটি এই যে, এমন কোন নিকটবর্তী শহরকে মানদণ্ড বানাবে, যেখানে পাঁচওয়াক্ত নামাযের সময়ই তার পরিচিত আলামত সহকারে এসে থাকে। সুতরাং 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র একটি সিদ্ধান্তে এই প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, যে সমস্ত অঞ্চল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশের উপর অবস্থিত, তাদেরকে মানদণ্ড ধরে অস্বাভাবিক অঞ্চলসমূহে সমস্ত নামাযের সময় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীর সময় অনুপাতে নির্ধারণ করা হবে।

দ্বিতীয় পন্থা এই যে, এমন কোন শহরকে মানদণ্ড নির্ধারণ করবে, যা অস্বাভাবিক অঞ্চলসমূহের নিকটবর্তী এবং সেখানে বেশীর ভাগ নামাযের

সময় পাওয়া যায়, যদিও সেখানে সান্ধ্যলালিমা অস্ত না যাক না কেন। এ পন্থা অনুপাতে ট্রমসো প্রভৃতিতে যখন শুধু দিনই দিন থাকে, তখন ওসলোর নামাযের সময় অনুপাতে নামায পড়া যেতে পারে।

এই দুই পন্থার মধ্য থেকে প্রথম পন্থাটি অধিকতর সতর্কতামূলক, তবে দ্বিতীয় পন্থামত আমল করা অধিকতর সহজ। বিশেষ করে এমন শহরসমূহে যেখানে মুসলমানদের বাস অতি সামান্য এবং তাদের জন্য পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশের সময় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সহজ নয়। কাজেই ট্রমসো ও তার থেকে আরো সম্মুখোস্ত শহরসমূহে ওসলোর নামাযের সময়ের অনুসরণ করলে তা জায়েয ও সঠিক হবে। হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের হাদীসে এ মূলনীতি তো বলে দিয়েছেন যে, অনুমানের ভিত্তিতে নামায পড়বে। কিন্তু সে অনুমানের পন্থা কি হবে তা তিনি বর্ণনা করেননি। সম্ভবতঃ এতে এই হিকমত তথা রহস্য নিহিত রয়েছে যে, এতে করে অনুমান করার পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারবে। যে জায়গায় যে পদ্ধতি অধিকতর আমলের যোগ্য এবং যে পদ্ধতি মানলে সংকীর্ণতা হবে না, সেখানে সে পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

ট্রমসোতে যে মুসলমানের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেও এ কথাই বলেছে যে, এখানকার মসজিদে ওসলোর সময় হিসেবে নামায পড়ার প্রচলন রয়েছে।

ট্রমসো ও নর্থকেইপে সূর্যের পরিভ্রমণ দেখার পর আমার একটি বিষয়ের অনুমান অনেকটা নিশ্চিতের কাছাকাছি পৌঁছেছে। আর তা এই যে, যারা একথা বলেন যে, যে সমস্ত অঞ্চলে কয়েক মাস পর্যন্ত সূর্যাস্ত হয় না, সেখানে এই কয়েক মাসে সর্বমোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয। তাদের এ কথার ভিত্তি ঐ সমস্ত অঞ্চল তারা প্রত্যক্ষ না করার কারণে তারা বুঝেছেন যে, ঐ কয়েক মাসে মাগরিবের মত যোহরের সময়ও কেবলমাত্র একবার এবং আসরের সময়ও মাত্র একবার এসে থাকে। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, এখানে সূর্য মধ্যাহ্ন রেখার উপর দিয়ে প্রতিদিনই অতিক্রম করে থাকে, তাই প্রত্যেক চব্বিশ ঘন্টায় সূর্যের ছায়া (মূল ছায়া বাদে) এক গুণ বা দুই গুণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক চব্বিশ

ঘন্টায় একবার করে যোহর ও আসরের সময় অবশ্যই এসে থাকে। তাই একথা বলা ঠিক নয় যে, তিন মাস সময়ে যোহর ও আসরের সময় মাত্র একবার এসে থাকে। তাই যারা নামায ফরয হওয়ার জন্য ওয়াক্তের চিহ্নকে মূল কারণ বলে স্বীকার করে, তাদের কথামতই প্রতিদিন যোহর ও আসরের নামায ফরয হয়ে থাকে। তাই একথা বলা কোনভাবেই সঠিক নয় যে, এই তিন মাস সময় পুরোটা একদিনের হুকুম রাখে এবং এই তিন মাসে মাত্র এক ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। কারণ, যখন প্রত্যেক চব্বিশ ঘন্টায় একবার করে যোহর ও আসর নামাযের ওয়াক্ত আসে আর এ সমস্ত নামায তার ওয়াক্ত এলে ফরয হয় তাহলে বোঝা যায় যে, চব্বিশ ঘন্টায় তাদের ১ দিন পূর্ণ হয়। বিধায় পূর্ণ তিন মাসকে ১দিন সাব্যস্ত করা সঠিক নয়।

তবে হ্যাঁ, উত্তরমেরু অর্থাৎ ঠিক নব্বই দ্রাঘিমাংশে বাহ্যতঃ সূর্যের পরিভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে যাঁতার ন্যায় হয়ে থাকে। তাই সেখানে সবকিছুর ছায়া চব্বিশ ঘন্টায় একই রকম হবে। ফলে ঠিক ঐ জায়গা সম্পর্কে এ কথা বলা যেতে পারে যে, ছায়া দ্বারা সেখানে যোহর ও আসরের সময় নির্ধারণ করা কঠিন। যদিও কতিপয় আলেমের মত এই যে, সেখানেও সূর্য যখন মধ্যাহ্নরেখা অতিক্রম করবে তখন তাকে যোহরের সময় মনে করতে হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া, পৃঃ ১২৬, খণ্ড–২)

যাই হোক, ঠিক নব্বই অক্ষাংশে কোন মানুষ পৌঁছে নামায পড়ার বিষয়টি এখনও পর্যন্ত একটি কাল্পনিক ধারণা মাত্র। তবে আর্কটিক অঞ্চল (Arctic Zone)এর বেশীর ভাগ এলাকা এমন, যার মধ্যে যোহর ও আসর উভয় নামাযের আলামত সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া যায়। তাই সূর্য অস্ত না গেলেও চব্বিশ ঘন্টায় তাদের একদিন পূর্ণ হয়। কাজেই ৩ মাস পর্যন্ত সেখানে সূর্য অস্ত না গেলে তার অর্থ এই নয় যে, এই তিন মাস এক দিন। বরং বাস্তবে এটি তিন মাসই। যার মধ্যে প্রতিদিন যোহর ও আসরের সময় এসে থাকে। তাই অবশিষ্ট নামাযসমূহও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই আদায় করা জরুরী হবে এবং পূর্ণ তিন মাসে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার ধারণাটি এ সমস্ত স্থানের জন্য সুস্পষ্টরূপে ভ্রান্ত।

সারকথা এই যে, এ সমস্ত স্থানেও চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায

পড়াই জরুরী। তবে মাগরিব, এশা ও ফজরের সময় নির্ধারণে এই আর্কটিক অঞ্চলের (Arctic Zone) মানুষ—যারা ৬৬.৩০ দ্রাঘিমাংশের উপরে বসবাস করে—অস্বাভাবিক দিনসমূহে ওসলোর সময়কেও মানদণ্ড বানাতে পারে কিংবা পঁয়তাল্লিশ দ্রাঘিমাংশের কোন শহরকেও বানাতে পারে। ওসলোতে এশার সময়ের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি।

এখন আমি পুনরায় ভ্রমণ বৃত্তান্তে ফিরে যাচ্ছি।

•

ওসলোতে প্রত্যাবর্তন

২৪শে আগষ্টের সকালে আমাদেরকে হোনিন্সভোগ থেকে বিমানযোগে ট্রমসো এবং সেখান থেকে ওসলো প্রত্যাবর্তন করতে হয়। হোনিন্সভোগ থেকে যে বিমানটি আমরা পাই, সেটি প্রথমে হেমারফেষ্ট (Hammerfest) নামক একটি শহরে অবতরণ করে তারপর আমাদেরকে ট্রমসো নিয়ে যায়। বিমানটি ট্রমসোতে অবতরণ করতে যাচ্ছে এমন সময় আমি লক্ষ্য করি যে, আমার মোবাইল ফোনটি—যা আমি সিটের উপর রেখেছিলাম—নেই। আমার এই ফোনটি শুধু একটি মোবাইল ফোনই নয়, বরং এটি আমার ডায়রীও। যার মধ্যে আমার সারা পৃথিবীর সম্পৃক্ত জনদের ঠিকানা, ফোন নাম্বার এবং আমার সারা বছরের প্রোগ্রামও রয়েছে। বিধায় এটি আমার জন্য একটি অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয় বস্তু। সম্ভাব্য সকল জায়গায় খোঁজার পরও না পেয়ে বিমানের কর্মচারীদেরকে জিজ্ঞাসা করি। তারা বলল যে, একটি মোবাইল ফোন আমরা এমন একটি সিটে পেয়েছিলাম, যার যাত্রী হেমারফেষ্টে অবতরণ করেছে। তাই আমরা মনে করেছিলাম যে, এই ফোন সেই যাত্রীর হবে। সুতরাং আমরা ঐ ফোনটি আমাদের হেমারফেষ্টের কর্মচারীদের হাতে অর্পণ করি। এবার অনুমিত হয় যে, কোন শিশু ঐ ফোনটি আমার সিট থেকে তুলে সেই সিটে নিয়ে যায়। আর এভাবে বিমানের কর্মচারী সেটি হেমারফেষ্টে রেখে আসে। তবে বিমানের কর্মচারীটি আমাকে নিশ্চিন্ত করে যে, সেটি অতি দ্রুত ওসলো পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে। তারপর যখন তাকে জানালাম যে, আমাকে ওসলো

রওয়ানা হওয়ার পূর্বে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় ট্রমসো বিমান বন্দরে অবস্থান করতে হবে তখন সে বলল যে, আপনাদেরকে ট্রমসো নামানোর পর এই বিমান পুনরায় হেমারফেস্টে গিয়ে ট্রমসো ফিরে আসবে। ট্রমসো থেকে আপনাদের যাত্রার পূর্বেই ফোনটি আপনার নিকট পৌঁছে দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব।

আমরা ট্রমসো বিমানবন্দরে নেমে পড়লাম। সেখানে ওসলোর বিমানে আরোহণ করার জন্য আমাদেরকে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় অপেক্ষা করতে হয়। ইতোমধ্যে যোহরের সময় হয়ে যায়। আমরা যোহরের নামায আদায় করি। আমরা বিমানের সময় তালিকা দেখে জানতে পারলাম, আমাদেরকে যেই বিমানে যেতে হবে তার যাত্রার সময় ৩টা ৪০মিনিটে। আর হেমারফেস্ট থেকে আগমনকারী বিমানটি সাড়ে তিনটায় এসে পৌঁছাবে। যার অর্থ হল মাঝে কেবলমাত্র দশ মিনিট সময় থাকবে। তাই হেমারফেস্ট থেকে আগমনকারী বিমানটি আমার মোবাইল ফোন নিয়ে এলেও সেটি এমন সময় ভূমিতে অবতরণ করবে যখন আমরা বিমানে উঠে যাব। তাই ফোনটি আমাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এ সময় হবে অপ্রতুল। তারপরও যখন আমি আমার বিমানে আরোহণের জন্য বিমানের গেটে পৌঁছি এবং গেটে আমার বোর্ডিং কার্ড দেখাই তখন কাউন্টারে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি কম্পিউটার দেখে বলল যে, আপনার জন্য একটি প্যাকেট হেমারফেস্ট থেকে রওয়ানা হয়েছে যেটি বিমান রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ট্রমসো পৌঁছবে বলে আশা রয়েছে। কিন্তু আমরা এর প্রতীক্ষায় বিমান বিলম্ব করাতে পারব না বিধায় ইতোমধ্যে তা পৌঁছে গেলে তো ভাল অন্যথা আমরা সেটি আপনাকে ওসলোতে পৌঁছিয়ে দেব। অবশেষে আমি বিমানে এসে বসি। জানালা দিয়ে প্রত্যেক অবতরণকারী বিমানকে দেখতে থাকি। অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের সম্মুখ দিয়ে ঐ বিমানটি ভূমিতে অবতরণ করল, যেটিতে করে আমরা ট্রমসো এসেছিলাম। তখন আমাদের বিমান রওয়ানা হতে দশ মিনিট সময় বাকী ছিল, কিন্তু বিমানটি অবতরণ করার পর রানওয়ে অতিক্রম করে যথাস্থানে পৌঁছতে চার/পাঁচ মিনিট সময় লেগে যায়। আমি দেখলাম যে, যেই মাত্র বিমান তার জায়গায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাতে সিঁড়ি

লাগানো হল, অমনি নীলরঙের উর্দি পরিহিত এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম বিমান থেকে বের হল এবং দ্রুত সিঁড়ি অতিক্রম করে বিমানবন্দরের ভবনের দিকে দৌড়ালো। তার হাতে একটি বস্তু দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল। আমার প্রবল ধারণা ছিল যে, এ লোকটি আমার মোবাইল নিয়ে এসেছে। কিন্তু যে জায়গায় সে অবতরণ করেছিল তা আমাদের বিমানের জায়গা থেকে ছিল বেশ দূরে। লোকটি বিমানবন্দরের ভবনে প্রবেশ করলে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। এমনকি আমাদের বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। যাত্রার সময় হয়ে যাওয়ার ফলে বিমান পিলপিল করে চলতে আরম্ভ করে। তখন আমার আক্ষেপ হল যে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য ফোনটি আমার নিকট পৌঁছাতে পারলো না। ওসলো বিমানবন্দর শহর থেকে ষাট সত্তর কিলোমিটার দূরে। তাই ওসলো বিমানবন্দর থেকে তা সংগ্রহ করা পৃথক এক ঝামেলা হয়ে পড়বে। যার জন্য কয়েক ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হবে। কিন্তু আমি এজন্য আফসোস করছি মাত্র ইতোমধ্যে একজন এয়ারহোস্টেস এল। সে আমার সিটের নিকট এসে একটি প্যাকেট আমাকে দিল এবং বলল যে, এ প্যাকেটটি হেমারফেস্ট থেকে আপনার জন্য এসেছে। আমি পুলক ও বিস্ময় মিশ্রিত কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিমানের দরজাতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এটি আপনার নিকট কি করে পৌঁছলো? এয়ারহোস্টেস উত্তর দিল, প্যাকেট বহনকারী ব্যক্তি দ্রুত নিয়ে এসে বাহির থেকে তা বিমানের ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দেয়। প্যাকেট খুলে দেখি আমার ফোনটি অক্ষত অবস্থায় আমার হাতে এসে পৌঁছেছে।

সত্যিই যে দায়িত্ববোধ, ক্ষিপ্রতা ও সহমর্মিতা নিয়ে এয়ারলাইন্সের লোকেরা ফোনটি আমার নিকট পৌঁছানোর প্রতি যত্ন নিয়েছে, এর জন্য আমার অন্তরে তাদের প্রতি বড় শ্রদ্ধা জাগল। উল্লেখ্য যে, হেমারফেস্ট থেকে বহনকারী আর আমাদেরকে নিয়ে ওসলো গমনকারী এয়ারলাইন্স দ্বয় ছিল পৃথক দু'টি কোম্পানীর। তাছাড়া ফোনটি আমার নিকট পৌঁছানোর আইনানুগ দায়িত্ব তাদের ছিল না। কারণ, এটি বুক করা সামানার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এতদসত্ত্বেও এত গুরুত্ব ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে আমানতকে তার প্রাপকের নিকট পৌঁছানো নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়

ব্যাপার।

যাই হোক, বিকাল ছয়টার দিকে আমরা পুনরায় ওসলো পৌঁছাই। রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছিল আমাদের বন্ধু সিদ্দীকী সাহেবের বাড়ীতে। ইনি ওসলোর সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। ওসলোতে তিনি হালাল গোশত ও অন্যান্য পণ্যের ব্যবসা করেন। এখানে তিনি একটি পাকিস্তানী রেস্তোরাঁও খুলেছেন। যেই মহল্লায় তাঁর বাড়ী ও দোকান সেটিকে পাকিস্তানী অধিবাসীদের আধিক্যের কারণে পাকিস্তানেরই একটি অংশ বলে মনে হয়। এমনকি দোকানে লাগানো বোর্ডও উর্দূতে লেখা। আজ ওসলোতে সূর্যাস্তের সময় ছিল দশটা। নব্বই ঘন্টা (প্রায় সাড়ে তিন দিন) সূর্যাস্তহীন অতিবাহিত করার পর—এখানে সূর্যাস্তের দৃশ্য অবলোকন করি।

সুইডেন

পরদিন বিকাল তিনটায় আমরা ট্রেনযোগে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। এটি ছিল ছয় ঘন্টার পথ। ট্রেন অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক ছিল। প্রায় এক ঘন্টা নরওয়ের ভিতর দিয়ে পথ চলার পর ট্রেনটি সুইডেনের সীমানায় প্রবেশ করে। তারপর সুইডেনের ভিতর দিয়ে বেশীর ভাগ পথ অতিক্রম করে। এ সম্পূর্ণ পথটি সবুজ-শ্যামল উপত্যকা, পাহাড়সারি, ঝিল ও নদীর অপূর্ব দৃশ্য দ্বারা অত্যন্ত সুসজ্জিত ছিল। রাত সাড়ে নয়টায় ট্রেন ষ্টকহোমে পৌঁছে। ষ্টেশনে আমার বন্ধু চৌধুরী মুহাম্মাদ আখলাক সাহেব স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি ষ্টকহোমের একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। সুইডেন ও নরওয়েতে তার ক্রিষ্টালের অনেকগুলো দোকান রয়েছে। তাছাড়া তিনি এখানকার একটি সুদৃশ্য মসজিদ-কমিটির সভাপতিও বটেন। মুসলমানদের ধর্মীয় তৎপরতায় তিনি খুব বেশী অংশগ্রহণ করে থাকেন।

রেলওয়ে ষ্টেশন ষ্টকহোমের প্রধান এলাকার মধ্যভাগে অবস্থিত। এর নিকটেই হোটেল শেরাটন। সেখানে আমি অবস্থান করি। এখানে দশটা বাজার কয়েক মিনিট পূর্বে সূর্যাস্ত হচ্ছিল। সুতরাং হোটেলে পৌঁছে আমরা মাগরিবের নামায আদায় করি। আখলাক সাহেব আমাকে একটি

লেবাননী রেস্তোরাঁয় নিয়ে যান। সেখানে হালাল গোশতের ব্যবস্থা ছিল। রাতের খাবারে লেবাননী আঙ্গিকের ভুনা গোশত ছিল বড় সুস্বাদু।

পরদিন ষ্টকহোমে বিশেষ কোন ব্যস্ততা ছিল না। দিনের প্রথম অর্ধেকে আখলাক সাহেব শহরটি ঘুরে দেখান। এটি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সর্ববৃহৎ ও জাঁকজমকপূর্ণ শহর। নগরায়নিক সৌন্দর্যের দিক থেকেও এটি উত্তরের সমস্ত দেশের উপর প্রাধান্য রাখে। একে উত্তর ইউরোপের 'ভেনিস' বলা হয়। সুইডেনের আয়তন ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৩২ বর্গমাইল। যা উত্তরে ৫৫ থেকে নিয়ে ৭০ দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে তার অধিবাসী ৯ মিলিয়ন (৯০ লাখ)এর অধিক নয়। যদিও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে এ এলাকা নরওয়ের সমকক্ষ নয় তবুও ৯০ হাজার ঝিলের (ব্রিটানিকা মাইক্রোপেডিয়া পৃঃ ৪-৩৬, খণ্ড ১১) সমন্বিত এ দেশটিও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে দুনিয়ার সুন্দরতম দেশসমূহের মধ্যে গণ্য হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে একে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার এক নম্বর দেশ মনে করা হয়। কারণ, দীর্ঘদিন পর্যন্ত নরওয়ের উপরও এরই রাজত্ব ছিল।

হোটেল শেরাটন—যেখানে আমরা অবস্থান করছিলাম—মধ্য শহরে একটি উপসাগরের সম্মুখে অবস্থিত। তার ডান দিকে ষ্টকহোমের সিটি হলের গগনচুম্বী টাওয়ার। একে নোবেল টাওয়ারও বলা হয়। এর কারণ এই যে, বিশ্বের প্রসিদ্ধ 'নোবেল পুরস্কার' এ জায়গাতেই দেওয়া হয়। আলফ্রেড বার্নাড নোবেল (Alfred Bernard Nobel) মূলতঃ ষ্টকহোমের বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ডিনামাইট আবিস্কার করেন। কেমিষ্ট্রি ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিনি উৎকর্ষতা লাভ করেন। এর মাধ্যমে তিনি অনেক সম্পদ উপার্জন করেন। পরিশেষে তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে) এ সম্পদ দ্বারা একটি ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করে অছিয়ত করেছিলেন যে, প্রতিবছর এমন কোন ব্যক্তিকে এই ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া হবে, যিনি বিজ্ঞান, সাহিত্য বা অর্থনীতিতে কিংবা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কাজে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করেছেন। সুতরাং প্রতিবছর 'নোবেল প্রাইজ' নামে ছয়টি পুরস্কার ছয়জন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়ে থাকে। যার সিদ্ধান্ত তিনটি সুইডেনের

প্রতিষ্ঠান এবং একটি নরওয়ের প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে করে থাকে। এ সমস্ত পুরস্কার ডিসেম্বরের দশ তারিখে (যা নোবেলের মৃত্যুর তারিখ) ষ্টকহোমের এই সিটি হলে দেওয়া হয়। আর এর নামেই এই টাওয়ারটিকে 'নোবেল টাওয়ার' বলা হয়। মানুষ সিঁড়ির মাধ্যমে তার উপর আরোহণ করে শহরের দৃশ্য অবলোকন করে থাকে।

ষ্টকহোমের সর্ববৃহৎ মসজিদটিও আমাদের হোটেলের নিকটে অবস্থিত। এটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ, সুদৃশ্য ও বিশাল একটি মসজিদ। সুইডেনে এ সময় মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যা আনুমানিক ৪ লাখের কাছাকাছি। এখানকার আরব মুসলমানগণ 'আর রাবিতাতুল ইসলামিয়্যাহ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারই প্রচেষ্টায় গম্বুজ ও মিনার বিশিষ্ট এই বিশাল মসজিদটি নির্মিত হয়। মধ্য শহরে নির্মিত এমন বিস্তৃত ও প্রশস্ত মসজিদ অনেক ইসলামী দেশেও কমই দেখতে পাওয়া যায়। এতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অযুখানার ব্যবস্থাপনাও ঈর্ষণীয় পর্যায়ের দর্শনীয়। মসজিদ সংলগ্ন একটি ইসলামী সেন্টারও রয়েছে। সেখানে প্রতিদিন ধর্মীয় তথ্য যোগান দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। মুসলমানদেরকে ধর্মীয় পথ প্রদর্শনের বিভিন্ন কাজও এখান থেকে করা হয়ে থাকে।

চৌধুরী আখলাক সাহেব বললেন যে, ষ্টকহোমে ছোটবড় প্রায় পঁয়তাল্লিশটি মসজিদ রয়েছে।

এটি ছিল বৃহস্পতিবার দিন। দিনের দ্বিতীয় অর্ধাংশ আমি হোটেলেই কাটাই। তখন আমার সঙ্গে আনা মাআরিফুল কুরআনের কাজ করতে থাকি।

পরদিন ছিল শুক্রবার। আমাকে জুমুআর বয়ান সেই মসজিদে প্রদান করতে হবে, যেটি পাকিস্তানী মুসলমানগণ নির্মাণ করেছেন। গত বছর আমি যখন এখানে এসেছিলাম, তখন এর নির্মাণ কাজ চলছিল। এখন মাশাআল্লাহ এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চৌধুরী আখলাক সাহেব এ মসজিদেরই সভাপতি। এখানে জুমুআর পূর্বে আমার বয়ান হয়। জুমুআর নামাযের পর ষ্টকহোমের অনেক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। সুইডেনে নিয়োজিত পাকিস্তানের দূত জনাব শাহেদ কামাল সাহেব—যিনি এই

অল্প কয়েকমাস পূর্বে এখানে দূত হয়ে এসেছেন—জুমুআতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গেও সাক্ষাত হয়।

ফিনল্যাণ্ড ভ্রমণ

ঐ দিনই বিকেল পাঁচটায় আমাদের জলজাহাজে ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিংকি যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। সুতরাং জুমুআর নামাযের কিছুক্ষণ পর আখলাক সাহেব আমাদেরকে ষ্টকহোমের বন্দর এলাকায় নিয়ে যান। এখানে বিভিন্ন জাহাজ পরিচালনাকারী কোম্পানী পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ গদি বানিয়েছে। আমাদেরকে যে জাহাজে সফর করতে হবে তার নাম ছিল সিলিজালাইন (Silijaline)। সুতরাং আমরা তার টার্মিনালে চলে যাই। এই টার্মিনাল বিমানবন্দরের টার্মিনালের ন্যায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুশৃংখল ছিল। এ জাহাজটি ঐ জাহাজের তুলনায় অনেক বড় ছিল, যাতে করে আমরা নর্থকেইপে সফর করেছিলাম। এটি ছিল ১৩ তলা বিশিষ্ট একটি জাহাজ। জেটির তৈরী পুলের মাধ্যমে জাহাজে প্রবেশ করে দেখি এটি জাহাজের সপ্তম তলা। জাহাজের তলা তো নয়, এ যেন এক জাঁকজমকপূর্ণ বাজার। এর মধ্যে দুধারী দোকান ও রেস্তোরাঁ বানানো রয়েছে। যাত্রীদেরকে একতলা থেকে অন্যতলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য জায়গায় জায়গায় ক্যাপসুল লিফট রয়েছে। মোটকথা, পুরো জাহাজটি ছোট একটি সুশৃংখল শহর ছিল, যার মধ্যে সব ধরনের শহুরে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল।

জাহাজ পাঁচটার সময় ষ্টকহোম থেকে রওয়ানা হয়ে বাল্টিক সাগরে চলতে আরম্ভ করে। এই ভ্রমণটিও তার দৃশ্যাবলীর দিক থেকে অত্যন্ত উপভোগ্য ছিল। দশটার সময় সূর্যাস্ত হলে সমুদ্র থেকে সান্ধ্যলালিমা ও সাদা আলোকের সীমারেখা খুব বেশী পরিস্কারভাবে দেখা সম্ভব হচ্ছিল। সুতরাং আমি জাহাজের ডেকের উপর থেকে রাত আড়াইটা পর্যন্ত দিগন্তে সান্ধ্যলালিমার ভ্রমণ দেখতে থাকি। এ বিষয়টি পরিস্কার দেখতে পাই যে, সান্ধ্যলালিমা প্রথমে দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে ছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তা উত্তর দিকে বাড়তে থাকে। অবশেষে তা পূর্ব দিকে ঝুঁকে পড়ে। সান্ধ্যলালিমার এ ভ্রমণের মাঝে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত হয়।

তাই এর দ্বারা তাদের কথার সমর্থন হয়, যারা বলেন যে, যে সমস্ত জায়গায় সান্ধ্যলালিমা অস্ত যায় না, সেখানে যখন সান্ধ্যলালিমা পূর্ব দিকে ঝুঁকে পড়বে, তখন ফজরের সময় শুরু হবে।

সকালে আমরা ঘুম থেকে যখন জাগি, তখন জাহাজ ফিনল্যাণ্ডের সীমানায় প্রবেশ করেছে। তারপর যখন আমাদের ঘড়িতে ৯টা এবং ফিনল্যাণ্ডের সময় মত দশটা বাজছিল তখন আমাদের জাহাজ হেলসিংকির বন্দরে নোঙর ফেলে। মুহতারাম নাসিম সাহেব—যিনি বহু বছর ধরে হেলসিংকিতে বসবাস করছেন—এখানকার প্রভাবশালী পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জাহাজ পরিচালনা কোম্পানীর পক্ষ থেকেই এখানকার হোটেল রামাদায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। হোটেলটি ছিল শহরের ঠিক মাঝখানে। ফিনল্যাণ্ড উত্তর ইউরোপের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। এখন তো মোবাইল ফোনের নকিয়া কোম্পানীর কারণে এ দেশের এই উৎপন্ন পণ্যটি সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বর্গমাইলের এ দেশটি উত্তরে ৬০ থেকে ৭০ দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সীমান্ত নরওয়ে, সুইডেন, ও রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রাশিয়ার প্রসিদ্ধ শহর সেন্ট পিটার্সবার্গ (যার নাম সোভিয়েতের ক্ষমতা চলাকালে 'লেনিনগ্রাদ' ছিল) হেলসিংকি থেকে কারযোগে মাত্র দু' ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত। দেশের প্রায় দশ শতাংশই পানি। দশ হাজার ঝিল দেশের দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছড়িয়ে আছে। তবে অধিবাসী মাত্র সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন (৫৫ লক্ষ)। অর্থাৎ করাচী শহরের অর্ধেক থেকেও কম। শৈল্পিক উন্নতিতে দেশটি ইউরোপের অন্যান্য দেশের সমানে সমানে চলছে। এখানে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা মত কাজ চলছে। জনগণের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণটাই বিনামূল্যে। চিকিৎসা ব্যবস্থাও সহজলভ্য। দেশের অধিবাসীদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সস্তামূল্যে বাড়ী ক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এক সময় পর্যন্ত ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার শাসনাধীনে ছিল। তবে এখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ।

হেলসিংকী ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী। ছোট তবে সুন্দর এবং সমস্ত

আধুনিক নগরায়নিক সুবিধাদি দ্বারা সজ্জিত এ শহর। যেদিন আমরা এ শহরে অবস্থান করছিলাম সেদিন প্রত্যেককে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আজ এ ঋতুর সর্বাধিক গরম দিন। অথচ তাপমাত্রা সেদিন মাত্র ২৮ ডিগ্রীতে পৌঁছেছিল। আমাদের কাছে তা ভারসাম্যপূর্ণ ও মধুময় মনে হচ্ছিল। ফিনল্যাণ্ডে প্রায় ১২ হাজার মুসলমান অধিবাসী রয়েছে। তাদের মধ্যে সোমালিয়ানদের সংখ্যাই সর্বাধিক অর্থাৎ পাঁচ হাজার তিনশ' একাত্তর জন, ইরাকের দুই হাজার ছয়শ' সত্তর, তুরস্কের এক হাজার সাতশ' সাইত্রিশ, ইরানের এক হাজার সাতশ' ছয়, বসনিয়ার এক হাজার চারশ ছিয়ানব্বই, যুগোশ্লাভিয়ার দুই হাজার পাঁচশ' আঠারো, পাকিস্তানের দু'শো, হিন্দুস্তানের পাঁচজন এবং বাংলাদেশের চল্লিশ–পঞ্চাশ জন মুসলমানও এখানে আবাদ রয়েছে। হেলসিংকীতে ছয়–সাতটি মসজিদ রয়েছে। তার মধ্যে একটি মসজিদ পাকিস্তানীদেরও রয়েছে। তবে সে মসজিদটি ভাড়া বাড়ীতে। তাই তাকে নামাযের জায়গা বলাই অধিক সমীচীন। মসজিদের ইমাম মাওলানা আশরাফ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হল। তিনি লাহোরের জামেয়া নাঈমিয়া থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তিনি ইংরেজী ও স্প্যানিশ ভাষা খুব ভালভাবে অবগত। আমি ঐ মসজিদে গেলে তিনি বলেন, এখানে যোহর ও আসরের নামায তো নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামাআতের সাথে পড়া হয়, তবে অন্যান্য নামাযের সময় লোকেরা অনেক দূরে চলে যায়, তাই সে সমস্ত নামায নিয়মতান্ত্রিকভাবে হয় না। অনেক সময় এমনও হয় যে, কেউ ইমাম সাহেবের বাড়ীতে ফোন করে বলে যে, আমি মাগরিব নামাযে আসতে চাই। তখন তিনি গিয়ে মসজিদ খুলে দেন এবং জামাআতে নামায হয়। সরকারের পক্ষ থেকে কারাবন্দী মুসলমান কয়েদীদের জন্য সপ্তাহে একবার পাঠদান ব্যবস্থা রয়েছে। মাওলানা আশরাফ সাহেব সাপ্তাহিক এ পাঠদান করে থাকেন। এছাড়া সাধারণ স্কুলসমূহেও সপ্তাহে একদিন ধর্মীয় শিক্ষার অধীনে ইসলাম সম্পর্কে শিশুদেরকে জ্ঞান দান করার জন্য একটি করে প্রিয়ড রয়েছে। অধিকাংশ সোমালিয়ান উস্তাদ এই প্রিয়ডে শিশুদেরকে ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকেন।

হেলসিংকীতে 'মারকাযুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ' নামে আরেকটি

মসজিদ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সাধারণতঃ এটিকে 'মসজিদুল ঈমান' বলা হয়। ঘানার মুহাম্মাদ শরীফ সাহেব নামক একজন মুসলমান কুয়েতের সহযোগিতায় এটি তৈরী করেছেন। 'রাবেতাতুল ইসলামিয়্যাহ' নামে অপর একটি মসজিদ উস্তাদ খিযির শিহাবের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমার সেখানেও যাওয়ার সুযোগ হয়। এখানে রবিবারে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিছু শিশু প্রতিদিনই পড়তে আসে। এর সঙ্গে একটি পাঠাগার ও ধর্মীয় পুস্তক বিক্রির দোকানও রয়েছে। হালাল গোশতের একটি রেস্তোরাঁও রয়েছে।

হেলসিংকীতে একদিন অবস্থান করার পর আমরা ঐ জলজাহাজেই ষ্টকহোমে ফিরে আসি। ষ্টকহোম থেকে পুনরায় ট্রেনযোগে ওসলো পৌঁছি। ওসলোতে পূর্ণ দু'দিন বিশ্রাম করি এবং সেখানেই এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের সূচনা করি।

১লা আগষ্টে আমি লণ্ডন পৌঁছি। সেখানে আমার বন্ধু জাফর সারিশওয়ালা সাহেব আমার সঙ্গে কিছু বিষয়ে পরামর্শ করতে চান। কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাঁর পরামর্শ শেষ হয়ে যায়। লণ্ডনে অবস্থানের দ্বিতীয় দিন আমার পুরোটাই খালি ছিল। কারণ, আমাকে বিকাল ৬টায় করাচীর উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করতে হবে। এই দিনটি আমি বৃটিশ লাইব্রেরীতে ব্যয় করি। পূর্ব লণ্ডনের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তাকারে অনেকগুলো গ্রন্থাগার ছিল। এখন বৃটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী প্রভৃতি সবগুলোকে একত্রিত করে কিং ক্রস রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে বড় একটি ভবনে 'বৃটিশ লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমি তার মেম্বারশীপ পাস বানিয়েছি। লণ্ডনে এসে যখনই অবসর মিলে ঐ পাস বইকে কাজে লাগিয়ে লাইব্রেরী ঘুরে দেখি।

এবার আমার লক্ষ্য ছিল, হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরনিভী (রহঃ)এর 'ইযহারুল হক' গ্রন্থে (যার উর্দূ অনুবাদ আমার গবেষণা সহ 'বাইবেল সে কুরআন তাক' নামে প্রকাশ করেছি) যে সমস্ত ইংরেজী বইয়ের উদ্ধৃতি এসেছে, সেগুলো অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। সেগুলোর মূল ইংরেজী পুস্তক পাওয়া যায় না। এমনকি যখন 'ইযহারুল হক' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করা হয়, তখন তাতেও ঐ সমস্ত উদ্ধৃতি আরবী থেকে

অনুবাদ করে তুলে ধরা হয়। মূল বইয়ের উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ সমস্ত পুরাতন বই পুরাতন কোন গ্রন্থাগারেই পাওয়া সম্ভব। এবার আমার উদ্দেশ্য ছিল, বৃটিশ লাইব্রেরীতে এ সমস্ত বই সন্ধান করা। এসব বই পাওয়া গেলে লণ্ডনে কাউকে এ কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করব যে, তিনি এ সমস্ত উদ্ধৃতির মূল ইংরেজী বক্তব্য সংগ্রহ করবেন।

আমার বন্ধু মাওলানা ইসমাঈল গঙ্গাত এবং বালহিম মসজিদের ইমাম মাওলানা সেকান্দার সাহেব আমার অনুরোধে আমার সঙ্গে লাইব্রেরীতে যান। আমি এ উদ্দেশ্যে কয়েক ঘন্টা সময় বৃটিশ লাইব্রেরীতে অতিবাহিত করি। এখন বেশীর ভাগ লাইব্রেরী কম্পিউটারাইজড হয়েছে। সেগুলোতে কম্পিউটারের সাহায্যে বই তালাশ করতে হয়। তবে এ বিষয়টি কম্পিউটারের প্রোগ্রাম তৈরীকারীর উপর নির্ভর করে। যে লাইব্রেরীতে যত সহজ প্রোগ্রাম তৈরী করা হয়, সেখান থেকে তত সহজে বই খুঁজে বের করা যায়। বৃটিশ লাইব্রেরীতে জনৈক ব্যক্তি কম্পিউটারের এ প্রোগ্রামটি অনেক জটিল করে ফেলেছে, যার ফলে বইয়ের অনুসন্ধান এত সহজ নেই, যতটুকু কম্পিউটার থেকে আশা করা হয়। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ, আমার কাংখিত কিছু বই পেয়ে যাই। সেগুলোর উদ্ধৃতি আমি নোট করি। তাছাড়া 'ইযহারুল হক' গ্রন্থের একটি ফরাসী অনুবাদও আমি এখানে পেয়ে যাই। প্রায় দশ/পনের বছর পূর্বে আমাকে ডঃ হামিদুল্লাহ সাহেব লিখেছিলেন যে, প্যারিসের একটি গ্রন্থাগারে তিনি 'ইযহারুল হকের' ফরাসী অনুবাদ দেখেছেন। যা ছিল অসম্পূর্ণ। কিন্তু আমি নিজে এ পর্যন্ত এটা দেখি নাই। আজ আমি সরাসরি তা দেখার সুযোগ লাভ করি, যার নাম Idhharulhaqq ou Manifestaion be la verite.

এর অনুবাদকের নাম Carlerri.V.P। এটি বাহ্যতঃ দুই খণ্ডেই পরিপূর্ণ একটি কপি এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে Paris errest leroux থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বৃটিশ লাইব্রেরীতে এর shelf mark নাম্বার ১৪৫০৫ d2। আমি লাইব্রেরীকে এই বইয়ের একটি মাইক্রোফিল্ম কপি করানোর অর্ডারও দিই। তারা পঁচিশ দিনের মধ্যে তার মাইক্রোফিল্মের কপি আমার করাচীর ঠিকানায় পাঠানোর ওয়াদা করে।

এভাবে বৃটিশ লাইব্রেরীর এই ভ্রমণ উপকারী প্রমাণিত হয়। এখন আমি লণ্ডনে অবস্থানকারী এমন কোন রুচিশীল লোকের তালাশে আছি, যিনি 'ইজহারুল হকের' উদ্ধৃতসমূহের এ কাজ বৃটিশ লাইব্রেরীর সাহায্যে পূর্ণ করতে পারবেন। আমার সেখানের কিছু বন্ধুকেও এ কাজের কথা বলেছি। যদি এমন কোন ব্যক্তি আমার লেখা পড়ে থাকেন, যিনি এই কাজ করতে সক্ষম, তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ইনশাআল্লাহ তাকে এই কাজের যথার্থ পারিশ্রমিক পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হবে।

এদিন বিকেলেই আমি বৃটিশ এয়ারওয়েজ যোগে করাচীর পথে দুবাই রওয়ানা হই।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

এবারের সফরে আমার একাধারে তিন সপ্তাহ সময় ইউরোপের চারটি দেশে অতিবাহিত হয়। যার বেশীর ভাগ ছিল বিনোদনমূলক। এবারের সফরের উদ্দেশ্যই ছিল মস্তিস্ককে কিছুদিন কাজের ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে অবসরে কাটানো। তবে এর সাথে কিছু সমাবেশে অংশগ্রহণও করা হয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কুরআনের 'সূরায়ে হজ্জের' অর্ধাংশ এবং 'সূরা আল মু'মিনূনের' অর্ধাংশের বেশী ইংরেজী অনুবাদও এই সফরের মধ্যেই করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। তবুও সফরের সিংহভাগ বিনোদনমূলক ছিল বিধায় ইউরোপের এ সমস্ত দেশকে সবিশেষ নিকট থেকে এবং দীর্ঘসময় পর্যন্ত দেখার সুযোগ লাভ হয়। চিরাচরিতের ন্যায় এবারেও ইউরোপের বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যাবলী আমার দৃষ্টিগোচর হয়। কিছু কিছু বিষয়ে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা করতে মন চায়। তারা স্ব স্ব দেশে যে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধের প্রসার ঘটিয়েছে এবং শ্রম, সাধনা ও জাতীয় সমবেদনার আবেদন দেশের অধিবাসীদেরকে যে সমস্ত সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, মানবতার মূল্যায়ন ও তার মানবিক মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য যেই সার্বিক কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। সেখানকার শাসক শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে অস্বাভাবিক দূরত্বও নেই। গতবছর ওসলোতে আমি ডাক্তারদের যে সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলাম, তাতে সেখানকার গভর্নর একজন সাধারণ

লোকের ন্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আহারের সময় হলে তিনি খোলামেলাভাবে আমার সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে প্লেটে খাবার নিয়ে আমার টেবিলে চলে এসে আমার পাশে বসেন। যাওয়ার সময় হলে সহজ–সরল ভাবে উঠে গিয়ে তার কারে উপবেশন করেন। প্রোটোকলের যেই ঠাটবাট আমাদের দেশে প্রচলন পেয়েছে, তা সেখানে না থাকারই মত।

হেলসিংকীতে (ফিনল্যাণ্ডে) বিকেল বেলা পদচারণার জন্য আমি পার্লামেন্ট স্কয়ারে বের হয়ে অল্পক্ষণ পর দেখতে পাই যে, পতাকাধারী একটি গাড়ী সিগন্যালের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং সাধারণ গাড়ীসমূহের সঙ্গে চলে গেল। পরে জানতে পারি যে, এটি এখানকার প্রধানমন্ত্রীর গাড়ী ছিল এবং সে তাতে উপস্থিতও ছিল। তার আগে পরে না কোন পাইলট দেখতে পেলাম, না পুলিশের গাড়ী দেখতে পেলাম। এখানকার লোকেরা বলল যে, কিছুদিন পূর্বে এই প্রধানমন্ত্রী (তিনি একজন মহিলা) কিছু একটা ক্রয় করার জন্য একটি সুপারমার্কেটে গিয়ে সাধারণ লোকদের সঙ্গে লাইন ধরে থাকেন এবং যখন তার পালা আসে তখন তা ক্রয় করেন।

মোটকথা, সরলতা, পরিস্কার–পরিচ্ছন্নতা, সুব্যবস্থাপনা, কায়–কারবারে নির্মলতা এবং আমানত ও দায়িত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ প্রায় প্রতিদিনই আমাদের চোখে পড়ে এবং অনুভূত হয় যে, এ সমস্ত গুণ এখানকার সমাজে খুব ভালভাবে প্রবিষ্ট করা হয়েছে। সত্যি কথা এই যে, এসব গুণই এ সমস্ত জাতিকে বিশ্ব আসরে উন্নতি দান করেছে। আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) বড় দামী কথা বলতেন যে, 'বাতিলের মধ্যে উন্নতি করার নিজস্ব কোন শক্তি নেই। কারণ পবিত্র কুরআন এরশাদ করেছে—

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

'নিশ্চয় বাতিল তিরোহিত হবেই'। বিধায় কোন বাতিল সম্প্রদায়কে যদি উন্নতি করতে দেখো তাহলে বুঝে নিবে, কোন সত্য তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যার শক্তিতে সে উন্নতি করছে। কাজেই যেই পাশ্চাত্য জগতকে বিশ্বের বুকে উন্নতি করতে দেখা যাচ্ছে, তা তাদের বাতিল আকিদা ও

ভ্রান্ত মতাদর্শ কিংবা পাপ পঙ্কিলতার কারণে নয়, বরং তারা ঐ সমস্ত গুণের কারণে উন্নতি করছে, যেগুলো হক ও সত্য এবং যেগুলোর ফল ন্যূনতম পক্ষে ইহকালে পাওয়া যায়। মূলতঃ এ সমস্ত গুণ ইসলামী শিক্ষারই অংশ। তবে আফসোসের বিষয় হল, আমরা সেগুলো পরিত্যাগ করেছি আর এ সমস্ত জাতি সেগুলোর উপর আমল করে উন্নতি লাভ করছে।

অন্যদিকে এ সমস্ত জাতিরই কিছু বৈশিষ্ট্য এমনও রয়েছে যেগুলো দেখে মনে হয় যে, এরা বাস্তব অধঃপতনের ক্ষেত্রে পশুর পর্যায় থেকে যেমন নীচে নেমেছে, তেমনি তারা তাদের আকীদার দিক থেকে নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার চূড়ান্তে পৌঁছেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বের চুলচেরা গবেষণা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তারা এই ঈমান ও বিশ্বাসের দৌলত থেকে বঞ্চিত যে, বিশ্ব চরাচরের বিস্ময়কর এই ব্যবস্থাপনা কোন স্রষ্টার পূর্ণ ক্ষমতা ও নিপুণ কর্মকুশলতা ভিন্ন অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। আর সেই স্রষ্টারই অধিকার যে, তিনি মানবকে পৃথিবীর বুকে জীবন যাপনের পদ্ধতি বলে দিবেন। সুস্পষ্ট এই চূড়ান্ত বিষয়টি এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান ও শিল্পকলার এই হিরোদের বুঝে আসেনি। এখানে এসে তাদের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান হাওয়া হয়ে যায়।

অপরদিকে নিজ নিজ দেশে আরাম-আয়েশের তাবৎ উপকরণসমূহের সমন্বয় ঘটানো সত্ত্বেও তারা নিজেদের সমাজ কাঠামোকে চরমভাবে ধ্বংস করে ফেলেছে, যা প্রত্যেক দৃষ্টিবানের জন্য একটি শিক্ষণীয় পাঠ। আমি কোথাও পড়েছিলাম যে, নরওয়ের অধিবাসীদের সামান্য সংখ্যক বিবাহিত, যার অর্থ এই যে, সিংহভাগ অধিবাসী বিবাহ ছাড়া স্বাধীন জীবনযাপন করছে। পারিবারিক জীবনের ধারণাই তাদের থেকে বিলুপ্ত হয়ে চলেছে। মাতাপিতা ও ভ্রাতা-ভগ্নির সম্পর্ক তার মধুরতা হারিয়ে ফেলেছে। প্রত্যেকে অর্থ উপার্জনের ব্যস্ততায় লিপ্ত। প্রত্যেকের চেষ্টা-সাধনা ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। সামাজিক জীবনে অতিথি ও অতিথিপরায়ণতার ধারণাই তাদের নেই। জনসমক্ষে অশ্লীলতা কোনরূপ দোষণীয় নয়। সমকামিতার অভিশাপ মানব প্রকৃতিকে বিকৃত করে ফেলেছে। সারাবিশ্বে নেশাবিরোধী আন্দোলনকারীরা এবং নেশাকর বস্তুকে

অপরাধ গণ্যকারীরা ছুটির রাতে গ্লাস গ্লাস মদ উজাড় করতে থাকে এবং মাতাল অবস্থায় এমন সমস্ত আচরণ করতে থাকে, যার কারণে তাদের আর পশুদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। হেলসিংকী যাওয়ার বিবরণে জাহাজের যেই সুন্দর সফরের বর্ণনা আমি করেছি, তার ভয়ংকর দিক এই ছিল যে, রাতের বেলা প্রায় সকলে নেশায় মাতাল হয়ে পাশবিকতার এমন ঢল ছুটিয়েছিল যে, আমাদের জন্য কেবিন থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই দুআ বের হয়ে আসে—

الحمد لله الذى عافانا مما ابتلاهم به

'সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়েছেন ঐ সমস্ত নোংরামী থেকে, যাতে তারা লিপ্ত রয়েছে।'

এ হিসাবে তাদের জীবন উভয় দিক থেকে শিক্ষার উপকরণ। তাদের জীবনের প্রথমোক্ত দিকটি প্রশংসা ও অনুকরণযোগ্য, আর এ দিকের বদৌলতেই তাদের উন্নতি লাভ হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিকটি চরম ঘৃনার্হ ও পরিত্যাগ যোগ্য। যা তাদেরকে উন্নতি দেয়নি বরং ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত করেছে। মরহুম ইকবাল ঠিকই বলেছেন—

قوت مغرب نہ از جنگ و رباب
نے ز رقص دختران بے حجاب
نے زسحرِ ساحرانِ لالہ روست
نے زعریاں ساق و نے از قطعِ موست
قوت افرنگ از علم و فن است
از ہمیں آتش چراغش روشن است

"পাশ্চাত্যের শক্তি রণ ও বাদ্যের ফল নয়।
উলঙ্গ নারীদের নৃত্যের ফল নয়
পুষ্পরূপী জাদুকরদের জাদুর ফল নয়।
উলঙ্গ উরু ও দাড়ি চাঁচার ফল নয়
ফিরিঙ্গি শক্তি জ্ঞান ও শিল্পের ফল
এ অগ্নিতেই তাদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত।"

আরেক জায়গায় বলেন—

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

"নক্ষত্রের কক্ষপথের অন্বেষণকারীরা
নিজেদের চিন্তার জগতে ভ্রমণ করতে পারেনি
যারা সূর্যকিরণকে বন্দী করল, তারা
জীবনের অন্ধকার নিশিকে আলোকিত করতে পারেনি।"

এ সময় আমাদের দেশ পাকিস্তানে বিশেষভাবে এবং অধিকাংশ ইসলামী দেশে সাধারণভাবে একটি ঊর্ধ্বমুখী ঝোঁক এই বিরাজ করছে যে, মানুষ স্বদেশভূমি ছেড়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিবাসী হতে চায়। এতে সন্দেহ নেই যে, আমাদের দেশসমূহের অবস্থা এমন অনির্বচনীয় যে, না সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা আছে, না সসম্মানে উপার্জনের পথ আছে, না যোগ্যতা ও শ্রমের যথার্থ মূল্যায়ন আছে। ন্যায়বিচার সেখানে বিলুপ্ত। অরাজকতা সেখানে প্রতিষ্ঠিত। মানুষ এসব থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বের হয়ে আসতে চায়। কিন্তু আমি পশ্চিমা দেশসমূহে প্রতিবছর কয়েকবার করে ভ্রমণ করি। আল্লাহর মেহেরবানীতে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। আমার সুচিন্তিত মত এই যে, এ সমস্ত দেশ একজন মুসলমানের স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্য মোটেই নয়। কোন অপারগতা বা উচ্চতর কোন লক্ষ্য সামনে এলে সে তো ভিন্ন কথা। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এখানে নিয়মিত অবস্থান করা এমন কোন বিষয় নয়, যার জন্য দৌড়-ঝাঁপ করতে হবে। আমাদের দেশে যাবতীয় মন্দাবস্থা বিরাজ করা সত্ত্বেও একজন মুসলমানের জন্য তা অনেক গনীমত।

প্রথম কথা তো এই যে, ঐ সমস্ত দেশে নিঃসন্দেহে নাগরিক সুবিধাদি এখান থেকে অনেক বেশী লাভ হয় (তাও আবার সবার ক্ষেত্রে নয়)। কিন্তু বহিরাগত মানুষ শেষ জীবন পর্যন্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর

নাগরিক রূপে গণ্য হয়। তারা সারাজীবনেও সেই স্থান লাভ করতে পারে না, যা এখানকার মূল অধিবাসীদের রয়েছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, এ সমস্ত নাগরিক–সুবিধা মানুষ সাধারণতঃ নিজের দ্বীন, মূল্যবোধ ও নিজের সন্তানদের আত্মার ভবিষ্যত ধ্বংসের বিনিময়ে লাভ করে থাকে। শিশু এবং বিশেষতঃ মেয়ে শিশুদের প্রতিপালন এসব দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সামগ্রিকভাবে এখনও পর্যন্ত যার কোন সমাধান নেই। মা–বাবা সন্তানদেরকে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পড়াতে বাধ্য। যেখানকার পাঠ্যক্রম, শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ আত্মমর্যাদাশালী একজন মুসলমানের জন্য প্রায় অসহনীয়। যেখানে শিক্ষা পাওয়ার পর বিরাট সংখ্যক সন্তান মা–বাবার হাত থেকে প্রায় হাতছাড়া হয়ে যায়। প্রচার মাধ্যমসমূহের অবস্থা এই যে, সেগুলো শিশুদেরকে জীবনের প্রারম্ভ থেকেই নিজেদের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শিক্ষা দেয়।

তৃতীয় বিষয় এই যে, অনেক পাশ্চাত্য শহরে মসজিদ ও ইসলামী সেন্টারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেসব দেশের অধিকাংশ অধিবাসী আযানের আওয়াজ শোনা থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত থাকে। মসজিদের নিকটে বাড়ী না হলে অনেক লোক জামাআতে নামায পড়া বরং জুমুআ থেকেও বঞ্চিত থাকে। মানুষের মন থেকে আল্লাহ না করুন, হালাল–হারামের চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে গেলে তো ভিন্ন কথা, কিন্তু কারো অন্তরে এই চিন্তার বিন্দুমাত্র স্পন্দন থাকলে তার জন্য পদে পদে সমস্যা সৃষ্টি হয়। সফর অবস্থায় হালাল খাবার পাওয়া এক জটিল সমস্যা। ...... তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা এই যে, পাশ্চাত্যবাসীর জীবনের ঐ সমস্ত নেতিবাচক দিক—যেগুলো আমি এই মাত্র উল্লেখ করলাম—দিবস–রজনী দেখতে দেখতে চোখ তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তার মন্দদিকসমূহের অনুভূতি হ্রাস পেতে থাকে। অনেক সময় একেবারে মুছে যায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে সমস্ত মুসলমান সেখানে গিয়ে বসবাস করছে, তাদের মধ্যে অসংখ্য মুসলমান এমন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রয়েছেন, যারা অবিচলভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করে নিজেদের ইসলামী স্বকীয়তাকে টিকিয়ে রেখেছেন। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত

মুসলমানের ধর্মীয় অবস্থা ইসলামী দেশসমূহের মুসলমান অধিবাসীদের থেকে অনেক গুণে ভাল। কিন্তু মুসলমান অধিবাসীদের সার্বিক অবস্থার দিকে তাকালে এ অবস্থাকে সিংহভাগ অধিবাসীর সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। যারা সেখানের অধিবাসী হয়ে গেছে, তাদের সংরক্ষণের জন্য এ সমস্ত প্রচেষ্টা অবশ্যই অব্যাহত থাকতে হবে এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে এসবে প্রবৃদ্ধি ঘটছে। তবে আমার নিবেদনের উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত লোক এখনও সেসব দেশে যাননি, তাদের জন্য সেখানে গিয়ে স্বতন্ত্র বসবাস এমন কোন আকর্ষণীয় বস্তু নয়, যার জন্য দৌড়ঝাঁপ করতে হবে।

শেষ কথা এই যে, উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তানের তেরো কোটি অধিবাসীর সবার জন্য এটি সম্ভব নয় যে, তারা স্বদেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে অধিবাসী হবে। আর যদি ভাল ও যোগ্য লোকদের দেশত্যাগ এই গতিতে চলতে থাকে—যেই গতিতে বর্তমানে চালু রয়েছে—তাহলে এ দেশ কে নির্মাণ করবে? দেশের অবস্থা নিঃসন্দেহে ভাল নয়। তবে বিভিন্ন জাতির সম্মুখে এমন সময় এসেই থাকে। তার সমাধান ময়দান ছেড়ে পালানো নয়, বরং অবস্থা সংশোধনের চেষ্টা করা। নিঃসন্দেহে এ দায়িত্ব এক নম্বরে সরকারের, সে দেশের অবস্থাকে ঘৃণার যোগ্য না বানিয়ে আকর্ষণীয় বানাবে। তবে এটি আমাদের সকলেরই দায়িত্ব যে, আমরা নিজ নিজ ক্ষমতার পরিধিতে সত্যের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করবো। আল্লাহ তাআলার নীতি এই যে, এখলাসের সাথে যে প্রদীপ জ্বালানো হয়, তা থেকে আরো প্রদীপ আলোকিত হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত অন্ধকার বিদূরীত হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ কথা বোঝার, সে অনুপাতে আমল করার এবং তার উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

জার্মানী ও ইটালীর একটি সফর

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم،وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ا مابعد.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর সম্মানিত রাসূলের উপর, তাঁর সমস্ত বংশধর ও সাহাবীদের উপর এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের প্রত্যেক নিষ্ঠাবান অনুসারীর উপর।"

জার্মানীর সুপ্রসিদ্ধ Erleangen ইউনিভার্সিটি আমাকে ইসলামী আইনের উপর ভাষণ দানের জন্য দাওয়াত করেছিল। পশ্চিমা দেশগুলোর ইউনিভার্সিটিসমূহে ইসলাম ও ইসলামী দেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও গবেষণার পৃথক বিভাগ রয়েছে। এখানকার জ্ঞান-গবেষণা পাশ্চাত্যে ইসলাম, মুসলমান ও মুসলিম দেশসমূহ সম্পর্কে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার রূপরেখা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পশ্চিমা মিডিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে যে দায়িত্বহীনতামূলক ও বিভ্রান্তিকর প্রোপাগাণ্ডা করে থাকে, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান তা দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়। তবে তাদের মধ্যে এমন লোকও অনেক রয়েছে, যারা এ বিষয়ে সত্যনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে তারা যে ধর্ম বা দেশকে আলোচনা ও গবেষণার প্রতিপাদ্যরূপে গ্রহণ করে, তার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদেরকেও নিমন্ত্রণ করে থাকে। যেন নিমন্ত্রিত প্রতিনিধিগণ নিজেদের মতাদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন।

কিন্তু এতদসংক্রান্ত দুঃখজনক দিক এই যে, মুসলিম বিশ্ব থেকে এ পর্যায়ের লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে কাজ করা হয় না। বরং সাধারণতঃ এমন স্কলারদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়, যারা নিজেরা পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার হাতে গড়া এবং তা দ্বারা প্রভাবিত ও হতচকিত হয়ে থাকে। তাই তারা সেখানে যা কিছু ব্যক্ত করে, তা দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয়ে ওঠে না। বরং দৃঢ় বিশ্বাসী

আলেমদের সম্পর্কে যে ধারণা পশ্চিমা মিডিয়া সর্বসাধারণের মনে বিস্তার করিয়েছে, তারই সমর্থন হয়ে থাকে। দৃঢ়বিশ্বাসী জ্ঞানীজনদেরকে কদাচিতই এ ধরনের আলোচনায় নিমন্ত্রণ করা হয়। তাই যখনই আমি এ ধরনের কোন নিমন্ত্রণ পেয়েছি, আমি তা গ্রহণ করেছি এবং তা দ্বারা ফায়দা উঠানোর চেষ্টা করেছি। ইতিপূর্বে আমাকে তিনবার পশ্চিমা দেশসমূহের ইউনিভার্সিটিসমূহে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। একবার হারভার্ড ইউনিভার্সিটির ল' স্কুলের পক্ষ থেকে, একবার লণ্ডন স্কুল অব ইকোনোমিকস (LSE)এর পক্ষ থেকে—যা অর্থনীতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান—এবং তৃতীয়বার লণ্ডনেরই ইনষ্টিটিউট অব মডেল ইষ্টার্ণ ষ্টাডিজের পক্ষ থেকে। তিনবারই আমি উপলব্ধি করি যে, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য ব্যর্থ হয়নি। তাই যখন আমাকে জার্মানীর Erleangen ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করা হল তখন আমি তাদের এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি।

আমাকে ৩রা শা'বান ১৪২৩ হিজরী মোতাবেক ১০ই অক্টোবর ২০০২ খৃষ্টাব্দ, করাচী থেকে জার্মানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। ঘটনাচক্রে সেদিনই দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। তাই আমি দিনে ভোট দিয়ে রাত সাড়ে দশটায় আমিরাত এয়ারলাইন্সযোগে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সেখান থেকে রাত আড়াইটায় লুফতানসার বিমান পাই। সকাল সাড়ে সাতটায় বিমানটি আমাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছায়। এই লেকচারে আমাকে নিমন্ত্রিত করার পিছনে একজন আইনজ্ঞ আরব মুসলমান আবদুল আজীজ ইয়াকুতির জোরালো ভূমিকা ছিল। তিনি মূলতঃ কুয়েতী, কিন্তু বহুদিন ধরে জার্মানীতে বসবাস করছেন। তার মা-ও জার্মান বংশোদ্ভূত মুসলমান। তিনি এখানে কর্পোরেট ল' বিভাগে কাজ করছেন। Erleangen ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তিনি ইসলামিক ষ্টাডিজের একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথমে ধারণা করেছিলাম যে, আমার এ লেকচার ইউনিভার্সিটির সাধারণ লেকচারের মতই হবে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ইসলামিক ষ্টাডিজের সেই বিভাগের পক্ষ থেকে একে একটি সিম্পোজিয়ামের রূপ দেন। তাতে ইউরোপের অন্যান্য ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদেরকেও নিমন্ত্রণ করা হয়।

ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে ইয়াকুতি সাহেবের সহকর্মী মিষ্টার ক্রাভগাসকে আমাকে স্বাগত জ্ঞাপনকারী ও সহচর নির্ধারণ করা হয়েছিল। তিনিই ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে আমাকে স্বাগত জানান। এই জার্মান তরুণ সাবলিলভাবে ইংরেজীতে কথা বলেন বিধায় কোন সমস্যা হয়নি। পুরো সফরটিতে তিনি আমার আতিথ্য, পথপ্রদর্শন ও অতিথি পরায়ণতায় কোন ত্রুটি করেননি। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আমাদেরকে ট্রেনযোগে ন্যুরেমবার্গ (Nuremberg) যেতে হবে। আমি ষ্টেশনে পৌঁছার পূর্বে একটি ট্রেন রওয়ানা হয়ে গেছে। অপরটি নয়টার দিকে রওয়ানা হবে। তাই আমাদেরকে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় বিমানবন্দর রেলওয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে হয়। এ সময় আমি ফ্রাঙ্কফুর্টের কিছু বন্ধুকে ফোন করতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, আমার কাছে যে নম্বরগুলো রয়েছে, সেগুলো পুরাতন। এখন তা পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হল না।

নয়টায় ট্রেনে আরোহণ করি। প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় ট্রেনে কাটাই। আমি ফ্রাঙ্কফুর্টে ইতিপূর্বেও বেশ কয়েকবার এসেছি। তবে জার্মানীর ভিতরে যাওয়ার সুযোগ এবারই ছিল প্রথম। জার্মানীকে আল্লাহ তাআলা অপার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভূষিত করেছেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আরামদায়ক ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর এই সফর খুবই মনোমুগ্ধকর ছিল। আবহাওয়া শীতল ও মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ট্রেনের কাঁচে পরিদৃষ্ট সবুজ পাহাড়, উপত্যকা ও নিবিড় বন নয়নে পুলক সৃষ্টি করছিল। পথিমধ্যে কয়েকটি শহরও অতিক্রম করে। অবশেষে প্রায় সাড়ে এগারোটায় আমরা ন্যুরেমবার্গ পৌঁছি। আরলেনগান শহর—যার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত—কারযোগে ন্যুরেমবার্গ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট দূরত্বের পথ। আমার মেজবান আরলেনগানের পরিবর্তে ন্যুরেমবার্গের 'আরাবিলা শেরাটন' হোটেলে থাকার ব্যবস্থা সম্ভবতঃ এ কারণে করেছিলেন যে, আরলেনগান শহরটি ছোট এবং ফ্রাঙ্কফুর্টের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন ন্যুরেমবার্গ থেকে অধিকতর সহজ ছিল। আরাবিলা শেরাটন হোটেল শহরের ঠিক মধ্যভাগে রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটেই অবস্থিত। তাই আমাদের সেখানে পৌঁছতে বিলম্ব হল না।

মিঃ ক্রাঙগাস আমাকে হোটেল কক্ষে পৌছে দেন। দীর্ঘ সফরের পর কিছু সময় বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেদিন ছিল জুমুআ বার। তাই মিঃ ক্রাঙগাস এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, তিনি জুমুআর নামাযের সঠিক সময় অবগত হয়ে আমাকে কোন একটি মসজিদে নিয়ে যাবেন। ততক্ষণ সময় আমি বিশ্রাম করি, যতক্ষণের মধ্যে তিনি মসজিদের ঠিকানা খুঁজে বের করেন। আমরা একটার সময় একটি ট্যাক্সি করে মসজিদে যাই। মাশাআল্লাহ, মসজিদ নামাযী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তুর্কি বংশোদ্ভূত একজন আলেম জুমুআর খুৎবা দিতে আরম্ভ করেন। তারপর আলহামদুলিল্লাহ, ধীরে সুস্থে জুমুআর নামায আদায় করা হয়। মসজিদে বেশীর ভাগ মুসলমান ছিল আরব ও তুর্কি। কয়েকজন পাকিস্তানীর সঙ্গেও মসজিদে সাক্ষাত হয়। তারা আমাকে চিনত না। করাচী থেকে রওয়ানা হওয়ার পর আমার নির্বাচনের ফলাফল জানার চিন্তা ছিল। ন্যুরেমবার্গের হোটেলে পৌছার পর লণ্ডনে আমার বন্ধু সাঈদ আহমাদের নিকট আমার ফোন করার প্রয়োজন ছিল। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নির্বাচনের ফলাফলের কোন সংবাদ আছে কি? তিনি উত্তরে আনন্দের সাথে জানালেন যে, মুত্তাহিদা মজলিসে আমল এখন পর্যন্তের সংবাদ অনুপাতে চল্লিশোর্ধ আসন জিতেছে। মসজিদে এই পাকিস্তানী লোকদের সাথে যখন সাক্ষাত হল, তখন আমি তাদেরকে নির্বাচন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। যুবকগুলো উত্তর করল 'কিতাবওয়ালারা জিতে চলেছে।' নামাযের পর যখন হোটেলে পৌছি, তখন সেখানে সি.এন.এন-এ সংবাদ সম্প্রচারিত হচ্ছিল যে, 'আফগানিস্তান সংলগ্ন দু'টি প্রদেশে তালেবানের পৃষ্ঠপোষক ইসলামপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে।' পরে বাড়ীতে ফোন করে বিস্তারিত জানতে পারি এবং আল্লাহর শোকর আদায় করি।

জুমুআর দিন সেখানে আমার বিশেষ কোন কাজ ছিল না। তাই মাআরিফুল কুরআনের অনুবাদের সংশোধনী কাজে লিপ্ত হই। যা বেশীর ভাগ সফরে আমার সঙ্গে থাকে এবং এ সময় সূরায়ে 'সাবা'র কাজ চলছিল। আসর নামাযের পর মিঃ ক্রাঙগাস বললেন যে, ন্যুরেমবার্গ খুব সুন্দর একটি শহর। আপনি চাইলে অল্পক্ষণ ঘুরে দেখা যায়। সুতরাং

তিনি আমাকে শহরের দর্শনীয় স্থানসমূহ ঘুরে দেখান।

এই শহরের নাম জার্মান উচ্চারণে 'নিয়র্নবার্গ' আর ইংরেজী উচ্চারণে 'ন্যুরেমবার্গ' (Nuremberg)। শহরটি পেগনিট্‌জ (Pegnitz) নদীর উভয় দিকে অবস্থিত। এটি জার্মান সম্রাট তৃতীয় হেনরী একাদশ খৃষ্ট শতাব্দীতে আবাদ করেন এবং এখানে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন। এটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি স্বায়ত্বশাসিত রাজ্যরূপেও ছিল। হস্তশিল্পের দিক থেকে শহরটি বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করে। অনেক আবিস্কারক ও বৈজ্ঞানিক এখানে জন্ম গ্রহণ করেন। জার্মানীর ইতিহাসে এদিক থেকেও শহরটির বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যে, একে সারাদেশের মধ্যে জ্ঞান ও শিল্পের কেন্দ্র মনে করা হত। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এটি নাজী পার্টির কেন্দ্রও ছিল। এখানকার ভবনসমূহও নির্মাণশৈলীর দিক থেকে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার বোমাবর্ষণের ফলে সেগুলো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বা বিধ্বস্ত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শহরটি পুনঃনির্মাণ করা হয়। এখন এটি একটি শিল্পনগরী হিসেবে প্রসিদ্ধ। এখানের কাপড়, চশমা ও রাসায়নিক উপাদান শিল্পসমূহ সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এছাড়া এখানকার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বিশ্বব্যাপী খ্যাতিলাভ করেছে।

এ শহরে নির্মাণশৈল্পী ও নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক থেকে প্রাচীন ও অধুনার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। আধুনিক অঞ্চলের ভবন ও সড়কসমূহ সমকালীন রুচির তৈরী। কিন্তু শহরের অভ্যন্তরীন অংশে প্রাচীন ঐতিহ্যধারাকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি ঐ সমস্ত এলাকার গলিসমূহ এখনও পর্যন্ত ইটের তৈরী। মনোমুগ্ধকর শীতল ঋতুতে শহরের বিশেষ বিশেষ স্থানের ভ্রমণ বেশ পুলকোদ্দীপক হয়।

পরদিন নয়টার দিকে আমরা কারযোগে আরল্যানগনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এ শহরটি ন্যুরেমবার্গের উত্তরে অবস্থিত। দূরত্ব পঞ্চাশ-ষাট মাইলের কম হবে না। তবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সড়ক ও জ্যাম স্বল্পতার কারণে আমরা প্রায় চল্লিশ মিনিটে সেখানে পৌঁছে যাই। দশ লক্ষের কিছু বেশী অধিবাসীর এই শহরটি ন্যুরেমবার্গ থেকেও প্রাচীন। শহরটি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে বিখ্যাত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল

শাখাই রয়েছে। তবে প্রযুক্তির শিক্ষাদানে এটি অধিকতর প্রসিদ্ধ।

এই ইউনিভার্সিটির একটি হলকক্ষে সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল 'পাকিস্তানে ইসলামী আইন ও ফতওয়া।' আমাকে বিশেষভাবে ইসলামী আইনের উপর আলোচনা রাখতে বলা হয়েছিল। আমি আমার বক্তব্যের জন্য কম্পিউটারে একটি প্রেজেনটেশান (Presentation) তৈরী করেছিলাম, যাতে করে সেটি মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে স্ক্রীনে দেখানো সম্ভব হয়। কিন্তু উপস্থিত মুহূর্তে সিম্পোজিয়ামের আয়োজকগণ আমাকে জানান যে, স্ক্রীনে পরিদর্শনের মেশিন ভুল এসেছে। ফল এই হল যে, এমন একটি ইউনিভার্সিটিতে—যেটি টেকনোলজি শিক্ষাদানে প্রসিদ্ধ—একটি টেকনিকের ত্রুটির কারণেই আমি আমার লেকচারের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ স্ক্রীনে তুলে ধরতে পারলাম না। ফলে আমাকে উপস্থিত বক্তব্য দিতে হয়। আমি সংক্ষেপে ইসলামী আইনের স্বরূপ, তার উৎসসমূহ, তার গুরুত্ব এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের প্রতি জোর দেওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করি। তারপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, তার আইনগত ইতিহাস এবং ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ধারায় আংশিক পদক্ষেপ ইত্যাদির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করি। সমাবেশে উপস্থিতির সংখ্যা বেশী ছিল না। উপস্থিতির সংখ্যা অতি কষ্টে পঞ্চাশ জন হবে। তবে সকলেই উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রফেসর, আইনজ্ঞ ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ছিলেন। তারা ছাত্রদের পরিবর্তে শিক্ষকদের জন্য এই লেকচারের আয়োজন করেছিলেন।

প্রায় এক ঘন্টা সময় আমার আলোচনা চলতে থাকে। মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করা হয়। প্রশ্নোত্তরের ধারাও চলতে থাকে। সমস্ত প্রশ্ন ছিল একাডেমিক ধাঁচের। কোন একটি প্রশ্ন থেকেও কোনরূপ হঠকারিতার লেশ প্রকাশ পায়নি। উপলব্ধি হচ্ছিল যে, সকলেই অভিজাত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। মিডিয়ার প্রোপাগাণ্ডা ও প্রকৃত গবেষণার মধ্যে তারা তফাৎ করতে সক্ষম।

আমাকে ইয়াকুতি সাহেব পরবর্তীতে টেলিফোনে বলেন যে, আপনি চলে যাওয়ার পর আপনার ভাষণের বিভিন্ন দিক পরবর্তী সিম্পোজিয়াম ও ব্যক্তিগত বৈঠকসমূহে আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে। অনেকে জানিয়েছে

যে, এর দ্বারা তাদের অনেক ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

ঐ দিন বিকেলে মি. ক্রাঙ্গাসের সঙ্গে পুনরায় ট্রেনযোগে ফ্রাঙ্কফুর্ট ফিরে যাই।

ইটালীর সফর

আমি জার্মানী থেকে ১২ই অক্টোবর অবসর হই। ১৬ই অক্টোবর থেকে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত বৃটেনে আমার কাজ ছিল। সেখান থেকে আমাকে ওয়াশিংটন যেতে হবে। তাই ১৩ থেকে ১৫ই অক্টোবরের তিনদিন আমার হাতে খালি ছিল। যা আমি ইটালী ভ্রমণে ব্যয় করি। আমার বন্ধু সাঈদ আহমাদ সাহেব—যিনি লণ্ডনে বাস করেন এবং তার সঙ্গে আমি স্পেন ভ্রমণ করেছিলাম—আমাকে বারবার বলেছিলেন যে, একবার এমন একটি ভ্রমণের প্রোগ্রাম করুন, যেই প্রোগ্রামে কোন কাজ থাকবে না। এই তিনদিন আমি তার সঙ্গে ইটালীতে কাটানোর প্রোগ্রাম করি। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ১২ই অক্টোবর রাতে তিনি লণ্ডন থেকে রোম পৌঁছাবেন আর আমি পৌঁছাবো ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে। সুতরাং এই প্রোগ্রাম মত রাত সাড়ে নয়টায় আমাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। আমি সন্ধ্যা সাতটায় ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে পৌঁছে যাই। মধ্যবর্তী সময়টি আমি লাউঞ্জে মাআরিফুল কুরআনের কাজে ব্যয় করি। কম্পিউটারকে আরো চার্জ করি, যাতে করে বিমানেও কাজ করতে পারি। সাড়ে নয়টার সময় লুফতানসার বিমানে রওয়ানা করে রাত সাড়ে এগারোটায় রোম বিমানবন্দরে অবতরণ করি। সামানাপত্র আসতে অস্বাভাবিক দেরী হয়, যারফলে আমি সাড়ে বারোটার পর বিমানবন্দর থেকে বের হতে পারি। বিমানবন্দর থেকে শহরের দূরত্ব ছিল পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার। ফলে রাত একটার পর হোটেল ক্রাউন প্লাজায় পৌঁছতে সক্ষম হই। সেখানে সাঈদ সাহেব আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন। সারা দিনের ক্লান্তি আমাকে দ্রুত বিছানায় নিয়ে যায় এবং বিশ্রাম করি।

ভ্যাটিক্যানে

সকালে নাস্তার পর আমরা সর্বপ্রথম ভ্যাটিক্যান যাই। এটি বিশ্বের ক্ষুদ্রতম স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য। যা ইউরোপের নেতৃত্বে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। রোমান রাজাগণ যখন থেকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে, তখন থেকে বিরতি দিয়ে দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের বাদশাহ ও পোপের মধ্যে তীব্র কষাকষি রাজ্যের এককেন্দ্রিকতার জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করে। যদিও খৃষ্টধর্মের প্রসিদ্ধ মতাদর্শ এই ছিল যে, কায়সারকে কায়সারের অধিকার দাও আর গীর্জাকে দাও গীর্জার অধিকার—যার অর্থ হল দেশের রাজনৈতিক প্রধান হবে কায়সার আর ধর্মীয় প্রধান হবে গীর্জার পোপ। কিন্তু বড়রা যথার্থই বলেছেন যে, এক দেশে দুই রাজার সংকুলান হয় না। পোপ ধর্মীয় প্রধান হলেও বাস্তবে তাকে স্রষ্টার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। খৃষ্টীয় বিশ্বাসমতে পোপ জনাব পিটার্স এবং তাঁর মধ্যস্থতায় ঈসা (আঃ)এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। পোপ হওয়ার ফলে তার সম্পর্কে খৃষ্টীয় বিশ্বাস এই যে, সে নিষ্পাপ ও ভুলের ঊর্ধ্বে (Infallibe)। সুতরাং সে যে নির্দেশ দিবে তা সমস্ত খৃষ্টানদের জন্য খোদাপ্রদত্ত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। তার এই নির্দেশ বা বিধান কেবলমাত্র Interpretor এর মর্যাদায় নয় বরং আইনদাতা ও আইন প্রণেতা (Legislator) রূপে অবশ্য পালনীয় হয়ে থাকে। সেই নির্দিষ্ট বৃত্তও ছিল অস্পষ্ট, যার মধ্যে রাজা ও পোপের ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারণ করা হবে। বিধায় উভয়ের বিধানে সংঘাত সৃষ্টি হওয়া ছিল একটি সহজাত ব্যাপার। রাজা ধর্মীয় নেতা হিসেবে পোপের সম্মান করত এবং তাকে 'পবিত্র পিতা' এর উপাধি প্রদান করত। কিন্তু যখন এই 'পবিত্র পিতা' এমন কোন বিধান জারি করত—যাকে রাজা তার ক্ষমতার গণ্ডিতে নাক গলানো বলে মনে করত, তখন দুইজনের মধ্যে লড়াই বেঁধে যেত। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের শত শত বছরের ইতিহাস রাজা ও পোপের এই সংঘর্ষের কাহিনীতে ভরা।

অবশেষে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ তারিখে ইটালীর সরকার ও পোপের মধ্যে একটি চুক্তির আকারে এই সমস্যার সমাধান বের করা হয়। যাকে Lateran treaty বলা হয়। এই চুক্তির ভিত্তিতে ভ্যাটিকান অঞ্চলকে পোপের কর্তৃত্বে একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও

স্বায়ত্বশাসিত রাজ্যের রূপ দেওয়া হয়। এ রাজ্যটি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রাজ্য। যার সৈন্য, মুদ্রা, ব্যাংকিং সিষ্টেম, রেডিও ষ্টেশন, টেলিফোন, পোষ্ট অফিস ও অভ্যন্তরিণ আইন-শৃংখলা সবকিছু ইটালীর সাধারণ সরকার থেকে মুক্ত এবং পোপের পরিচালনাধীন। তবে এতটুকু বিষয় রয়েছে যে, যে ব্যক্তির নিকট ইটালীর নাগরিকত্ব বা ভিসা আছে, তাকে সেখানে প্রবেশ করার জন্য ভিসা নিতে হয় না। এভাবে পোপের ক্ষমতাবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য এ রাজ্যটি একটি কৌশলরূপে বানানো হয়। যদিও তার আয়তন ও অধিকার বলয় 'সালতানাতে শাহ্ আলম, দিল্লী তা পালন' থেকেও ক্ষুদ্র। যে সময় ভ্যাটিকান রাজ্য প্রতিষ্ঠার এই চুক্তি সম্পাদিত হয়, তখন ছিল ইউরোপের পুনর্জাগরণের পূর্ণতা লাভের পরবর্তী সময়। লিবারিলিজমের জয়জয়কার চলছিল এবং খৃষ্টধর্ম ও তার পণ্ডিতদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও নির্যাতনের ফলে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তা মানুষকে ধর্ম থেকেই বিমুখ করে দেয়। তাই পোপের জন্য তার বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভবপর ছিল না, তাই সম্ভবত তৎকালীন পোপ সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও তার ক্ষমতার স্বীকৃতিদানকেই গনীমত মনে করেন। এভাবে ইটালী সরকার ও পোপের পারস্পরিক সম্মতিতে এ চুক্তি অস্তিত্ব লাভ করে।

ভ্যাটিকান যদিও স্বায়ত্বশাসিত স্বতন্ত্র একটি রাজ্য, তবে অবস্থানস্থলের দিক থেকে তা বর্তমানে রোম নগরীরই একটি অংশ বা একটি মহল্লা। ভ্যাটিকানে প্রবেশ করার পর সর্ববৃহৎ জাঁকজমকপূর্ণ যে ভবনটি চোখে পড়ে তাকে সেন্ট পিটার্স বাসেলিকা (St. Peter's Basilica) বলা হয়। 'বাসেলিকা' ইংরেজীতে বিশেষ এক প্রকারের ভবনকে বলা হয়। আমাদের ভাষায় যার নিকটতম শব্দ 'হাবেলী' হতে পারে। বড় কোন চকের পাশের অর্ধবৃত্তাকারের তিন দরজা বিশিষ্ট ভবনকে 'বাসেলিকা' বলা হয়ে থাকে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ চার্চের সমন্বয় এই 'বাসেলিকাটি'। যা হযরত ঈসা (আঃ)এর সর্বাধিক বিশিষ্ট 'হাওয়ারী' তথা সহযোগী হযরত পিটার্স এর স্মরণে নির্মাণ করা হয়েছিল। হযরত পিটার্স—যাকে বাইবেলের ভাষায় সেন্ট পিটার্স বলা হয়—হযরত ঈসা (আঃ)এর দ্বাদশ হাওয়ারীর অন্যতম ছিলেন। খৃষ্টীয় ইতিহাস অনুপাতে

তিনি হযরত ঈসা (আঃ)কে আকাশে তুলে নেওয়ার পর তাঁর দ্বীনের তা'লিম ও তাবলীগে আত্মনিয়োগ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি দূর-দূরান্ত ভ্রমণ করেন। অবশেষে এ কাজেই তিনি রোমেও আগমন করেন। সেখানে তখন মূর্তি পূজারীদের শাসন চলছিল। তারা তাকে বন্দী করে এ জায়গাতেই শূলীবিদ্ধ করেছিল—যেখানে বর্তমানে সেন্ট পিটার্স বাসেলিকার জমকালো ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে। এ ভবনের অভ্যন্তরেই তার কবর আছে বলে বলা হয়।

রোমান ক্যাথলিকদের বিশ্বাস মতে হযরত পিটার্স প্রধান হাওয়ারী ছিলেন। তিনি হযরত ঈসা (আঃ)এর স্থলাভিষিক্ত। খৃষ্টানদের ধারণামতে তিনিই রোমান ক্যাথলিক চার্চের মূল প্রতিষ্ঠাতা। তাই খৃষ্টানরা বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই চার্চটি তারই কবরের পাশে নির্মাণ করে। জনৈক খৃষ্টান ঐতিহাসিক লিখেন ঃ

'যে সময় হযরত পিটার্সকে ভ্যাটিকানের পাহাড়ের উপর শূলীবিদ্ধ করা হচ্ছিল, তখন কেউ অবগত ছিল না যে, শূলীদাতা ব্যক্তিরা এ জায়গাতেই এমন একটি রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করছে, যা আকারে বিশ্বের সর্বক্ষুদ্র ও আধ্যাত্মিক প্রভাব-বলয়ের দিক থেকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজ্য হবে।।'

এ সমস্ত তথ্য খৃষ্টীয় বর্ণনার ভিত্তিতে, অন্যথা প্রকৃত তথ্য এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)এর পর তার হাওয়ারীদের ইতিহাসের রেকর্ড নির্ভরযোগ্য পন্থায় সংরক্ষিত হয়নি। আর যা কিছু রেকর্ড রয়েছে, তা পুলশের প্রভাব মিশ্রিত। তাই সেগুলোর উপর নির্ভর করা যায় না।

যাই হোক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেন্ট পিটার্স বাসেলিকার এই ভবন তার কারুকার্যের উৎকর্ষতা, নির্মাণশৈলীর কমনীয়তা ও রূপ-সৌন্দর্যের অপূর্বতার দিক থেকে একটি জমকালো ভবন। তবে চরম অবিচারের কথা এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)—যিনি মূর্তিপূজার বিলোপ সাধনের জন্য তাশরীফ এনেছিলেন, তাঁর নামে নির্মিত এই উপাসনালয়ে এত প্রতিমা ও ভাস্কর্য রয়েছে যে, একে একটি মূর্তিঘর বলে মনে হয়, আর এটিই কারণ যে, বাহ্যিক রূপসৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও এতে উপাসনালয়ের পবিত্রতার স্থলে এক অদ্ভূত ধরনের অন্ধকার অনুভূত হয়।

এ ধরনের স্থানে আল্লাহ তাআলার এই অপার অনুগ্রহ বিশেষভাবে অনুভূত ও অধিকতর ভাস্বর হয়ে ওঠে যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের মত নির্মল ও নিষ্কলুষ সত্যধর্মের হিদায়াত দান করেছেন।

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ

'যদি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত না করতেন তাহলে আমরা সঠিক পথপ্রাপ্ত হতাম না।'

পোপের সৈন্যবাহিনী—যাদেরকে সুইসগার্ড বলা হয়—পর্যটকদের দ্বারা পরিপূর্ণ এ অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছিল। যে পথটি পোপের বাসস্থানের দিকে গিয়েছে, তার মাথার উভয় দিকে দু'জন সুইসগার্ড এমন নীরব-নিথরভাবে দাঁড়িয়েছিল যে, তাদেরকে একেবারে মূর্তি বলে মনে হচ্ছিল। এমন রাজকীয় দাপট একজন ধর্মীয় নেতার কিভাবে শোভা পায় এবং তা সে কিভাবে হজম করে তা আল্লাহই ভাল জানেন!

তবে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই দেখতে পেলাম যে, চার্চের ভবনে উরু অনাবৃত থাকে এমন শর্ট পোশাক পরিধান করে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। তাই এক লোককে দেখতে পেলাম, সে হাফপ্যান্ট পরে এসেছিল, তবে তার সাথে একটি ব্যাগ ছিল। ব্যাগে একটি ফুলপ্যান্ট ছিল। ভবনে প্রবেশ করার পূর্বে সে ফুলপ্যান্ট পরে নেয়। ভবন পরিদর্শন করে বের হয়ে এসে তা খুলে ফেলে এবং পুনরায় পূর্বের পোশাক পরিধান করে।

ভ্যাটিকানে আরো অনেক ভবন রয়েছে। তার মধ্যে এখানকার জাদুঘর ও গ্রন্থাগার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাদুঘরের প্রতি তো আমার কোন আকর্ষণ ছিল না, তবে এখানকার গ্রন্থাগারটি খৃষ্টধর্ম ও তার ইতিহাস সংক্রান্ত অনেক দুর্লভ গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সম্বলিত ছিল। আমি 'ইযহারুল হক' কিতাবের যে সমস্ত উৎস অন্য কোথাও পাইনি, সেগুলোর ব্যাপারে আমার আশা রয়েছে যে, এ গ্রন্থাগারে সেগুলো অবশ্যই পাওয়া যাবে, কিন্তু এখন লাইব্রেরী থেকে উপকৃত হওয়ার সময় ছিল না। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে কখনোও আমি নিজে কিংবা কোন বন্ধুর মাধ্যমে এখানে ঐ সমস্ত কিতাব সন্ধান করবো।

রোমের ধ্বংসাবশেষ

ভ্যাটিক্যান থেকে বের হয়ে আমরা অপর একটি এলাকায় যাই, যা প্রাচীন রোমীয় মহল্লা ও ভবনসমূহের ধ্বংসাবশেষের সমন্বয় ছিল। এটি বিস্তৃত একটি এলাকা, যেখানে প্রাচীনকালের জমকালো ভবনসমূহের নিদর্শনাবলী দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে চতুর্দিকের এ সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ দেখলে যৌবনকালে এ এলাকার রূপ–সৌন্দর্য ও শান–শওকত কি পরিমাণ ছিল, তা অনুমিত হয়। কিন্তু আজ এ সমস্ত নিদর্শন পদে পদে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পৃথিবীতে বড় থেকে বড় কোন শক্তিরও অমরত্ব নসীব হয় না।

রোম সাম্রাজ্যের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শত শত বছর বিশ্বের বুকে বিরাজ করে। এর সম্রাট ও সেনাপতিদের প্রতিপত্তি এখানে নিজেদের দাপট দেখায়। কিন্তু আজ তা মাটির স্তূপে পরিণত হয়েছে। জীর্ণ এ ধ্বংসাবশেষ তাদের সে প্রতাপের শোকগাঁথা গাইছে—

جو مرکز الفت تھے، جو گلزار نظر تھے
سڑتے ہیں تہِ خاک وہ اجسام بتاں آج
وہ دبدبہ جن کا تھا کبھی دشت وجبل میں
حسرت کے کھنڈر ہیں وہ محلات شہاں آج
جن باغوں کی نکہت سے معطر تھیں فضائیں
ہیں مرثیہ خواں ان پہ بلبلوں کی زباں آج

"যারা প্রেমের আকর ও নয়নের পুষ্পোদ্যান ছিল
সেই প্রিয়তমের দেহ আজ মৃত্তিকাতলে পঁচছে।
পাহাড়ে–প্রান্তরে যাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিরাজিত ছিল,
সেই রাজপ্রাসাদসমূহ আজ অনুতাপের ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে।
যে সমস্ত পুষ্পকাননের মধুঘ্রানে পরিবেশ মধুময় ছিল
বুলবুলি আজ তাদের শোকগাঁথা গাইছে।"

এ অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষের এ ধারা জগৎখ্যাত সেই কোলোসিয়াম

পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে, যার প্রাচীরসমূহের চিত্র সারা পৃথিবীতে রোমের প্রতীকরূপে পরিচিত। এটি একটি ঐতিহাসিক ক্রীড়াক্ষেত্র। যা আজ থেকে প্রায় দু' হাজার বছর পূর্বে (৮০ খৃষ্টাব্দে) রোম সম্রাট তিতুস (Titus) বানিয়েছিল। এটি ছিল ষ্টেডিয়ামের ধাঁচে নির্মিত একটি ভবন, যার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার দর্শকের জন্য উপবেশন করে বিভিন্ন ক্রীড়া-কৌতুক ও দৈহিক কসরত দেখার ব্যবস্থা ছিল। এই ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হলে তিতুস একশ' দিন পর্যন্ত উৎসব করেছিল। এই ক্রীড়াক্ষেত্রে ক্রীড়া-কৌতুক দেখানোর জন্য ক্রীতদাসদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। তাদেরকে ইতিহাসে Gladiators বলে। তাদের পরস্পরের মধ্যে এবং কখনো কখনো বন্যপশুর সঙ্গে কুস্তি লড়ানো হত। আরো নানারকম দৈহিক কসরত প্রদর্শিত হত। এর ব্যবস্থাপকগণ বর্তমানেও এর আশেপাশে অনেক মানুষকে ঐ সমস্ত ক্রীতদাসের পোশাক পরিয়ে খাড়া করে রেখেছে। এই ক্রীড়াক্ষেত্রকে কোলোসিয়াম (Colossuem) এজন্য বলা হত যে, প্রসিদ্ধ রোম সম্রাট নিরোর একটি উপাধি কোলোসাসও (Colossus) ছিল। এখানে তার বিশাল এক ভাস্কর্য ছিল। এর সাথে সম্পৃক্ত করে এই ক্রীড়াক্ষেত্রকে কোলোসিয়াম বলতে আরম্ভ করা হয়।

রোম যেহেতু বিশ্বের প্রাচীনতম শহরসমূহের অন্যতম এবং এটি রোমান সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, তাই তার প্রতিটি অংশ ইতিহাসে পরিপূর্ণ। সাত পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এ শহর প্রতি পদে পদে কোন না কোন স্মৃতি ধারণ করে আছে। সারা দুনিয়া থেকে পর্যটকদল এসব স্মরণীয় বস্তু দেখতে এসে থাকে। কিন্তু এ সমস্ত স্মরণীয় বস্তুর সর্বত্র থেকে শিক্ষা ও উপদেশের যে পাঠ উন্মুক্ত গ্রন্থের ন্যায় চিন্তার আহবান জানায়, বিনোদন ও পর্যটনের আবেগে সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার কেউ নেই। পবিত্র কুরআন এ জাতীয় নিদর্শনাবলী দেখে শিক্ষা ও উপদেশের এ সমস্ত দিককেই স্মরণ করিয়ে দেয়—

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"তারা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি যে, তারা দেখত, যারা তাদের পূর্বে ছিল, তাদের পরিণতি কী হয়েছে।'

এ সমস্ত নিদর্শন থেকে এ শিক্ষাই লাভ হয় যে, এ পৃথিবীতে মান–মর্যাদা, ধন–দৌলত, যশ–খ্যাতি, স্বাদ–উপভোগ ও শান–শওকত সবই ধ্বংসশীল, নশ্বর। যা চিরদিন টিকে থাকবে, তা কেবল মানুষের ঈমান ও সৎকর্ম, যার ফলাফল অবিনশ্বর ও অমর।

ভেনিসে

পরদিন আমরা ট্রেনযোগে ভেনিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ভেনিসকে আরবী ভাষায় 'বুন্দুকিয়া' বলা হয়। এটি প্রায় সাড়ে চার ঘন্টার পথ। পথে ইটালীর অনেক শহর অতিক্রম করতে থাকে। তার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ও সুদৃশ্য ফ্লোরেন্স শহরও ছিল। দুপুর একটার দিকে আমরা ভেনিসের রেলওয়ে ষ্টেশনে নামি। আমার বন্ধু সাঈদ সাহেব এখানে একটি হোটেলে বুকিং করিয়ে রেখেছিলেন। তিনি রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে হোটেলে ফোন করে পথের সন্ধান চাইলে হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায় যে, আপনি ট্যাক্সি যোগেও আসতে পারেন, তাতে প্রায় ষাট ইউরো ব্যয় হবে। আর যদি বাসে আসেন, তাহলে বাস আমাদের হোটেলের ঠিক দরজায় আপনাদেরকে নামিয়ে দেবে, আর জনপ্রতি তিন ইউরো ভাড়া নিবে। সময়ও প্রায় একই লাগবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তাহলে বাসেই যাওয়া উচিত। কিন্তু আমরা রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে বাইরে বের হয়ে সামনে একটি সামুদ্রিক জেটি দেখতে পাই। কোন ট্যাক্সিও চোখে পড়ছিল না, কোন বাসও দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে সম্মুখের সমুদ্রবক্ষে ছোট–বড় নৌকা দাঁড়িয়েছিল। জানতে পারলাম, এ নৌকাগুলোর নামই 'বাস' বা 'ট্যাক্সি'। ছোট নৌকা পুরোটা ভাড়া করলে তার নাম 'ট্যাক্সি'। সেগুলোর গায়েও ট্যাক্সি লেখা ছিল। আর যদি সম্মিলিত বড় নৌকায় বসা হয় তাহলে তা 'বাস'।

ভেনিসের এটিই বৈশিষ্ট্য। যা দেখার জন্য সারা পৃথিবীর পর্যটকগণ এখানে এসে থাকে যে, এই পুরো শহরটি পানির মাঝে অবস্থিত। এর মধ্যে আসা–যাওয়ার মাধ্যম এই নৌকাগুলোই। সুতরাং আমরা একটি পানির বাসে আরোহণ করলাম। এটি পানির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল আর বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়াচ্ছিল। কিছু লোক নামছিল আর কিছু আরোহণ

করছিল। প্রায় পয়ঁতাল্লিশ মিনিট পর এই বাস আমাদেরকে যেখানে নামালো তার ঠিক সামনেই হোটেল পেনোরামা অবস্থিত। নৌকা থেকে নেমে আমরা সহজেই তাতে পৌঁছি।

ভেনিস মূলতঃ ইটালীর উত্তরে ভূমধ্যসাগরের এমন একটি প্রান্ত, যা একশ' আঠারোঠি ছোট–বড় দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। যেগুলোর মধ্যে একশ' আশিটি জলপথ রয়েছে। দ্বীপসমূহকে পরস্পরে যুক্ত করার জন্য ছোট–বড় চারশ'টি পুল নির্মাণ করা হয়েছে। এসব দ্বীপে যখন বাড়ী তৈরী করা হয়, তখন এক দ্বীপ থেকে অপর দ্বীপে যাতায়াতের জন্য এ সমস্ত জলপথ ব্যবহার করা হয়। যেগুলোতে যাতায়াত ও মালামাল বহনের মাধ্যম কেবল নৌকাই হতে পারে। ভেনিসের কিছু কিছু দ্বীপের অধিবাসীর অস্তিত্ব তো খৃষ্টপূর্ব কয়েক হাজার বছর থেকে বলা হয়। তবে একটি সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত শহরের পর্যায়ে তা রোমান সাম্রাজ্যকালে উপনীত হয়। এতে কয়েক শতাব্দী সময় লাগে। ভেনিসের ভবনসমূহ—যার অনেকগুলো বহুতলাবিশিষ্টও রয়েছে—পানির তীরে দাঁড়ানো দেখা যায়। ফলে দর্শকদের উপলব্ধি হয় যে, ভবনগুলো যেন পানির মধ্যেই নির্মাণ করা হয়েছে। অথচ তা মূলতঃ প্রাকৃতিক দ্বীপসমূহের উপরই নির্মিত। তবে কোথাও কোথাও পানির অংশ সমতল করেও ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

বিকেল বেলা আমরা পানির 'বাসে' করেই শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় যাই। যেখানকার 'মার্কস' স্কোয়ার (St. Mark Square) সৌন্দর্য, ঐতিহ্য ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ। শুরুতে এটি একধরনের কাঁচাবাজার ছিল। পরবর্তীতে জনৈক সম্রাটের নির্দেশে তা পরিস্কার করে বিনোদনমূলক একটি স্কোয়ারের রূপ দেওয়া হয়। তার চতুর্দিকে একই ডিজাইনের তিনতলা বিশিষ্ট ভবন রয়েছে। যেগুলোর বারান্দায় রোমান ধাঁচের অনেকগুলো মেহরাব রয়েছে। বর্তমানে সেগুলো শপিং সেন্টাররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবনগুলোর প্রান্তে একটি ক্ল'ক টাওয়ার রয়েছে, যা ভেনিসের সর্বোচ্চ মিনার।

'মার্কস' স্কোয়ার থেকে অনেকগুলো গলিপথ শহরাভ্যন্তরে চলে গেছে। গলিপথগুলো লোকদেরকে শহরাভ্যন্তরের জলপথসমূহ পর্যন্ত

পৌঁছিয়ে দেয়। যেগুলোর উপর ছোট ছোট পুল নির্মিত হয়েছে এবং সেগুলোর মধ্য দিয়ে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করে। এখানেই ভিতরে গেলে সেই রিয়ালটো টাওয়ার অবস্থিত, যার উপর দাঁড়িয়ে শহরের প্রধান নদী গ্রাণ্ড কিন্যালের দৃশ্য অধিকতর স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়।

মোটকথা, এ শহরটি এদিক থেকে একটি বিস্ময়কর বস্তু যে, তা পানির মধ্যে বিস্তৃত একটি শহর। যেখানে জল ও স্থলের অধিবাসীরা পরস্পরে বসবাসের জন্য সমঝোতা স্থাপন করেছে। যুগের বিস্ময় এ শহরটিতে একদিন এক রাতের অবস্থান বেশ মনোমুগ্ধকর হয়।

১৫ই অক্টোবর আমাকে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। বিমানবন্দরেও পানির বাস যোগেই যাই। এক জায়গায় এই বাস থামলে জানতে পারি যে, এখানে ভেনিসের প্রসিদ্ধ গ্লাস ফ্যাক্টরী রয়েছে। তাতে কাঁচের গ্লাস ও অন্যান্য পাত্র তৈরী হয়।

আমি ভেনিস থেকে লণ্ডন যাই। ১৬ই অক্টোবর সেখানে একটি মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করি। ১৭ই অক্টোবর শেফিল্ডে একটি মাদরাসার উদ্বোধন ছিল। সেখানে অংশগ্রহণ ও বক্তব্যদানের সুযোগ হয়। বিকেলেই আমি অক্সফোর্ড চলে যাই। ১৮ই অক্টোবর অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করি। সেই বিকেলেই লণ্ডন ফিরে এসে একরাত সেখানে অতিবাহিত করি। ১৯শে অক্টোবর সেখান থেকে ওয়াশিংটন যাই। সে রাতেই সেখানকার একটি সমাবেশে বক্তব্য ছিল। তার পরবর্তী দু'দিনও বিভিন্ন সমাবেশে কাটে। ২৩শে অক্টোবর ওয়াশিংটন থেকে রওয়ানা হয়ে ২৪ তারিখ রাতে আলহামদুলিল্লাহ করাচী ফিরে আসি। এখানে এসে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। অসুস্থ অবস্থায় জটিল বা সমস্যাপূর্ণ কোন কাজ করার স্বাস্থ্য অনুমতি দিচ্ছিল না। তাই হালকা ধরনের কাজ হিসেবে ভ্রমণ বৃত্তান্তের এ লাইনগুলো লেখার সুযোগ পেয়ে যাই।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

সমাপ্ত